NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POLITICAL SCIENCE
(PGPS)

PAPER - V
(Bengali Version)

MODULES : 1 - 4
(All Units)

POST GRADUATE
POLITICAL SCIENCE

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : মে, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

৫ম পত্র : তুলনামূলক রাজনীতি

[Paper V] : Comparative Politics

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

বিষয় সমিতি :

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক
অধ্যাপক বর্ণনা গুহঠাকুরতা (ব্যানার্জী)
অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

পাঠ রচনা

পর্যায়	একক	রচনা
প্রথম	১-৪	ড. দীপিকা মজুমদার
দ্বিতীয়	১-৪	শ্রী কৌশিক বৈদ্য
তৃতীয়	১-৪	ড. মইদুল ইসলাম
চতুর্থ	১-৪	ড. কাবেরী চক্রবর্তী

সম্পাদনা : অধ্যাপক অমিতাভ রায়

সম্পাদকীয় সহায়তা, বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন :

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক এবং মনোজ কুমার হালদার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পঞ্চম পত্র

পর্যায় -১ : তুলনামূলক সরকার থেকে তুলনামূলক রাজনীতি

একক - ১	:	তুলনামূলক সরকারের থেকে তুলনামূলক রাজনীতির পাঠে রূপান্তর	9–27
একক - ২	:	তুলনামূলক পাঠ-পদ্ধতি; তুলনামূলক পাঠের সুবিধাসমূহ : সমধর্মী ও ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার তুলনা	28–47
একক - ৩	:	তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ : ব্যবস্থা জ্ঞাপক ও কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি	48–65
একক - ৪	:	উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের তত্ত্ব সমূহ : নয়া উদারনীতিবাদী, নির্ভরতা ও বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব	66–93

পর্যায় - ২ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতি : তুলনামূলক পর্যালোচনা

একক - ১	:	ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনে জাতীয়তাবাদ ও জাতি নির্মাণ	97–102
একক - ২	:	রাষ্ট্র ও পৌর সমাজ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে	103 - 112
একক - ৩	:	তুলনামূলক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহ: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন	113–118
একক - ৪	:	পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা	119–131

পর্যায় - ৩ : তুলনামূলক রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত

একক-১	:	বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার : এশিয়া এবং আফ্রিকার নির্বাচিত রাষ্ট্রসমূহ	135–142
একক-২	:	তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে নৃকুলগত (Ethnic) রাজনীতি : পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা	143–150
একক - ৩	:	তুলনামূলক প্রেক্ষিতে ধর্ম এবং রাজনীতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য	151–158
একক - ৪	:	তুলনামূলক প্রেক্ষিতে নারীবাদী রাজনীতি : পশ্চিমী এবং অ-পশ্চিমী মতামত সমূহ	159–167

পর্যায় - ৪ : কর্তৃত্ববাদ ও গণতন্ত্র

একক - ১	:	বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ	171–186
একক - ২	:	নেপালের গণতান্ত্রিক উত্তরণ	187–202
একক - ৩	:	মিশরে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সমূহ	203–218
একক - ৪	:	লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক রূপান্তর	219–236

পর্যায় -১

তুলনামূলক সরকার থেকে তুলনামূলক রাজনীতি

একক - ১ : তুলনামূলক সরকারের থেকে তুলনামূলক রাজনীতির পাঠে রূপান্তর

একক - ২ : তুলনামূলক পাঠ-পদ্ধতি; তুলনামূলক পাঠের সুবিধাসমূহ : সমধর্মী ও ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার তুলনা

একক - ৩ : তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ : ব্যবস্থা জ্ঞাপক ও কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

একক - ৪ : উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের তত্ত্ব সমূহ : নয়া উদারনীতিবাদী, নির্ভরতা ও বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব

একক ১ □ তুলনামূলক সরকারের থেকে তুলনামূলক রাজনীতির পাঠে রূপান্তর

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ তুলনামূলক রাজনীতির ধারণা

১.৪ তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতির পার্থক্য

১.৫ তুলনামূলক সরকার থেকে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ

১.৬ তুলনামূলক রাজনীতি বিকাশের কারণসমূহ

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যেসব বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে এবং সম্যকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন এবং রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত যেসব বিষয় সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার অনুধাবন ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার সফল প্রয়োগ সম্ভব হবে, সেগুলি হল ঃ—

- তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতির ধারণা।
- তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতির পার্থক্যের দিকগুলি।
- উভয় ধারার কিছু গ্রন্থের পরিচয়।
- তুলনামূলক সরকার থেকে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের পর্যায়সমূহ।
- তুলনামূলক রাজনীতি বিকাশের কারণসমূহ।

১.২ ভূমিকা

তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রটির আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিককালে—বিংশ শতকের পাঁচের দশক থেকে। তবে রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন কালেও ছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের লেখায় তুলনামূলক আলোচনা ছিল। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি, বোঁদা ও মন্তেস্কুর আলোচনাও তুলনামূলক ছিল। কিন্তু সাবেকি তুলনামূলক আলোচনা ও আজকের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আগেকার তুলনামূলক আলোচনাকে তুলনামূলক সরকার বলা হত। তা ছিল বর্ণনামূলক ও মূল্যবোধযুক্ত, আলোচনা আবর্তিত হত সরকার, সংবিধান, শাসনব্যবস্থা বা আইনানুগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র করে এবং আলোচনার পরিধিও ছিল সীমিত—শুধুমাত্র ইউরোপের উন্নত রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা সেখানে স্থান পেত।

আধুনিককালে তুলনামূলক সরকারের বদলে তুলনামূলক রাজনীতির ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তুলনামূলক রাজনীতি আইনানুগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনাবলি, অ-আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক আচরণ আলোচনা করে, রাজনীতির সামাজিক পরিমণ্ডলকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে, বাস্তবতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্যের বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগঠনের ওপর জোর দেয়। এগুলির ভিত্তিতে তুলনামূলক রাজনীতি এখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আলোচনা করে থাকে। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা হল বিজ্ঞানভিত্তিক ও মূল্যবোধনিরপেক্ষ। তুলনামূলক আলোচনার পরিধিও এখন বিস্তৃত—শুধুমাত্র ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও এখন আলোচনার আওতাভুক্ত।

১.৩ তুলনামূলক রাজনীতির ধারণা

সাবেকি তুলনামূলক সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কাঠামোর তুলনামূলক পর্যালোচনার (comparative study of political institutions, of forms of Government) উপর জোর দেওয়া হোত। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি হল, কার্টিসের মতে, "বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশিত তাৎপর্যপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ।"

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে রাজনীতি শব্দটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইস্টনের মতে, রাজনীতি হল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ (Authoritative allocation of values), রবার্ট ডাল বলেন যে রাজনীতি হল ক্ষমতার ব্যবহারের একটি বিশেষ ধরন (A special case in the exercise

of power), ব্লন্ডেল রাজনীতিকে সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision-making) বলে মনে করেন। জোহারির মতে বর্তমানে তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনীতি শব্দটির তিনটি দিক আছে—রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হল সেই সব প্রচেষ্টা, যেগুলি দ্বারা ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থেকে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থা সৃষ্ট হয় এবং যাদের দ্বারা সেই দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়েছে, তাদের স্বার্থে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা হয়। দ্বন্দ্ব মীমাংসার কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা সাধারণত সর্বত্রই থাকে। আবার বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। দ্বন্দ্বমীমাংসার মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত, সেই সব সংস্থার ভূমিকাকে বোঝানো হয়। অ-রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ক্ষমতার লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য তারা সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। ফলে গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে সরকারের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা যে গোষ্ঠীর পিছনে থাকে, সেই গোষ্ঠীই তাদের দাবি আদায় করতে পারে। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলির স্বার্থসংক্রান্ত দ্বন্দ্বসমূহের মীমাংসার জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই দ্বন্দ্ব পরিচালিত হয়। যে সব পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলি সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, সেই সব পদ্ধতিগুলিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে নিজের ইচ্ছামত উপায়ে প্রভাবিত করার সামর্থ্যকে বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলনামূলক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রটির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো সংক্রান্ত আলোচনাও এসে পড়ে। ফলে শাসকশ্রেণী ও এলিট শ্রেণীর ভূমিকা, কর্তৃত্বের অধিকার ইত্যাদি সেখানে আলোচিত হয়।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি অনুসারে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিরোধ-মীমাংসা ও সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত বিচারবিবেচনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে তাই এখন গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ছাড়াও তুলনার স্বার্থে অ-রাজনৈতিক বিষয়সমূহও আলোচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার জন্য রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, উপজাতি সংগঠন ইত্যাদি বিষয়সমূহকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তুলনার পরিধিকে সম্প্রসারিত করে আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থাও আলোচনা করে এবং বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও রাজনৈতিক ও অ-

রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ক আলোচিত হয় এবং তাদের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যমূলক বিষয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়সমূহেরও বিচার করেন। আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে অ-রাজনৈতিক বিষয়সমূহেরও তুলনা করা যায়।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করে তত্ত্বগঠন করা হয়। এই তত্ত্বগুলি থেকে জানা যায় একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কেন পার্থক্য আছে বা বিভিন্ন দেশে একই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া থাকলেও কেন পৃথক ফল দেখা যায়। ভারতের কোন কোন রাজ্যে 'কোয়ালিশন সরকার' সফল, কোথাও নয়। ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কখনও কখনও 'কোয়ালিশন সরকার' সফল হয়েছে, কখনও সফল হয়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন—উভয় দেশেই সমাজতান্ত্রিক সরকার ছিল, কিন্তু ব্যবস্থা দুটি একরকম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশেই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উভয় ব্যবস্থার মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে এই সব পার্থক্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক কাঠামো, আইন, শাসন বা বিচারবিভাগ পুরোপুরি পাশ্চাত্য দেশগুলির মত নয়। অ্যালমন্ড ও তাঁর অনুগামীরা নিজেদের প্রবর্তিত ধারণার সাহায্যে একদিকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এবং অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনা করেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন ঘটছে, তুলনামূলক রাজনীতি সেগুলিরও বিশ্লেষণ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, নগরায়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদিও তুলনামূলক রাজনীতির আওতাভুক্ত।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে ডেভিড ইস্টন রাজনীতি শাস্ত্রকে নতুনভাবে উপকরণ, উপপাদ ও ফিডব্যাক বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন বাইরের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি তা আবার পরিবেশকেও প্রভাবিত করে।

তুলনামূলক রাজনীতি এখন আন্ত:বিষয়ক (inter-disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। ফলে সমাজতত্ত্ব নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সামাজিক বিজ্ঞান থেকে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ তুলনামূলক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্র এখন ক্রমবর্ধমান। ফলিত ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকে তুলনামূলক রাজনীতিতে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে, গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন তত্ত্ব নির্মিত হচ্ছে। ফলে বর্তমান তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রটির পরিবর্ধন, বিস্তার ঘটছে—নানাভাবে এবং নানাদিকে।

রসায়নশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যার মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ফলিত বিজ্ঞান নয়। পরীক্ষাগারে একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পরীক্ষাকার্য সম্পাদনপূর্বক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেই। তুলনামূলক রাজনীতি বিভিন্ন সমাজের সমজাতীয় ও অসমজাতীয় উপাদানগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে এবং

সেই আলোচনার ভিত্তিতে কিছু সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের সূত্রগুলির মতো তুলনামূলক রাজনীতির সূত্রগুলি যে সর্বাংশে সঠিক হবে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে সমীক্ষার জন্য যত বেশি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হবে, সমীক্ষা যত বেশি প্রসারিত হবে, সিদ্ধান্তসমূহ তত বেশি গ্রাহ্য হবে।

যে সব লেখকরা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন জি. এ. অ্যালমন্ড (G. A. Almond), জি. বি. পাওয়েল (G. B. Powell), আর. সি. ম্যাক্রিডিস (R. C. Macridis), ডি অ্যাপ্টার (D. Apter), লুসিয়ান পাই (Lucian Pye), এস. ই. ফাইনার (S. E. Finer), সিডনি ভার্বা (Sidney Verba), জে. এস. কোলম্যান (J. S. Coleman), জাঁ ব্লন্ডেল (Jean Blondel) ইত্যাদিরা।

১.৪ তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতির পার্থক্য

তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি উভয়েরই উদ্দেশ্য হল রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা এবং উভয় প্রতিশব্দই অনেক ক্ষেত্রে সম অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে শব্দ দুটির অর্থ এক নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল:—

(ক) তুলনামূলক সরকারের আলোচ্য বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রের আইনগত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন আইনবিভাগ, বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি। তুলনামূলক রাজনীতি এগুলি ছাড়াও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিবাদের সৃষ্টি ও তাদের মীমাংসা, মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার কার্যধারা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈধতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা করে।

(খ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনাক্ষেত্র উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির শাসনব্যবস্থার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্র বিস্তৃততর—এখানে উন্নত পশ্চিমী দেশগুলি ছাড়াও উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থা আলোচিত হয়।

(গ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনায় দার্শনিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের প্রবণতা থাকে। কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা মূল্যমাননিরপেক্ষ। এখানে অভিজ্ঞতাবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রাধান্য পায়।

(ঘ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনা বর্ণনামূলক প্রকৃতির, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা বিশ্লেষণমূলক প্রকৃতির।

(ঙ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনায় আন্তঃসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় আন্তঃসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান এবং গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে প্রাসঙ্গিক

পদ্ধতি ও বিষয়টি তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় গ্রহণ করা হয়। ফলে তুলনামূলক রাজনীতির পরিধি ক্রম-প্রসারিত হচ্ছে।

(চ) তুলনামূলক সরকারের উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ। তুলনামূলক রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ ও গবেষণা করা হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। এজন্য তুলনামূলক রাজনীতি পরিসংখ্যান, গণিত, রেখচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেছে।

(ছ) তুলনামূলক সরকারের আলোচনা প্রাচীন। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সময় থেকে এর আলোচনা শুরু হয়েছিল। পরে ম্যাকিয়াভেলি, বোঁদা, মন্তেস্কু ইত্যাদিরা সেই আলোচনাকে অব্যাহত রেখেছেন। তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা আধুনিক। বিংশ শতকের পাঁচের দশকে মার্কিনী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এর আলোচনার সূত্রপাত করেন।

(জ) যদি তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতির বিবেচ্য বিষয় এক হয়, তা হলেও উভয়ের দৃষ্টিকোণ এক নয়। যেমন যদি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়, তাহলে তুলনামূলক সরকার আলোচনা করবে উভয় দেশের শাসনবিভাগের গঠন ও কার্যাবলি, তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও এক্তিয়ার, তাদের ভূমিকা ও মর্যাদা, অন্যান্য সরকারি বিভাগের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি। অন্যদিকে তুলনামূলক রাজনীতি এই বিষয়গুলি ছাড়াও আরও কিছু দিকের আলোচনা করবে—শাসনবিভাগের ওপর রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব, শাসনবিভাগ কিভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে, শাসনবিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের প্রকাশ ইত্যাদি।

ব্লন্ডেল তুলনামূলক আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন—উল্লম্বী (Vertical) এবং আনুভূমিক (Horizontal)। উল্লম্বী আলোচনা হল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রকৃতিযুক্ত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রভাবযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা আর আনুভূমিক তুলনা হল এক রাষ্ট্রের আলোচনার সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের সরকারের তুলনা। ব্লন্ডেলের মতে, তুলনামূলক আলোচনার এই দুই দিককে সংযুক্ত করলে তা তুলনামূলক রাজনীতির সমার্থক হয় আর তুলনামূলক সরকার হল খালি আনুভূমিক দিকের আলোচনা। ব্লন্ডেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকের ঐকামত্য নেই। তবে বিষয়ের শিরোনাম হিসাবে আধুনিককালে তুলনামূলক সরকারের থেকে তুলনামূলক রাজনীতি প্রতিশব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ প্রতিশব্দটি ব্যাপকতর ও পূর্ণতরভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

সাবেকি ধারার কিছু গ্রন্থ ও তাদের লেখকগণ যাদের আলোচ্য বিষয় হল তুলনামূলক সরকার

অ্যারিস্টটল (Aristotle) দ্বারা লিখিত "Politics", ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-র "The Prince" ও "Discourses", ফ্রেডরিক অগ ও হ্যারল্ড জিঙ্ক (Frederick Ogg ও Harold Zimk) দ্বারা লিখিত

"Modern Foreign Governments", জেমস টি. শটওয়েল (Games T. Shotwell) দ্বারা লিখিত "Governments of Continental Europe", রবার্ট নিউম্যান (Robert Newmann) দ্বারা রচিত "European Government" জি. এম. কার্টার ও জি. এইচ হার্জ (G. M. Carter ও G. H. Herz) এর "Major Foreign Powers", হার্মান ফাইনার (Herman Finer) এর "Major Governments of Europe", মন্তেস্কু (Montesquieu) দ্বারা লিখিত "The Spirit of the Laws" ইত্যাদি।

আধুনিক ধারার কিছু গ্রন্থ ও তাদের লেখকগণ, যাদের আলোচ্য বিষয় হল তুলনামূলক রাজনীতি

ডেভিড ইস্টন (David Easton)-এর "Political System", ডেভিড অ্যাপ্টার (David Apter) দ্বারা লিখিত "The Gold Coast in Transition", লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) দ্বারা রচিত "Politics, Personality and Nation building", ড্যানিয়েল লার্নার (Daniel Lerner)-এর "The Passing of Traditional Society", মইরন ওয়াইনার (Myron Weiner)-এর "The Politics of Scracity", জি. এ. অ্যালমন্ড ও সিডনি ভারবা (G. A. Almond ও Sydney Verba) দ্বারা রচিত "The Civic Culture", রবার্ট হার্ডগ্রেভ (Robert Hardgrave)-এর "India : Government and Politics in a Developing Nation", এস. ই. ফাইনার (S. E. Finer)-এর "Annonymous Empire" ইত্যাদি।

১.৫ তুলনামূলক সরকার থেকে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ

সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তুলনামূলক সরকারের আলোচনা থেকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশকে জি. কে. রবার্টস্ মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন—সরল (Unsophisticated), জটিল (Sophisticated) এবং অতিরিক্ত জটিল (Increasingly complicated) স্তর। সরল স্তরকে তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাচীন যুগ ও আপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ।

১। (ক) সরল স্তর—প্রাচীন যুগ

রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা প্রাচীনকালেও ছিল। প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদ হেরোডোটাস (৪৮৫—৪২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আইন, স্বাধীনতা ও সরকারের ধরনকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে তুলনামূলক আলোচনা করেন। সক্রেটিস (৪৭০—৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এবং প্লেটোও (৪২৭—৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সরকারের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। তবে অ্যারিস্টটলকেই (৩৮৪—৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তুলনামূলক রাজনীতির পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর সমকালীন গ্রীসের ১৫৮টি নগররাষ্ট্রের সংবিধানসমূহের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে অ্যারিস্টটল রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন করেন—শাসনের সংখ্যা ও শাসনের উদ্দেশ্য—এই দুই দিক থেকে। তিনি শাসকের সংখ্যার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে একজনের শাসন বা রাজতন্ত্র, কয়েকজনের শাসন বা অভিজাততন্ত্র এবং বহুজনের শাসন বা পলিটি—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। এই তিনটি শাসন হল আদর্শ রূপ। এদের বিকৃত রূপ তিনটি হল যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র ও গণতন্ত্র। আদর্শ

রূপের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ আর বিকৃত রূপের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্দেশ্য হল শাসক বা শাসকদের কল্যাণ।

অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাজন

শাসনের উদ্দেশ্য	শাসকের সংখ্যা		
	একজন	কয়েকজন	বহুজন
আদর্শ রূপ	রাজতন্ত্র	অভিজাততন্ত্র	পলিটি
বিকৃত রূপ	স্বৈরতন্ত্র	গোষ্ঠীতন্ত্র	গণতন্ত্র

প্রাচীন রোমান দার্শনিকদ্বয় সিসেরো ও পলিবিয়াসও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁরা অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারাকে রোমানা রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজন সংক্রান্ত আলোচনাকে রাজনীতির আইনসংক্রান্ত ও আনুষ্ঠানিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পলিবিয়াস তাঁর "History of Rome" গ্রন্থে বিভিন্ন শাসনের উৎকৃষ্ট রূপ নিয়ে রোমে একটি মিশ্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কনসাল ও প্রেটর, সেনেট এবং জনগণের সভা—এই সংস্থাগুলির মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন এবং প্রতিটি সংস্থাকে অন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সংক্রান্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রভাব আজকের গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলিতেও পরিলক্ষিত হয়। সিসেরো তাঁর "De Republica" গ্রন্থে বিশ্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে ন্যায়, ক্ষমতা ও মানবিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুসংগঠিত আইনব্যবস্থার কথা বলেন, যেখানে স্থানীয় বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে।

১। (খ) সরল স্তর—অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ

নবজাগরণের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে তুলনামূলক রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন ম্যাকিয়াভেলি। ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর সময়ের ইতালীয় রাষ্ট্র এবং ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন এবং তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে সফল শাসকের গুণাবলি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দান করেন। তাঁর দুটি গ্রন্থ—"The Prince" ও "Discourses"-এ তিনি রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাসমূহের বিকাশ ঘটান।

জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment)-র সময় মন্তেস্কু তাঁর "The Spirit of the Laws" গ্রন্থে নতুনভাবে রাজনীতিসংক্রান্ত আলোচনা করেন। তাঁর বিবেচ্য ছিল সংবিধানিক প্রশ্ন—কিভাবে সরকার গঠিত হবে। সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সমাজের সামগ্রিকতার ধারণার ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাজন করেন। তিনি আবহাওয়া জলবায়ু ও পরিবেশের প্রভাবকে গুরুত্ব দেন এবং ভূখন্ডের আয়তন ও শাসকের সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাজন করেন।

মন্তেস্কু-কৃত সরকারের শ্রেণীবিভাগ

শাসকের সংখ্যা	ভূখণ্ডের আয়তন		
	ছোট	মাঝারি	বড়
বহুজন	রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র	×	×
কয়েকজন	অভিজাততন্ত্র	×	×
একজন	×	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে সামাজিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতাবাদ (Historicism) প্রাধান্য লাভ করে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জার্মান চিন্তাবিদ হেগেল ও মার্কসের নাম। জার্মান চিন্তাবিদ্‌দের তত্ত্বগত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এই ধারার সূত্রপাত ঘটে। বিমূর্ত চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে তত্ত্বনির্মাণ ও বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্বের অভাব তাঁদের তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনাকে গুরুত্ববহ করে নি। কিন্তু তাঁদের কিছু ভাবনাচিন্তা—যেমন স্বাধীনতা বা শ্রেণীরাষ্ট্রের ধারণা—খুবই মূল্যবান ছিল। তাঁরা সফলভাবে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক প্রগতি, রাজনীতি ও শিক্ষা বা রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্যাগুলির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সামাজিক শক্তি সংক্রান্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজ বা বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে তুলনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

এরপর ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে সদর্থকবাদ (Positivism) এর প্রাধান্য দেখা যায়। সদর্থকবাদের বৈশিষ্ট্য হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক তত্ত্ব নির্মাণ ও বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা। সদর্থকবাদ অনুসারে সময়-স্থান-পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্মিত হবে, অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাথমিক উপাদানগুলির সাহায্যে বাহ্যজগৎ সংক্রান্ত সামান্যীকরণ নির্মিত হবে এবং এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান হবে নৈর্ব্যক্তিক। সদর্থকবাদ তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা, আনুষ্ঠানিক আইনগত আলোচনা এবং বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত আলোচনাকে উৎসাহিত করে। দার্শনিক ভাবে সদর্থকবাদ, রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, পুরনো সাম্রাজ্যের পতন ও নতুন জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম হল এই সময়ের ঘটনাসমূহ। ফলে নতুন জাতিরাষ্ট্রগুলির শ্রেণীবিভাজন ও বিশ্লেষণ এবং তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আইনগত কাঠামোর ব্যাখ্যা, সংবিধান প্রণয়ন, রাজনৈতিক বিবর্তনবাদ ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত আলোচনার ধারা দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে। উইলহেল্‌ম্ রশানের "Politik" (১৮৪৭ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে লিখিত), থিওডোর উলসির "Political Science" বা "The State Theoretically and Practically Considered" (1878)

এবং উড্রো উইলসনের "The State: Elements of Historical and Practical Politics" (১৮৯৫) গ্রন্থগুলিতে এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

এইসময় রাজনৈতিক বিবর্তনবাদীরা তুলনামূলক আলোচনার ধারাকে বহাল রাখেন। স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine)-এর "Ancient Law" (1861) বা "Early History of Institutions" (1874), এডওয়ার্ড জেন্‌ক (Edward Jenk)-এর "Short History of Politics" (1900) বা "The State and the Nation" (1919), ওপেনহাইমার (Oppenheimer)-এর "The State" (1914) গ্রন্থগুলি এই ধারাকে বহন করে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদরা এই সময় তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনাকে সজীবতা দান করেন। মস্‌কা, ম্যাক্স ওয়েবার, প্যারেটো, মিশেলস্ ইত্যাদিরা বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব নির্মাণ করেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল কর্তৃত্বের ধরন বা বাস্তব ক্ষমতাসম্পর্ক এবং তাঁরা রাজনীতির আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়, যেমন রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, অভিজাত শ্রেণী বা এলিট শ্রেণী ইত্যাদির আলোচনা করেন। জেমস ব্রাইসের "Modern Democracies" (1921) এবং কার্ল জে ফ্রিডরিশের "Constitutional Government and Democracy" (1937) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের আলোচনাকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যবর্তী সেতু বলা যায়। তুলনামূলক রাজনীতি তখনও তার সাবেকি বৈশিষ্ট্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

(২) দ্বিতীয় বা জটিল স্তর

বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে সাবেকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁদের আলোচনার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা যায়। এই সময় মানুষের রাজনৈতিক আচরণকে সামাজিক ক্ষেত্রের অন্যান্য আচরণের সঙ্গে সংযুক্তভাবে পর্যালোচনার প্রয়াস দেখা যায় এবং জটিল স্তরের সূত্রপাত হয়।

এই স্তরের লেখকরা হলেন স্যামুয়েল এইচ বিয়ার, বার্ট্রান্ড উলাম, এম. হাস, রয় সি. ম্যাক্রিডিস ইত্যাদিরা। তাঁরা সকলে তুলনামূলক আলোচনাকে কার্যকরীভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক তুলনার ক্ষেত্রে কলাকৌশল, রেখচিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। প্রথম বা সরল স্তরের লেখকদের থেকে তাঁরা আরও উন্নততর ও আরও বাস্তবসম্মত ভাবে তুলনামূলক সরকারের আলোচনা করেছেন। তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন তুলনামূলক কলাকৌশল হল এলাকাগত সমীক্ষা, পরিসংখ্যানগত আলোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যগত তুলনা, সমস্যাভিত্তিক বক্তব্য, সাধারণ ধারণাবাদ ইত্যাদি। এই স্তরেও তুলনামূলক রাজনীতির সাবেকি বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে গিয়েছিল। তখনও শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়সমূহ। রাজনীতি আলোচনার নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো তখনও গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ তুলনামূলক রাজনীতি স্বমর্যাদায় আসীন হতে পারে নি।

(৩) তৃতীয় বা অতিরিক্ত জটিল স্তর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু (১৯১৪) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ (১৯৪৫) পর্যন্ত সময়ে ইউরোপের রাজনীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতালাভ, ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী দলের উত্থান, জাপানে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বব্যাপী মন্দা, মধ্য ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, ইতালি ও জার্মানির গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে শক্তিশালী স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির সাবেকি তুলনামূলক আলোচনা অপর্যাপ্ত বলে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ধারণাগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। ফলে নতুন আলোকে নতুন পদ্ধতির সাহায্যে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা শুরু হয় এবং তৃতীয় বা অতিরিক্ত জটিল স্তরের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনার সাবেকি ধারাকে পরিবর্তিত করার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্র পাঠ্যবিষয়ের মর্যাদা লাভ করে, কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতির তখন কোন গুরুত্ব ছিল না। ঊনবিংশ এবং পরবর্তী বিংশ শতকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে বোঝানো হত মার্কিন রাজনীতি চর্চাকে। তবে ইউরোপে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিকশিত হয়েছিল আইনের একটি উপশাখা হিসাবে, তাই সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা ছিল আইনানুগ ও আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির। কিন্তু মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রে প্রথম থেকেই অ-আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড, যেমন রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত ইত্যাদির কাজ ও প্রচারকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে তুলনামূলক রাজনীতি সমাদৃত হয়, তখন তুলনাবাদীরা অ-আনুষ্ঠানিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দেন, কারণ তা মার্কিন রাজনীতি চর্চ্চার বৈশিষ্ট্য ছিল।

আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি কমিটি ১৯৫৪ সালে মেনে নেয় যে, প্রযুক্তিগত বিকাশ, যা রাষ্ট্রগুলিকে না হলেও সমস্ত মানুষকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত করেছে, তার সঙ্গে তুলনামূলক সরকারের আলোচনার সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। কমিটি বলে যে তুলনামূলক সরকারের সংকীর্ণ বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা যুগোপযোগী নয়। তাছাড়াও কমিটি মনে করে যে, সাবেকি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কঠোর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—কোনটিই এককভাবে তুলনামূলক আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ ও সফল করতে পারে না—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন ও পদ্ধতিগত নমনীয়তার প্রয়োজন।

কাছাকাছি সময়ে আমেরিকার সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ সংস্থা তুলনামূলক রাজনীতির ওপর একটি গ্রীষ্মকালীন সেমিনারের আয়োজন করে। এখানে সুসংবদ্ধভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের কথা বলা হয়।

এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার তিনটি প্রবণতা দেখা যায়:—

(ক) অ-পশ্চিমী সমাজগুলির অন্তর্ভুক্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে উপনিবেশিকবাদের অবসান ঘটে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে স্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন বিদেশনীতির সাফল্যের জন্য এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজন ছিল। তাদের ওপর গবেষণার জন্য তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটে। ফলে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক মডেলের জন্ম হয়। তা যাতে তৃতীয় বিশ্বে প্রসারিত না হয় তা আমেরিকার কাছে বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গৃহীত হয়। তাই তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি মার্কিন তুলনামূলক রাজনীতিবিদ্‌গদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। তৃতীয় বিশ্বে বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপস্থিতি তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনা, তত্ত্বগঠন ও প্রয়োগের নতুন সুযোগ এনে দেয়।

(খ) বৈজ্ঞানিক কঠোরতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তুলনামূলক আলোচনার বর্ণনাগত বৈশিষ্ট্যকে অনেকে অপর্যাপ্ত বলে গণ্য করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প থেকে জানা যায় যে পদ্ধতিগত উপকরণ গবেষণার কাজকে নানাভাবে সাহায্য করে। আচরণবাদীদের আবির্ভাব, তাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, পরিমাপ ও পরিমাণের ওপর গুরুত্ব, পরীক্ষণের ওপর জোর ইত্যাদি তুলনামূলক আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক ও কঠোর হতে উৎসাহিত করে। ব্যবস্থাপক তত্ত্ব, কাঠামো কার্যগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রাধান্য পেতে থাকে।

(গ) সামাজিক পরিমণ্ডলের স্বীকৃতি

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উপলব্ধি করেন যে সেখানে রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য দিকগুলি স্বতন্ত্র নয়, বরং নানাভাবে যুক্ত, যা পশ্চিমী সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমী সমাজে রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য দিকগুলি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক দিক ও রাজনীতির মিশ্র অস্তিত্ব দেখে পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতির আলোচনার সঙ্গে নতুনভাবে রাজনীতির সামাজিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

নতুনভাবে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ

আচরণবাদী বিপ্লব বিংশ শতকের পাঁচের দশকে তুলনামূলক আলোচনাকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৫৩ সালে ডেভিড ইস্টনের "The Political System" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাগুলি বদলে ফেলার সুপারিশ করেন। রাজনীতি সংক্রান্ত তাঁর নতুন ধারণা অনুসারে রাজনীতি কয়েকটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের সর্বত্র প্রসারিত। তাঁর 'ব্যবস্থাপক তত্ত্ব' রাজনৈতিক বিশ্লেষণের নতুন কাঠামো নির্মাণ করে, যা রাজনীতিকে একটি প্রক্রিয়া বা প্রবাহ হিসাবে

গণ্য করে, যার মাধ্যমে রাজনীতি ও সমাজের আদানপ্রদান ঘটে—উপকরণ (input) ও উপপাদ (output) আকারে। তার সঙ্গে তিনি প্রেরক পদ্ধতি (feedback) কেও যুক্ত করেন। রাজনৈতিক শাসনকে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন, যা তাঁর মতে, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। পরিবেশের প্রভাবের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর কাজ পরিবেশের উন্নতি ঘটায়, আর একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমনপীড়ন নীতি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত করে। ইস্টনের মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিজস্ব কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে, যাদের সাহায্যে ব্যবস্থাটি বাইরের বা ভেতরের চাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়। ইস্টনের বক্তব্যগুলি তাঁর সময়ের প্রয়োজন ও মনোভাবকে প্রকাশ করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাকে নতুন দিশা দান করে এবং সাবেকি তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার অবসান ঘটায়।

সমাজ ও রাজনীতির সংযুক্তির উপলব্ধির থেকে এ সময় দেখা দেয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা। সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক দিককে আগেই সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা আলোচনা করেছিলেন। এই সময় রাজনীতির আলোচনায় সাংস্কৃতিক দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড, সাম্যুয়েল এইচ. বিয়ার ইত্যাদিরা রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বা প্রতীকসমূহের ভূমিকা এবং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কিভাবে নাগরিকরা সমাজের মূল্যবোধ আয়ত্ত করে তার অনুসন্ধান শুরু করেন। সমাজতত্ত্ববিদ ট্যালকট পারসনস্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যালমন্ড উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্যের আদর্শ মডেল নির্মাণ করেন। কোলম্যানের সঙ্গে লিখিত তাঁর "The Politics of Developing Areas" গ্রন্থটি তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

একই সময়ে প্রকাশিত ডব্লিউ, ডব্লিউ. রস্টো (W. W. Rostow)-র "Stage of Economic Growth" গ্রন্থে বিকাশ বা উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। তাঁর মতে উন্নয়নের জন্য সব দেশকেই একই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং উন্নয়ন বলতে তিনি পাশ্চাত্যকরণ (Westernisation) কে বোঝান। ডানিয়েল লারনার (Daniel Lerner)-এর "The Passing of Traditional Society", 1858 কার্ল ডয়েটশ (Karl Deutsch)-এর "Social Mobilization and Political Development", 1962 এবং এস. এম. লিপসেট (S. M. Lipset)-এর "Political Man", 1959 গ্রন্থগুলিতে সমজাতীয় ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

এইসব বিভিন্ন গ্রন্থগুলি বিংশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়নের এক বিশ্বজনীন মডেল উপস্থাপিত করে, উন্নয়ন ও পাশ্চাত্যকরণকে সমার্থক বলে গণ্য করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিমাপ করার শর্তগুলি স্থির করে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের উদারনীতিবাদ, বহুত্ববাদী সমাজ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি উপাদানগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই প্রচেষ্টা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কিন্তু শীঘ্রই উন্নয়ন তত্ত্বের ত্রুটিগুলি নজরে আসে। যে দেশের প্রতিষ্ঠান বা রাজনীতি পশ্চিমী

গণতন্ত্রের মত স্বার্থ সমষ্টিকরণ বা স্বার্থ প্রকটন করত না, বা যে দেশের রাজনৈতিক কাঠামো বা কাজ পশ্চিমী গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলত না, তাদের ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়। ফলে উন্নয়ন তত্ত্বটি শীঘ্রই পক্ষপাতদুষ্ট, জাতিকেন্দ্রিক ও অবিশ্বজনীন বলে প্রতিভাত হয়। মার্কসবাদীরা এই তত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন, তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম, নয়া উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক নির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বলেন যে উন্নয়নতত্ত্বের সার্বজনীনতার নামে কোন বিশেষ দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে অবহেলা করা ঠিক নয়, কারণ—প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। রাজনীতির বাস্তব জগতের নানা পরিবর্তনও উন্নয়নতত্ত্বের বিপর্যয় ডেকে আনে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি উন্নয়ন তত্ত্বের প্রতিশ্রুতিমত গণতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

এই সময় প্রকাশিত হয় হান্টিংটনের "Political Order in Changing Societies" (1968) গ্রন্থটি; তাতে বলা হয় যে পশ্চিমের অনুকরণে সামাজিক সচলতা ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবল করার বদলে কমজোরি করে দিতে পারে। হান্টিংটনের বক্তব্যকে ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯৭০ সাল নাগাদ উন্নয়ন তত্ত্বের গুরুত্ব কমে যায়।

আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা হল:—

(ক) মার্কসবাদ (Marxism) : মার্কসবাদীরা সামাজিক পটভূমির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনাকে উৎসাহ দেন এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ভিত্তি বা উৎপাদনব্যবস্থা এবং উপরিকাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্কের আলোচনার ওপর জোর দেন। তাঁরা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা উদারনীতিবাদীদের ব্যাখ্যার থেকে স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। সাম্য, স্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত মার্কসীয় ধারণাগুলি উদারনীতিবাদীদের এই সব ধারণা থেকে অন্যরকম।

(খ) কর্পোরেট বাদ (Corporatism) : উন্নয়ন তত্ত্ববাদীদের বহুত্ববাদী সমাজের ধারণার বদলে কর্পোরেটবাদ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার কথা বলে।

(গ) নির্ভরতার তত্ত্ব (Dependency Theory) : এই তত্ত্ব অনুসারে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির ওপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে ওঠার সুযোগও কম।

(ঘ) বিশ্বায়নের নতুন তত্ত্ব (New Theory of Globalisation) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সব রাষ্ট্রগুলিকে একটি পরস্পর-নির্ভরশীল বিশ্বের অধীনে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এজন্য প্রথমে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই সময় জাতীয়তাবাদের মনোভাবকে বজায় রেখে আন্তর্জাতিকতার বন্ধনকে উৎসাহিত করা হয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। তারপর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান, যোগাযোগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, ভোগ্যদ্রব্য ও মানবসম্পদ বিনিময়, ভ্রমণ, খোলাধুলা ইত্যাদির

মাধ্যমে পরস্পর-নির্ভরশীলতার নতুন শক্তি, সুযোগ ও সম্ভাবনার উন্মেষ হয়।

ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীকে এক বিশ্বের ধারণার অধীনে আনার প্রয়াস শুরু হয় প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আয়োজিত ৪৪টি রাষ্ট্রের সংযোগে ব্রেটন উডস (নিউ হ্যাম্পশায়ার) সম্মেলন থেকে। ফলে সারা বিশ্বে পুঁজির সঞ্চালন ও মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার এক সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যায়, যার নিয়ামক হল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বিশ্বায়নের এই জাল জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি বা রাষ্ট্রসমূহের সামগ্রিক উন্নয়ন আনতে পারে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলির প্রভুত্ব ও শক্তি বেড়েছে কিনা বা অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে একথা ঠিক যে, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রগুলির সাবেকি ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে রাজনীতিকে বিশ্লেষণের জন্য এক সর্বজনস্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত কাঠামো নির্মাণের যে পরিকল্পনা দেখা গিয়েছিল, তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়। নানা নতুন নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। ফলে তুলনামূলক রাজনীতিতে তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। তুলনামূলক রাজনীতির গবেষকরা এই তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে মুক্ত মনে গ্রহণ করেন।

তাছাড়াও রাজনীতির পশ্চাতে অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিককালে তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতিগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমীক্ষা গবেষণা (Survey research), সময়চক্র (Time Series), জনমতসমীক্ষা, নির্বাচনী আচরণ পর্যালোচনা ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়েছে। তুলনামূলক রাজনীতিতে খণ্ডগত (micro) এবং সমষ্টিগত (macro) উভয় দিক থেকেই রাজনীতি আলোচনা করা হয়। এখন তুলনামূলক অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধান ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণ করা হচ্ছে। তুলনামূলক রাজনীতিতে এখন যে তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা তুলনামূলক আলোচনাকে আরও বাস্তবমুখী করবে বলে আশা করা যায়।

১.৬ তুলনামূলক রাজনীতি বিকাশের কারণসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনার যে ধারা ও যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে এবং তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রটি নতুনভাবে, নতুন আকারে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ নতুন রূপে তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের কারণগুলি হল:—

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বের মানচিত্রে নানা পরিবর্তন হয়। পুরোনো উপনিবেশবাদ অপসৃত হয় এবং অনেক নতুন জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের বহু রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনার এক অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা, নতুন নতুন মতবাদ ও নানা রকম পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেগুলি আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশ ঘটায়।

(খ) রাজনীতির সাবেকি তুলনামূলক আলোচনা ছিল উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শাসনব্যবস্থার পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে এবং আন্তর্জাতিক আঙিনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাবেকি তুলনামূলক পদ্ধতি পর্যাপ্ত ছিল না। কোনো কোনো নতুন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোথাও কোথাও তারা সফল হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে নয়। অনেক নতুন জাতিরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সরকারের স্থায়িত্বহীনতা সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। সেগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এদের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনার জন্য সাবেকি পদ্ধতি ছেড়ে নতুনভাবে তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনা শুরু হয় এবং তুলনামূলক রাজনীতির বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে।

(গ) উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় পশ্চিমী প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে আদর্শ বলে গণ্য করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যে কোন ব্যতিক্রমকে সাময়িক বিচ্যুতি বলে মনে করা হতো। ফলে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আলোচনার মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী লেখকরা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ব্যতিক্রম, এমন কি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও বিচ্যুতি বলে মানতে পারেন নি। তাই সাবেকি তুলনামূলক আলোচনার বদলে তাঁরা ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর তুলনামূলক আলোচনা পরিচালনা করেন।

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ভূমিকা ও বিদেশনীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পুরোনো মানরো নীতি (Munroe Doctrine) ও তার বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরিত্যাগ করে বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজ বিদেশনীতি নির্ধারণের জন্য মার্কিন সরকার বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রসংক্রান্ত তথ্যাদির প্রয়োজন বোধ করে। সেজন্য মার্কিন সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বা অঞ্চলে রাজনীতির তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। তা ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে তুলনামূলক রাজনীতি সংক্রান্ত গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়।

(ঙ) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট মতাদর্শ-ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার নতুন ধরনের মডেল সৃষ্ট হয়। এই নতুন ব্যবস্থার সংগঠন ও

কার্যাবলি, তৃতীয় বিশ্বে তাদের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নতুনভাবে তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনা করা হয়।

(চ) ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতাদর্শগত লড়াই ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা বা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলিকে নিজ আওতায় আনার জন্য ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন উপলব্ধি করে যে বিদেশনীতি নির্ধারণের পুরনো কৌশলগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধুমাত্র জাতীয় সরকারের কাজকর্ম ও জাতীয় রাজনীতির কাঠামো সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাই যথেষ্ট নয়। বিদেশের শাসনব্যবস্থা এবং সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দরকার। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্নায়ুযুদ্ধের পরিবেশ তুলনামূলক রাজনীতির অনুশীলনে নতুন দিশা দান করে।

(ছ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ হয়। আগে অল্প কিছু লোকের ভোটাধিকার ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের ভোটাধিকার না থাকায় আইন ও শাসনবিভাগ খালি অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করত। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। আইন ও শাসনবিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায় বাধ্য হচ্ছে। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি আইন বা শাসনবিভাগের সদস্য হচ্ছেন এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনও তুলনামূলক রাজনীতি পাঠকে প্রভাবিত করেছে।

(জ) আচরণবাদের আবির্ভাবের ফলে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় রাজনীতিকে নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। আচরণবাদ রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় উপাদানের মিশ্রণ বলে মনে করে, আচরণবাদী তত্ত্বসমূহ রাজনীতির বাস্তব দিককে প্রাধান্য দেয় এবং কিছু তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করে। আচরণবাদী তত্ত্ব ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠনের আচরণকে প্রাধান্য দেয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সংখ্যায়ন, গবেষণামূলক সমীক্ষা ইত্যাদির সাহায্য নেয়। আচরণবাদ নতুনভাবে তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনার জন্য উৎসাহ জোগায়।

(ঝ) আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত রাজনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির আবির্ভাব, স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের কার্যাবলির প্রসার ও সরকারের ওপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধি, রাজনীতির সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্ব ইত্যাদি আধুনিক ঘটনা ও বিষয়গুলি কখনও এককভাবে, কখনও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রকে পরিবর্তিত করে। সাবেকি পদ্ধতির ভিত্তিতে এগুলির আলোচনা সম্ভব ছিল না। ফলে নতুনভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনার প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকেও বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তুলনামূলক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞরা তুলনামূলক সমীক্ষার ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব ও মডেল নির্মাণ করছেন।

১.৭ সারসংক্ষেপ

সাবেকী তুলনামূলক সরকার শাস্ত্রটি থেকে আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রটির আবির্ভাব ঘটেছে বিংশ শতকের মাঝামাঝি। আবির্ভাবের পর থেকেই শাস্ত্রটির পরিধি ক্রমবর্ধমান। সাবেকী তুলনামূলক সরকারের আলোচনায় থাকতো বিভিন্ন ধরণের সংবিধান, সরকার ও শাসনব্যবস্থার তুলনা। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে দেখা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহের তুলনা—যার অন্তর্গত হল সংবিধান, সরকার ও শাসনব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের অ-রাজনৈতিক কাজ বিষয়সমূহ, যেমন স্বার্থগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের কাজ ইত্যাদির তুলনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে গণ্য করে তুলনামূলক রাজনীতি শুধুমাত্র রাজনীতির আনুষ্ঠানিক দিক নয়, অ-আনুষ্ঠানিক কিছু বিষয়সমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে। তুলনামূলক রাজনীতিতে তাই দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক বৈধতা, রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

তুলনামূলক সরকারের আলোচনার মত তুলনামূলক রাজনৈতিক আলোচনা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য দেশগুলির আলোচনার মধ্যে সীমিত নয়। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির আলোচনাও এখানে প্রাধান্য পায়। তুলনামূলক রাজনীতি আবার নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান এবং গণিত, রাশিবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে বিভিন্নপ্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়অও তুলনামূলক সরকারের মূল্যমান যুক্ত আলোচনার বদলে তুলনামূলক রাজনীতি প্রবর্তন করে মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনা। অঅধুনিক তুলনামূলক রাজনীতি বিশেষ করে সামাজিক পরিবেশ ও রাজনীতির পারস্পরিক প্রভাবকে গুরুত্ব দান করে।

তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনা ও বাস্তবতাসমূহ বিশেষভাবে গুরুবহ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল উপনিবেশবাদের অবসান, আফ্রো-এশীয় বহুদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, নতুন এশীয় দেশগুলিতে বিভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, কমিউনিস্ট জগতের বাইরে অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের আবির্ভাব, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

তুলনামূলক রাজনীতিতে দেখা যায় ছক, চার্ট, পরিসংখ্যান ইত্যাদির বহুল ব্যবহার, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি সমূহ, নতুন নতুন বিভিন্ন ধারণ (রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ) এবং নতুন নতুন তত্ত্বের বিকাশ (ব্যবস্থাপক তত্ত্ব, কাঠামো কার্যগত মতবাদ, যোগাযোগ তত্ত্ব, অঅচরণবাদ, গোষ্ঠী তত্ত্ব ইত্যাদি)।

১.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক রাজনীতি ও তুলনামূলক সরকারের তুলনা করুন।

২. তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২. তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

৩. তুলনামূলক রাজনীতি উপযোগিতা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক সরকার ও তুলনামূলক রাজনীতি কি একই বিষয়? উত্তরের সপক্ষে দুটি যুক্তি দিন।

২. তুলনামূলক রাজনীতি বলতে কি বোঝেন?

৩. তুলনামূলক রাজনীতি আলোচনা করে এমন চারটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৪. তুলনামূলক রাজনীতির বিকাশের দুটি উপাদান লিখুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী :

1. Almond, Gabriel A and Powell G. Bingham : Comparative Politics : A Developmental Approach, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1975.
2. Almond Gabriel A and Verba, S. : The Civic Culture, Princeton University Press, Princeton, 1960.
3. Chatterjee, Rakhahari : Comparative Politics : History, Methods and Approaches, Bagchi & Co. Ltd., Calcutta, 1998.
4. Curtis, Michael & Others : Introduction to Comparative Government, Harper Collins Publishers, New York, 1990.
5. Finer, S. E. : Comparative Government, Penguin Press, Great Britain, 1975.
6. Johari, J. C. : Copmparative Politics, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.

একক ২ ☐ তুলনামূলক পাঠ-পদ্ধতি; তুলনামূলক পাঠের সুবিধাসমূহ ঃ সমধর্মী ও ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার তুলনা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ তুলনার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

২.৩.১ তুলনার উদ্দেশ্য

২.৩.২ তুলনার বিষয়বস্তু

২.৩.৩ তুলনার পদ্ধতি

২.৩.৪ তুলনামূলক রাজনীতিতে আলোচিত তুলনামূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.৩.৫ তুলনামূলক পদ্ধতির কৌশলসমূহ

২.৪ সাদৃশ্যমূলক ও বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা, দেশ বা তাদের এককের তুলনা

২.৫ তুলনামূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

২.৬ তুলনামূলক আলোচনার উপযোগিতা

২.৭ সারসংক্ষেপ

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সুচিন্তিত মতামত ও সুচারু বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা ঃ

- তুলনামূলক রাজনীতিতে ব্যবহৃত তুলনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুসমূহ।
- তুলনামূলক বিভিন্ন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও কৌশলসমূহ।

- সাদৃশ্যমূলক ও বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা, দেশ বা তাদের এককসমূহের তুলনা।
- তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা।
- তুলনামূলক আলোচনার উপকারিতা।

২.২ ভূমিকা

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হল বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা করা এবং মানবসমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দগুচ্ছের মধ্যে এই তুলনামূলক প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি দেশকে উন্নত বললে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'ধরনের দেশের কথা মনে হয়—অনুন্নত ও উন্নয়নশীল। আবার একটি মানুষকে বুদ্ধিমান বললে অন্য দু'ধরনের ব্যক্তিদের কথা মনে হয়—বোকা এবং বুদ্ধিমান ও বোকার মধ্যবর্তী ব্যক্তিগণ। তুলনামূলক ইঙ্গিত সাধারণত আলোচ্য বিষয়কে পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তুলনার ব্যবহার ও তার একই রকম কার্যকারিতা দেখা যায়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনার উপযোগিতাকে স্বীকার করেন। পিটার এইচ. মার্কেল বলেছেন, দেশ, বিদেশ বা আন্তর্জাতিক রাজনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন করার উপায় হিসাবে পরিশীলিত তুলনা সব সময়েই অপরিবার্য। জেমস্ কোলম্যান মনে করেন যে তুলনা না করলে বিজ্ঞানসম্মত হওয়া যায় না। রজনী কোঠারির মতে, রাজনীতির অর্থবহ অধ্যয়ন করতে হলে তা করা উচিত তুলনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ, যাবতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তুলনার প্রয়োজন। তবে যে শাস্ত্রটি বিশেষীকৃতভাবে বিভিন্ন সরকারের রূপ বা বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক চর্চা করে, তাকে তুলনামূলক রাজনীতি বলে।

আধুনিককালে বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনীতি চর্চার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যখন কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে চান, তখন তাঁদের আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার সন্ধান করতে হয় আর জাতি বা রাষ্ট্র বা অন্যান্য স্তরে তুলনার মাধ্যমে সেই বিভিন্নতার খোঁজ পাওয়া যায়। একইভাবে যখন কেউ কোন প্রকল্পের যথার্থ্য নিরূপণ করে বা সামান্যীকরণের প্রচেষ্টা করে, তখন তুলনা হল প্রকল্পের শক্তি বা সামান্যীকরণের বৈধতা নিরূপণের একমাত্র উপায়।

বিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা ছিল তুলনামূলক সরকার ও শাসনব্যবস্থার আলোচনা। বিংশ শতকের মাঝামাঝি তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা প্রাধান্য পায় আর তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁরা তুলনামূলক সরকার ও শাসনব্যবস্থার বদলে তুলনামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করেন। পুরোনো কালের সরকার ও শাসনব্যবস্থার তুলনা আর আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা এক

নয়। আধুনিক তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের তুলনার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চরিত্রযুক্ত।

২.৩ তুলনার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

২.৩.১ তুলনার উদ্দেশ্য

তুলনামূলক রাজনীতির প্রধান বিচার্য বিষয় হল তুলনা বা তুলনামূলক বিশ্লেষণ, যা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অভিমুখে পরিচালিত হয়। তুলনাকারীর উদ্দেশ্য হল তুলনার মাধ্যমে অনুমান গড়ে তোলা, যা রাজনীতি শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করবে বা যে তাত্ত্বিক কাঠামোটি প্রচলিত, তার অনুকূলে তথ্য ও যুক্তি সংগ্রহ এবং সূত্র অনুসন্ধান করবে। সংখ্যাতত্ত্ব, গণিত, রেখচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে তুলনাকারীর বক্তব্য ও আলোচনা পরিচালিত হয়। তুলনামূলক রাজনীতি অনুসারে একমাত্র তুলনার সাহায্যেই কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ বা অনুমানের যথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যায়।

২.৩.২ তুলনার বিষয়বস্তু

তুলনামূলক রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের মতে, তুলনামূলক আলোচনা শুরু করার আগে কোন্ কোন্ বিষয়ের তুলনা করা হবে, তা ঠিক করতে হবে। তুলনামূলক রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে, বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে এবং সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ ও জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হয়ে থাকে। সমজাতীয় রাজনৈতিক কাঠামোযুক্ত দেশগুলির মধ্যে যেমন তুলনা করা হয়, তেমনই অসমজাতীয় বা পৃথক ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোযুক্ত দেশগুলির মধ্যেও তুলনা করা হয়।

সমষ্টিগত (Macro Level) স্তরে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা এবং খণ্ডগত স্তরে (Mico Level) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে তুলনা—দু'ধরনের তুলনাই তুলনামূলক রাজনীতির বিবেচ্য। উভয় ক্ষেত্রেই তুলনাকারীকে প্রথমে বিচার্য বিষয় নির্বাচন করতে হয়।

সমষ্টিগত স্তরে বহুসংখ্যক জাতীয় রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকায় তাদের সবগুলিকে নিয়ে তুলনা অসম্ভব। প্রথমে তুলনার বিষয়বস্তু বা বিষয়বস্তুসমূহ স্থির করে নির্বাচন করতে হবে জাতীয় রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকে। যে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়, তাদের সঙ্গে যুক্ত কিছু গৌণ বিষয়ও তুলনার স্বার্থে অর্থবহ হতে পারে। তাদের মধ্যে কোনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা তুলনাকারীকে ঠিক করতে হবে। দুই বা তার বেশি রাষ্ট্রে মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ কীভাবে কাজ করছে, সে সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে গৌণ কিছু বিষয়, যেমন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির

কাজ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হার, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তুলনার স্বার্থে গৌণ কোন বিষয়কে প্রাসঙ্গিক মনে করা হলে তুলনাকারী তাকে গ্রহণ করবেন এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে বর্জন করবেন।

খণ্ডগত স্তরে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ, যেমন শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, দলব্যবস্থা ইত্যাদির তুলনা করা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনা, মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনা, ফ্রান্স ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির তুলনা ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে ফিলিপ সি. স্মিটার বলেছেন যে বিষয় হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতি হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি শিক্ষাদান ও গবেষণার ক্ষেত্র, যা সাধারণত অন্যান্য মানুষ বা দেশসমূহের রাজনীতি আলোচনা করে। তুলনামূলক রাজনীতি অন্য দেশের রাজনীতির কোন নির্দিষ্ট দিক বা বিষয়কে আলোচনাক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে না, যে কোন দিক বা সব দিকই আলোচ্য হতে পারে। আবার একদেশীয় আলোচনার প্রথাও তুলনামূলক রাজনীতিতে আছে যেমন ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman)-এর "Governmental Process" প্রধানত মার্কিন গোষ্ঠী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত রচনা হলেও তা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনামূলক রাজনীতির পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

তুলনামূলক রাজনীতির বৃহৎ ও ব্যাপক আলোচনাক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করা বা নির্দিষ্ট করা কঠিন। তুলনামূলক রাজনীতির ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকাশনাগুলি থেকে— কোলম্যান (Colman)-এর "Education and Political Development" (1965), রবার্ট ডাল (সম্পাদিত) (Robert Dahl) (ed.)-এর "Political Opposition in Western Democracies" (1966), লিজফার্ট (Lijphart)-এর "The Politics of Accomadation: Pluralism and Democracy in the Netherlands" (1975), ডড (Dodd)-এর "Coalitions in Parliamentary Government" (1976), এস. বার্নস (S. Barnes)-এর "Representation in Italy" (1977), টাগওয়েল (Tugwell)-এর "The Politics of Oil in Venezuala" (1975), ডাল্টন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (Dalton et all) (ed.) "Electral Change in Advanced Industrial Democracies" (1984), গরভিচ (Gourevitch)-এর "Unions and Economic Crisis" (1984), ক্যাজেনস্টাইন (Katzenstein)-এর "Corporation and Change" (1984), আমস (Ames)-এর "Political Survival: Politicians and Public Policy in Latin America" (1987), গ্র্যান্ট (Grant)-এর "Business Interest, Organizational Development and Private Interest Government" (1987), বেটস (Bates)-এর Beyond the Miracle of the Market: The Political Economy of Agrarian Development in Kenia" (1989), একেভেরি-জেন্ট (Echeverri-gent)-এর "The State and the Poor: Public Policy and Development in India and the United States" (1993) ইত্যাদি।

২.৩.৩ তুলনার পদ্ধতি

পদ্ধতি শব্দটির অর্থ হল সুবিন্যস্ত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যবস্থা। তুলনামূলক রাজনীতির উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ ও যাচাই করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তত্ত্বগঠন করা। তুলনামূলক রাজনীতির এই উদ্দেশ্য অভিমুখে পৌঁছনোর উপায় হল তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহ। তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীতে প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহ বা ব্যবস্থাসমূহের অংশবিশেষ হল আলোচনার একক। তুলনামূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে এই একক সংক্রান্ত তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়, এককটির কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা হয়, ত্রুটিবিচ্যুতির অনুসন্ধান করা হয় এবং তাদের নিরসনের পন্থার ওপর আলোকপাত করা হয়। ফিলিপ সি. স্মিটারের মতে, তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক পদ্ধতি হল রাজনৈতিক এককসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বার করার এক বিশ্লেষণমূলক প্রচেষ্টা, যাদের ভিত্তিতে সুসংগঠিত তত্ত্বনির্মাণ, প্রকল্পের যথার্থ্য নিরূপণ, কারণসমূহের অনুমান এবং নির্ভরযোগ্য সামান্যীকরণ সম্ভব হয়। লিজফার্ট তুলনামূলক পদ্ধতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি একটি। লাসওয়েলের মতে, তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনার কোন পদ্ধতিগত অর্থ নেই, কারণ যে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তুলনা অবশ্যম্ভাবী। অ্যালমন্ড আবার তুলনাকে পদ্ধতি নয়, দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে দেখেন। তবে এ জাতীয় বিতর্ক বা মতবিরোধ থাকলেও তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক পদ্ধতি রাজনীতির গবেষকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

প্রধানত আচরণবাদী পদ্ধতি তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর্থার বেন্টলে ও গ্রাহাম ওয়ালাসের বক্তব্য, চার্লস মেরিয়মের নেতৃত্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো গবেষক গোষ্ঠীর সহায়তা এবং মার্কিন সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদিদের পৃষ্ঠপোষকতা আচরণবাদী গবেষণাপদ্ধতিকে উৎসাহ দান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আচরণবাদের গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন কৌশল, পদ্ধতি ও নতুন দিশা দেখা যায়—নিয়মানুবর্তিতা, সত্যযাচাই, পরিসংখ্যান, মূল্যনিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ এবং এগুলির ভিত্তিতে তত্ত্বগঠন ও সূত্র নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। আচরণবাদ এক পদ্ধতিগত বিপ্লবের সূচনা করে। ডেভিড ইস্টন, অ্যালমন্ড, পাওয়েল, সিডনি ভার্বা, কোলম্যান, লুসিয়ান পাই, ড্যানিয়েল লারনার, কার্ল ডয়েটস্, পল লাজারাসফেল্ড, জাঁ ব্লন্ডেল, রবার্ট ডাল, ডেভিড অ্যাপ্টার, আর্নল্ড লিফার্ট তুলনামূলক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের বিকাশ ঘটান।

বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতিতে যেসব আধুনিক তুলনামূলক পদ্ধতিগুলি অভিজ্ঞ গবেষকমহলে সাধারণভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলি হল—

(১) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি প্রয়োগ করে মডেল বা তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্গত কয়েকটি পদ্ধতি হল—

(ক) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method) :

এই পদ্ধতির মূল কথা হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ। আচরণবাদীরা মনে করেন যে রাজনীতি হল পরীক্ষণের এক বিশেষ ক্ষেত্র। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা প্রক্রিয়াসংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তত্ত্ব গঠিত হয়, মডেল নির্মিত হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়নের মডেল, নির্বাচকদের আচরণ ইত্যাদি প্রশ্নে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োগ হল পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উদাহরণ।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হল—

(i) দুটি এক ধরনের বা সমতুল এককে ব্যবহার করে এদের উভয়কে এক নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখে (পরীক্ষাগারে) কোন একটির ওপর উদ্দীপক প্রভাব সৃষ্টি করা হবে।

(ii) একটি বিশেষ সময় ধরে পরীক্ষা চলবে।

(iii) পরীক্ষার সময় শেষ হলে দুটি এককের (একটি স্থির এবং অন্যটি উত্তেজিত) মধ্যে তুলনা করা হবে।

(iv) একক দুটির মূল অবস্থানের মধ্যে যে বিচ্যুতি দেখা যাবে, তা ওই উদ্দীপকের প্রভাবের ফল এবং উদ্দীপকটি বিচ্যুতির কারণ বলে গৃহীত হবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বস্তুর ওপর যতটা নিয়ন্ত্রণ আছে, সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ততটা থাকে না। তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে সঠিকভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বস্তুর ওপর সেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সেখানে সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকারণ সম্পর্কের অনেকটা কাছাকাছি যেতে পারে।

(খ) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method) :

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি হল পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অন্যতম বিকল্প পন্থা। এই পদ্ধতি সমাজের প্রচলিত অবস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যের সাহায্যে সরকারি নীতি ও কার্যপ্রণালীর বিশ্লেষণ করে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় এবং চার্ট, ছক, রেখচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে সমাজ ও মানুষের ওপর সরকারী নীতিসমূহের প্রভাব আলোচনা করা হয়। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, নির্বাচনী আচরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা থেকে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে জানা যায়।

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুটি কিংবা বহু এককের প্রয়োজন, যাতে তাদের ভিন্নতাকে পরিবর্তনীয় উপাদানের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানের সাহায্যে তুলনার মধ্যে আনা যায় সেজন্য। নির্বাচকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন্ কোন্ শক্তি—তা পরিসংখ্যান সহযোগে ব্যাখ্যা করা যায়। শিক্ষা, শ্রেণী, পেশা, লিঙ্গ ইত্যাদি

সব কিছুকেই পরিসংখ্যানের আওতায় আনা যায়। প্রতিটি বিষয়ের খণ্ডগত (Micro) এবং সমষ্টিগত (Macro) উভয় ধরনের তুলনাই এই পদ্ধতির সাহায্যে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই পদ্ধতির ব্যবহারই বেশি, কারণ এই পদ্ধতি পরীক্ষাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে পরীক্ষা করে না, রাষ্ট্র সমাজ, মানুষ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ইত্যাদিকে পরিসংখ্যান সহযোগে ব্যাখ্যা করে।

(গ) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method) :

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যসমূহের পরীক্ষানিরীক্ষা করে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনাকে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা হয়। সমীক্ষামূলক গবেষণা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি হল এ জাতীয় পদ্ধতির উদাহরণ।

(ঘ) অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি (Empirical Method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে তুলনামূলক আলোচনা হল বাস্তব ঘটনাসমূহের আলোচনা—যা ঘটে, যা ঘটছে বা যা ঘটে থাকে—তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা হল অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এই পদ্ধতি গুরুত্ব দেয়—কল্পনা বা আধিভৌতিক বিষয়সমূহকে নয়।

(২) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) :

লিজ্‌ফার্টের (Lijphart) মতে তুলনামূলক রাজনীতি যতখানি সম্ভব ততখানি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করে, আর বিস্তৃতভাবে পরসিংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করে এবং তৃতীয় বিকল্প হিসাবে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

যদি তুলনার একক ছোট ভৌগোলিক এলাকা (জেলা) হয়, তাহলে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়। পরিসংখ্যানগত ভাবে অনেক জেলা বা জাতিরাষ্ট্রের তুলনা করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য থাকায় সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি নির্বাচিত বিষয়কে গভীরভাবে তুলনার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। এই পদ্ধতির আলোচনাক্ষেত্র ছোট—বেশি বিষয় একসঙ্গে তুলনা করা হয় না। নথিপত্র ও সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে তুলনা পরিচালিত হয়।

তুলনামূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হল—

১। তুলনার যোগ্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহকে তুলনার আওতায় আনা হয়, যেমন স্বার্থগোষ্ঠী বা বিরোধী দলের কাজ সংক্রান্ত তুলনা বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সামাজিকীকরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থা, জনমত গঠন ইত্যাদি বিষয়সমূহের তুলনা বা ধর্ম, শ্রেণী, লিঙ্গ, এলিট প্রভাব ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের তুলনা।

২। তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন এককের মিল বা সাদৃশ্য এবং অমিল বা বৈসাদৃশ্য খোঁজার প্রচেষ্টা করা হয়। লিজফার্ট অবশ্য মিল বা সাদৃশ্য খোঁজা কেই বেশি গুরুত্ব দেন।

৩। তুলনামূলক পদ্ধতি পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির মত বেশি বিষয়সমূহের তুলনা করে না, এই পদ্ধতির এলাকা ক্ষুদ্র।

৪। তথ্য, নথিপত্র ও সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে তুলনা করা হয়। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে দেখা হয় একই ধরনের দুটি ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও, কোন একটি বা দুটি বা তার বেশি ক্ষেত্রে অমিল কেন আছে, বা দুটি ব্যবস্থার মধ্যে অমিল থাকলেও কোন একটি বা দুটি বা তার বেশি ক্ষেত্রে মিল কেন আছে।

৫। তুলনামূলক পদ্ধতি একটি ব্যবস্থার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য কেন আছে তার কারণ অনুসন্ধান করে। 'ক' বা 'খ'-এর মধ্যে মিল বা অমিল আছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই তুলনামূলক পদ্ধতির শেষ কথা নয়। অমিল বা মিলের কারণ কী, কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্লেষণ হল তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ। ম্যাক্স ওয়েবার, টকভিল, মার্কসের মত সনাতন তুলনাবাদী ছাড়াও আধুনিককালে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন অনেক রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—

ব্যারিংটন ম্যুর (Barington Moore)-এর "Social Origins of Dictatorship and Domocracy", স্কোপোল (Scopol)-এর "States and Social Revolution", র‍্যাল্‌ফ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband)-এর "The State in Capitalist Society", বেন্ডিক্স ও লিপসেট (Bendix & Lipset)-এর "Class, Status and Power", আন্দ্রে বেতে (Andre Betaille)-এর "Social Inequality", এম. জে. স্মিথ (M. G. Smith)-এর "Pluralism in Africa", অ্যালমন্ড ও ভার্বা (সম্পাদিত) (Almond Verba (ed))" Civic Culture", লুসিয়ান পাই ও সিডনি ভার্বা (Lucian Pye & Sidney Verba) রচিত "Political Culture and Political Development", আর্নল্ড লিফার্ট (Arnold Liphart)-এর "Comparative Political Studies" ইত্যাদি।

তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের সমস্যা থাকে, তথ্যসমূহের শৃঙ্খলবদ্ধকরণ করা কঠিন হয় এবং তুলনার জন্য কিছু নির্বাচিত বিষয় বেছে নিয়ে তুলনার প্রবণতা থাকে।

তবে তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে অল্পসংখ্যক ঘটনাসমূহের নিবিড় বিশ্লেষণ করা হয়, যা প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অল্পসংখ্যক ঘটনা নিয়ে কাজ করার জন্য তথ্যের বৈধতা নিয়ে গবেষকের দুশ্চিন্তা কম থাকে।

(৩) বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Case Study)

তুলনামূলক রাজনীতিতে বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি বিষয় বা একটি দেশসংক্রান্ত গবেষণা করা হয়। অর্থাৎ, গবেষণাক্ষেত্র একটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকে বা একটি দেশের আলোচনার

মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে। একটি দেশ বা একটি দেশের বিভিন্ন অংশের বা একটি বিষয়ের আলোচনাকে অনেকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ বলতে রাজি নন। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি এককের আলোচনা, বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করা হয় তুলনার ক্ষেত্র থাকে না। সেই এককটি একটি জাতি রাষ্ট্র, একটি স্বার্থগোষ্ঠী একটি ট্রেড ইউনিয়ন, একটি রাজনৈতিক দল বা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য হতে পারে।

লিফার্টের মতে, যে বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যায় তত্ত্ব নেই, যা শুধু বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাকে কোন বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু যে বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা অনুমানকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়, তত্ত্বগঠন করে বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায় বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে সরে আসার কথা বলে এবং সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, তাদের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে।

এই প্রসঙ্গে লিফার্ট ছয় ধরনের বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির কথা বলেছেন—প্রথম দুটি পদ্ধতি হল অ-তাত্ত্বিক বিষয়গত অনুসন্ধান পদ্ধতি (Atheoretical Case Study) এবং ব্যাখ্যামূলক বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানপদ্ধতি (Interpretative Case Study)। এই দুটি পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল মূলতঃ একটি এককের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা, সামান্যীকরণ বা তত্ত্বগঠন নয়। তবে তারা একটি একক সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করে। রাজনৈতিক প্রথা বা ব্যবস্থাসমূহের বিভিন্ন তথ্য ও বর্ণনামূলক আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে তত্ত্বগঠনের সহায়ক হতে পারে এবং তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি হতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানের পরের চারটি পদ্ধতি হল প্রকল্প সৃষ্টিকারী বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Hypothesis-generating Case Study), তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাকারী বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Theory-Confirming case study), তত্ত্ব-দুর্বলকারী অনুসন্ধান পদ্ধতি (Theory-infirming case study) এবং ব্যতিক্রমী বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Deviant Case Study)। এগুলি প্রধানত তত্ত্বগঠন বা তাত্ত্বিক উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত।

প্রকল্প সৃষ্টিকারী অনুসন্ধান পদ্ধতির গবেষণা শুরু হয় কোন নির্দিষ্ট এককের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ দিয়ে, কিন্তু সঙ্গে উদ্দেশ্য হিসাবে থাকে অন্তত একটি বা একাধিক সাধারণ প্রস্তাব বা প্রকল্পের উপস্থাপন, যা পরবর্তী কালে ওই বিষয়ের গবেষণায় কাজে লাগে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে লয়েড ও সুশান রুডল্ফ (Lyed and Susanne Rudolph) রচিত "Modernity of Traditions: Political Development in India" গ্রন্থে একটি নির্দিষ্ট দেশ ভারতের সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গঠন করেন, যার বক্তব্য হল যে উভয়ে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একে অন্যকে প্রভাবিত করে।

তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাকারী এবং তত্ত্ব-দুর্বলকারী অনুসন্ধানপদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করে—প্রথমটি প্রচলিত তত্ত্বকে শক্তিশালী করার জন্য এবং দ্বিতীয়টি প্রচলিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল স্যামুয়েল বিয়ার (Samuel Beer) এর "British Politics in the Collectivist Age", যার মধ্যে তিনি দেখান যে, ব্রিটেনের

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্রিটেনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ ও বিপ্লব-বিরোধিতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এবং তার ভিত্তিতে তিনি রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন।

ব্যতিক্রমী অনুসন্ধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল প্রচলিত চিন্তাভাবনা বা তত্ত্ব থেকে সরে এসে নতুন কিছু বলা। এক্ষেত্রে পুরোনো তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা দেখানো হয় বা নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়। এই ধরনের অনুসন্ধানে কিছু উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া চেষ্টা থাকে বা উত্তর পাওয়া যায়নি এমন প্রশ্নের বিচারবিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল লিপসেট, কোলম্যান ও ট্রউ (Lipset, Coleman and Trow)-এর "Union Democracy এবং লিফার্টের "The Politics of Accomodation: Pluralism and Democracy in Netherlands"। প্রথমটিতে লেখকরা রবার্ট মিশেলস্ (Robert Michels)-এর "Iron Law of Oligarchy" সংক্রান্ত বক্তব্যকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন এবং দ্বিতীয়টিতে লেখক দেখান যে হল্যান্ডের সামাজিক বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যেও গণতন্ত্র কতটা সাফল্য লাভ করেছে, যদিও সামাজিক বিরোধ ও বৈষম্যকে গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল বলে মনে করা হয় না। এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে লিফার্ট গণতন্ত্রের এক consociational মডেল নির্মাণ করেন।

লিফার্টের বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ৬টি শ্রেণীবিভাজনকে আদর্শ মডেল বলা যায় না, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই একটি মডেলকে দুটি বা তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(৪) আন্তঃশাস্ত্র গবেষণা পদ্ধতি (Inter-disciplinary Research Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষণা ও প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্যে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি (Sociological Method)

এই পদ্ধতিতে সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের তুলনামূলক আলোচনা পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা হল এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

(খ) মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি (Psychological Method)

এই পদ্ধতি অনুসারে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানসিকতার ভিত্তিতে রাজনীতির বিশ্লেষণ করা হয়। এইভাবে জনমত, নির্বাচনী আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়।

(গ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method)

জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিকাশ, কাজ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপক তত্ত্ব হল এই পদ্ধতির অন্যতম উদাহরণ।

(৫) মার্কসীয় পদ্ধতি (Marxist Method)

কাল মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তন ও সমাজবিকাশের ধারার আলোচনা করেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আইন সংবিধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ক্ষমতা, মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দ ইত্যাদির ভিত্তিতে মার্কসবাদ রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে মার্কসবাদ রাজনীতির আলোচনা করে। মার্কসবাদে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের শ্রেণী কাঠামো, শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা।

২.৩.৪ তুলনামূলক রাজনীতিতে আলোচিত তুলনামূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

উডের মতে, তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) ধারণামূলক এককসমূহের সংজ্ঞা (Definition of Conceptual Units) :

তুলনামূলক রাজনীতির আলোচ্য বিভিন্ন এককসমূহকে ধারণাগত একক বলা হয়। তুলনাবিদ্‌কে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সমষ্টিগত একক এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ক্ষুদ্র একক—সব কিছুর তুলনা করতে হয়। সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ক্ষুদ্র এককগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্র একক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সমষ্টিগত একক সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজন। তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সমষ্টিগত এককের তুলনার উদাহরণ হল ভারত ও ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার তুলনা বা ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার তুলনা আর মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনা বা ব্রিটিশ বিচারবিভাগ ও মার্কিন বিচারবিভাগের তুলনা হল ক্ষুদ্র এককসংক্রান্ত তুলনা। তুলনামূলক রাজনীতিতে ধারণামূলক একক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই এককের সংজ্ঞার ভিত্তিতেই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়।

(খ) শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

যে সমস্ত ধারণামূলক এককসমূহের মধ্যে তুলনা করা হয়, তাদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এবং শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে জটিল এককসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তালিকা, ছক, রেখচিত্র ইত্যাদি হল শ্রেণীবিন্যাসের উপায়সমূহ। শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে সূত্র নির্মাণ ও তত্ত্বরচনা সহজ হয়। জনগণের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কেন্দ্র ও অঞ্চলসমূহের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকার, আইন ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ধরন অনুসারে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার হল শ্রেণীবিভাজনের কয়েকটি ক্ষেত্র। ধারণাগত একক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান সম্ভব হয় শ্রেণীবিভাজনের মাধ্যমে।

(গ) প্রকল্প গঠন ও তার যথার্থ্য নির্ধারণ (Hypothesis Formulation and Testing)

রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে, তার বিবেচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন যেমন জনগণের চাহিদার প্রতি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতটা সহানুভূতিশীল, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপপাদ বাইরের চাপ ও ভেতরের সংকটের কিভাবে মোকাবিলা করে, সংকটের সময়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের কাছ থেকে কতটা সমর্থন পেতে পারে—ইত্যাদির উত্তর অনুসন্ধান করে তুলনামূলক রাজনীতি। এই সব প্রশ্নোত্তরের জন্য তুলনামূলক রাজনীতিতে প্রকল্প নির্মাণ করা হয় এবং তাদের যথার্থ্য অনুসন্ধান করা হয়। প্রকল্পগুলির যথার্থ্য বিচারের পর সেই সংক্রান্ত সাধারণ সূত্র ও তত্ত্বনির্মাণ সম্ভব হয়।

২.৩.৫ তুলনামূলক পদ্ধতির কৌশলসমূহ (Techniques of Comparative Method)

তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের কৌশল দেখা যায়—

(ক) নমুনা সমীক্ষা (Sample Surveys)

কোন একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা তার বিভিন্ন একক সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নমুনা সমীক্ষা করা হয়। নির্দিষ্ট একটি দেশ বা তার একটি একক সংক্রান্ত নমুনা সমীক্ষাকে তুলনামূলক বলা যায় না, কিন্তু নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে তুলনামূলক রাজনীতির অনেক আলোচ্য উপাদান সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল বা আইন বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনার জন্য তাদের সম্পর্কে পৃথকভাবে সংগৃহীত নমুনা সমীক্ষার তুলনামূলক ব্যাখ্যা করা যায়। এ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ হল রজনী কোঠারির "Politics in India", যেখানে ভারতের রাজনীতির আলোচনা দেখা যায়।

(খ) পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (Statistical Analysis)

নমুনা সমীক্ষার থেকে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের বিচার্য বিষয়ের এলাকা বৃহত্তর। পৃথিবীর সব সমাজতান্ত্রিক দেশ বা পৃথিবীর সব উদারনৈতিক গণতন্ত্র বা তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত হতে পারে। এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নমুনার সংখ্যা বেশি লাগে এবং তথ্যসমূহকে জটিল প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনা করা হয়, পরিবর্তনীয় উপাদানসমূহের মধ্যে তারতম্য দেখা হয় এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও সুত্র নির্মাণ করা হয়। দুটি দেশের মধ্যে তুলনা আছে এমন দুটি গ্রন্থ হল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শিল্পবিপ্লবের ওপর চার্লস কিন্ডলেবার্জারের "Economic Growth in Francc and Great Britain" (1964) এবং প্রতিষ্ঠান, কাঠামো ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তুলনাকে ভিত্তি করে রবার্ট ওয়ার্ড ও ভি. রস্টো-র "Political Modernization in Japan and Turkey"

(গ) কেন্দ্রিভূত তুলনা (Focussed Comparison)

কমসংখ্যাক বা দুটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা তাদের একক সংক্রান্ত তুলনাকে কেন্দ্রীভূত তুলনা

বলে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়ের বাছাই করা কিছু দিক নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। নমুনা সমীক্ষায় একটি বিষয়, পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আর কেন্দ্রীভূত তুলনার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক বিষয়ের তুলনা করা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত তুলনা পদ্ধতির স্থান অন্য দুটি তুলনা পদ্ধতির মাঝামাঝি। মূলত সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর বহুদেশীয় তুলনার উদাহরণ হল চার্লস লুই ও রিচার্ড ট্রিলির "The Rebellious Country: 1830 –1930" (1975)। এখানে শহরায়ন ও শিল্পভিত্তিক জীবন সমষ্টিগত জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তার উত্তর খোঁজা হয়েছে, প্রধানত জার্মানি, ইটালী ও ফ্রান্স সম্পর্কে।

২.৪ সাদৃশ্যমূলক ও বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা, দেশ বা তাদের এককের তুলনা

যে কোন তুলনার কাজ শুরু করার সময় আমাদের স্থির করে নিতে হয় সাদৃশ্যপূর্ণ না বৈসাদৃশ্যপূর্ণ—কি বিষয়ের তুলনা করা হবে।

দুটি একই ধরনের ব্যবস্থা বা দেশ বা একই ধরনের এককের তুলনা করলে ব্যবস্থা দুটি বা দেশ দুটি বা একক দুটির বিশিষ্টতা ও মৌলিকতাকে চিহ্নিত করা যায়। তবে সাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে। দুটি পুজিবাদী রাষ্ট্র বা দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনা করলে উভয় ক্ষেত্রেই সমধর্মী দুটি ব্যবস্থা বা দুটি এককের মধ্যে বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়, কিন্তু নিবিড়ভাবে তুলনা করলে তাদের বৈসাদৃশ্যগুলি জানা যাবে। চীন ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু অমিল বা বৈসাদৃশ্যও কম নয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় আর চীন একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয়েই উদারনৈতিক ব্যবস্থাযুক্ত এবং উভয় রাষ্ট্রের সংবিধানেই জনগণের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকারগুলি এক রকম নয়—ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে তা নেই।

তবে আপেক্ষিকভাবে সাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা বা এককের তুলনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলিকে কমিয়ে এনে তাদের সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

সমজাতীয় একক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তুলনামূলক আলোচনা হল রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ওপর জেমস কোলম্যান ও কার্ল জি রসবার্গের গবেষণাগ্রন্থ "Political Parties in Tropical Africa" (1966), লুসিয়াস পাই এর উন্নয়ন সংক্রান্ত রচনা "Communication and Political Development", মার্টিন নিডলার (Martin Needler)-এর গ্রন্থ "Political Development in Latin America", রবার্ট ডালের রচনা "Regimes and Opposition" (1973) ইত্যাদি।

সদৃশ দেশগুলির তুলনামূলক আলোচনায় ভৌগোলিক এলাকা, ইতিহাস, বিকাশের স্তর, সংস্কৃতি,

সামাজিক পরিবেশ, কাঠামো ইত্যাদি সংক্রান্ত তুলনা দেখা যায়। নির্বাচন, দলব্যবস্থা, জোট রাজনীতি ইত্যাদিও তুলনামূলক আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। তবে এ জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অঞ্চল বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা দেশ বা তাদের একক সংক্রান্ত বৈসাদৃশ্যমূলক উপাদানের তুলনাও তুলনামূলক রাজনীতিতে আছে। বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু সাদৃশ্যের উপস্থিতি থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল রাষ্ট্রপতিশাসিত আর ভারতে আছে সংসদীয় শাসন। উভয়েই বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা, কিন্তু তাদের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আর উভয় দেশেই মৌলিক অধিকার আছে। আবার চীন ও ব্রিটেন হল বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা—চীনে আছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর ব্রিটেনে আছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে উভয়েই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। তুলনাবিদ্ তাই গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য এককসমূহের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি দেন। তবে বৈসাদৃশ্যমূলক দেশ বা এককের তুলনার ক্ষেত্রে গবেষক পার্থক্যকে বেশি করে দেখাবেন এবং পার্থক্যসমূহের গুরুত্বকেও চিহ্নিত করবেন।

অসমজাতীয় একক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তুলনামূলক আলোচনার কিছু ধারা হল প্রথমত, বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক জগতের তুলনামূলক আলোচনা, যেমন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা—দুটি সমাজেরই মতাদর্শ, রাজনৈতিক কাঠামো, শাসনব্যবস্থা ভিন্ন ধরনের। দ্বিতীয়ত, জাতিগঠন সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা, তৃতীয়ত, সাবেকি প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ, চতুর্থত, গণতান্ত্রিক ও সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থার তুলনা মূলক আলোচনা পঞ্চমত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হল রাইনহার্ড বেনডিক্স (Reinhard Bendix)-এর "Nationbuilding and Citizenship" (1964), হ্যানস কোন (Hans Kohn)-এর "Revolution and Democracy" (1930), লুসিয়ান পাইয়ের "Non-western Political Process" ইত্যাদি।

অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী হয় নি। তাদের দেশগুলিতে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, আবার অভিন্ন কিছু কারণও থাকতে পারে। অনেক অফ্রো-এশীয় বা লাতিন আমেরিকার দেশে মাঝে মাঝে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। অনেক দেশে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কোথাও কোথাও অসামরিক শাসনের অক্ষমতা সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ছিল, কোথাও কোথাও আবার বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সামরিক বাহিনীকে মদত দিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে তুলনার মাধ্যমে সামরিক শাসনের অক্ষমতা ও বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশের হস্তক্ষেপ—উভয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার, দেশগুলিকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যগুলিকে চিহ্নিত করে বৈসাদৃশ্যের কারণগুলিকে অনুসন্ধান করা যায়। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বা তার বেশি রাষ্ট্রের ভোটদাতাদের আচরণগত পার্থক্যের কারণগুলিকে তুলনামূলক সমীক্ষার ভিত্তিতে জানা যায়। বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থাসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, ইতিহাস,

ধর্ম, পরিবেশ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি উপাদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

তবে তুলনাবিদ্ যখন সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সাদৃশ্যের আড়ালে থাকা বৈসাদৃশ্যগুলিকেও গুরুত্ব দেন। আবার তিনি যখন বৈসাদৃশ্যমূলক ব্যবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান করেন, তখন সাদৃশ্যের দিকগুলিকেও বিচার করেন।

২.৫ তুলনামূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ অনেক সময় কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তাদের কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। সেগুলি হল—

(ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদির বিভিন্ন ধরন এবং বিভিন্ন কাজ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া ইত্যাদি সব সময়ে যুক্তিপূর্ণ পথে চলে না। জটিল প্রকৃতিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনাকে সব সময় বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মান করেন যে, তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতিগুলির বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখা বা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ—সামাজিক পরিবর্তনকে গুরুত্বদান নয়।

(গ) তুলনামূলক পদ্ধতিগুলি বাছাই করা কিছু সংস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার পছন্দমত কিছু দিককে নিয়ে আলোচনা করে—অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়।

(ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি মূল্যমাননিরপেক্ষ বিশ্লেষণের কথা বলে। কিন্তু রাজনীতির আলোচনায় পুরোপুরি মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়—মার্কসবাদী ও উদারনীতিবাদী তত্ত্বে ধারণাগত এককসমূহকে বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি শব্দগুলিকে তারা বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে। প্রত্যেকেই নিজ মূল্যমানের অবস্থানে অনড় থাকে, মূল্যমান-নিরপেক্ষ হওয়া তাই সম্ভব নয়।

(ঙ) বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা তাদের একক সংক্রান্ত তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বা শ্রেণীবিভক্ত করাও সহজ নয়। বিজ্ঞানের মতো গবেষণাগারে বসে নিয়ন্ত্রিতভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা আচরণকে বিশ্লেষণ করা যায় না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেক উপাদানের পরিমাপ করাও সহজ নয়।

(চ) তুলনামূলক পদ্ধতির ধারণাগত একক নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায়। দেশভেদ ও কালভেদ অনুসারে রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত ধারণার অর্থ বিভিন্ন হয়। ফলে যে বিভিন্নতা বা বিভ্রান্তি ঘটে, তা তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগকে বাধা দান করে।

(ছ) তুলনামূলক রাজনীতিতে পরীক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় তার ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষমতা সীমিত।

তবে তুলনামূলক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ নানা সমস্যার সৃষ্টি করলেও একথা বলা যায় না যে তাদের

প্রয়োগ সম্ভব নয়। বরং আধুনিক যুগে তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, ধর্ম, বিরোধী দল ইত্যাদি সংক্রান্ত উচ্চমানের গবেষণা হয়েছে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ, দলের সদস্যপদের জন্য আগ্রহ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির শাসনব্যবস্থা, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, প্রাচীন ও নবীন সমাজসমূহের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা দেখা গেছে—সাবেকি ব্যবস্থা ও আধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনার ভিত্তিতে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপরও নানা তুলনামূলক আলোচনা দেখা যায়। অধুনিক কালে তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের ভিত্তিতে কিছু তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে। সেগুলি অর্থবহভাবে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনাকে উৎসাহিত করেছে।

২.৬ তুলনামূলক আলোচনার উপযোগিতা (Utility of Comparative Study)

অ্যারিস্টটলের সময় থেকে তুলনামূলক আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চলে আসছে এবং এখন তা তুলনামূলক রাজনীতি নামে জনপ্রিয় শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে কারণ তুলনামূলক আলোচনার কিছু উপযোগিতা দেখা যায়।

প্রথমত, তুলনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা বা ব্যবস্থার সাধারণ এবং অভিনব উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক বিশ্লেষণ রাজনীতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে গভীরতা দান করে। কোন একটি বিশেষ দেশের রাজনীতির সম্বন্ধে জানতে গেলে সেই দেশের রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য দেশের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন ও শাসনবিভাগের সম্পর্ক জানতে গেলে ব্রিটেন বা অন্যান্য সংসদীয় গণতন্ত্রে এই সম্পর্ক কেমন তা জানা দরকার। আবার রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার আইন ও শাসনবিভাগের সম্পর্কের সঙ্গে সেগুলিকে তুলনা করলে ধারণা আরও স্বচ্ছ হবে। নিজেদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহকে বুঝতে গেলে বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা যুক্ত দেশের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, তুলনামূলক আলোচনা থেকে মানুষ দেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে। তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সামনে বহু রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিত্রকে উপস্থাপিত করে, কেউ কেউ সমজাতীয়, কেউ কেউ নয়। এইভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ধরনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানার পর তাদেরকে আমরা বুঝতে পারি, তাদেরকে গ্রহণ করতে পারি এবং তাদের থেকে শিখতে পারি। অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনার ফলে মানুষ অনুভূতিপ্রবণ, বিনীত ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে একাকী বাস করতে পারে না। শিশুকাল থেকেই একদিকে অন্যকে অনুসরণ এবং অন্যদিকে অন্যের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্য দিয়েই তার সামাজিকীকরণ হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষতঃ আজকের বিশ্বায়নের যুগে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী চলতে পারে না। ইংলন্ডের বিপ্লবের সাফল্য ফরাসী নেতাদের উৎসাহিত করে, রুশ বিপ্লবের সাফল্য চীনা

নেতাদের উদ্বুদ্ধ করে। অন্য দেশকে জানার মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয় মুক্ত বাতাস, পাওয়া যায় উন্নয়নের বার্তা, উদ্ভাসিত হয় রাজনৈতিক শিক্ষার বিশাল জগৎ।

চতুর্থত, তুলনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আইনের কাঠামো বা সংবিধানের ধরণ সম্বন্ধে জানা যায়। বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে জানতে পারলে যে কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

পঞ্চমত, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। বিকল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিকল্প প্রক্রিয়াগুলির বিভিন্ন দিকের বিচার একমাত্র তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতেই সম্ভব।

ষষ্ঠত, রাজনীতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যও তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। সংসদীয় না রাষ্ট্রপতিশাসিত—কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে উভয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা জানা প্রয়োজন। তুলনার মাধ্যমেই বিভিন্ন ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন করা যায় এবং শ্রেণীবিভাজন বিষয়টিকে ভালভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

সপ্তমত, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনার মধ্য দিয়েই গঠিত হয় একটি সুবিন্যস্ত তাত্ত্বিক কাঠামো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওয়েবার, মন্তেস্কু, ল্যাস্কি ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তুলনার সাহায্যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আচরণবাদী তত্ত্ব ও নানা অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে—ব্যবস্থাপক তত্ত্ব, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, এলিট তত্ত্ব, গোষ্ঠী-তত্ত্ব ইত্যাদি। তবে সকলেই যে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের পদ্ধতিগত দিককে পছন্দ করেছেন, তা নয়। তবে তুলনার মধ্যে দিয়েই যে তত্ত্বের নির্মাণ ও তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে ধারণাগত স্পষ্টতা আসতে পারে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাত্ত্বিকরা সকলেই একমত।

অষ্টমত, তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণা খণ্ডগত সামাজিক ঘটনাসমূহের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন এবং তাদের সম্পর্কে প্রকল্প গঠন ও তাদের যাচাই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। গণতন্ত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত, সামাজিক বহুত্ববাদ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দলব্যবস্থা এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্পর্ক তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়েছে।

নবমত, তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলনাবিদ্‌রা সামাজিক ঘটনাসমূহের সাধারণ কারণগুলির দিকে আলোকপাত করেছেন, তাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে সমাজতাত্ত্বিক নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করেছেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন।

দশমত, আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ইত্যাদিকে ভালভাবে অনুধাবনের জন্য তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রড হেনা ও মার্টিন হ্যারপ বলেছেন যে, যে জায়গাগুলি আমরা জানি, সেগুলি আরও বেশি করে জানতে সাহায্য করে তুলনামূলক আলোচনা। তুলনামূলক আলোচনার উপযোগিতা প্রসঙ্গে জেমস কোলম্যানের উক্তর হল যে তুমি যদি তুলনা না করো, তাহলে তুমি বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না।

২.৭ সারসংক্ষেপ

তুলনামূলক রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু হল তুলনামূলক আলোচনা, যার মধ্যে দেখা যায় :—

(ক)	(খ)	(গ)
(i) জাতিরাষ্ট্রের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে তুলনা	(i) সমজাতীয় কাঠামোযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থারল তুলনা	(i) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমষ্টিগত স্তরের তুলনা
(ii) বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা	(ii) অ-সমজাতীয় কাঠামোযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থারল তুলনা	(ii) রাজনৈতিক ব্যবস্থার খণ্ডগত স্তরের তুলনা
(iii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা	(iii)	(iii)

তুলনামূলক রাজনীতিতে তুলনাকারীর উদ্দেশ্য হল—

(i) একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ

(ii) যে তাত্ত্বিক কাঠামোটি প্রচলিত তার অনুকূলে বা বিপক্ষে যুক্তিসংগ্রহ ও সূত্র অনুসন্ধান

(iii) রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক তাত্ত্বিক কাঠামোর পুনর্নির্মাণ।

তুলনামূলক রাজনীতিতে তত্ত্বগঠনের জন্য কিছু তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়,যাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল:

(i) সমষ্টিগত না খণ্ডগত, সমজাতীয় না অসমজাতীয়, জাতি-রাষ্ট্রের এককগুলির মধ্যে না বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের এককগুলির মধ্যে না বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা করা হবে, তার ভিত্তিতে ধারণামূলক একক গঠন।

(ii) ধারণামূলক কেকসমূহের শ্রেণিবিভাজন এবং এজন্য ছক, চার্ট, রেখচিত্র ইত্যাদির প্রয়োগ।

(iii) বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণ করে তাদের যাথার্থ্য নিরূপণ এবং তাদের ভিত্তিতে তত্ত্বগঠন ও সূত্রনির্ধারণ।

তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেসব কৌশল দেখা যায়, সেগুলি হল নমুনা সমীক্ষা, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও কেন্দ্রভূত তুলনা।

তুলনামূলক পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে

(i) রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচরণ ও ব্যক্তির ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। তাই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়।

(ii) বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান সব সময় মেলে না।

(iii) তুলনামূলক রাজনীতির কিছু ধারণা সম্পর্কে মতৈক্য নেই। একটা ধারণা বুর্জোয়া ও মার্ক্সবাদী তত্ত্বে বিভিন্ন অর্থ বহন করে।

(iv) পুরোপুরি নিরপেক্ষভাবে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

তবে সীমাবদ্ধতা থাকলে ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা আইনক কালে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও কাঠামো সংক্রান্ত অর্থবহ আলোচনা দেখা গেছে।

২.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক রাজনীতির বিভিন্ন তুলনামূলক পদ্ধতি সমূহ আলোচনা করুন।

২. তুলনামূলক রাজনীতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. তুলনামূলক পদ্ধতিসমূহের উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক রাজনীতির তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

২. কেস স্টাডি বলতে কি বোঝেন? এর বিভিন্ন ধরণগুলি লিখুন।

৩. তুলনামূলক রাজনীতিতে সদৃশ ও ভিন্ন এককের বা ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. তুলনা করার উদ্দেশ্যগুলি কি?

২. "Macro Level" এবং "Micro Level" তুলনা বলতে কি বোঝেন?

৩. তুলনামূলক পদ্ধতি বিষয়ে টীকা লিখুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী :

1. Blondel, Jean : An Introduction to Comparative Government, Widenfield & Nicolson, London, 1969.
2. Blondel, Jean : Comparative Government, Macmillan, London, 1969.
3. Chatterjee, Rakhahari: Introduction to Comparative Political Analysis, Kolkata, Sarat Book House, 2006.
4. Finer, S. E. : Comparative Government, Penguin Press, Great Britain, 1975.
5. Johari, J. C. : Comparative Policies, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1999.

একক ৩ □ তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ: ব্যবস্থাজ্ঞাপক ও কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৩.১ ব্যবস্থার ধারণা

৩.৩.২ ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩.৩.৩ সমালোচনা

৩.৪ কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৪.১ ভূমিকা

৩.৪.২ অ্যালমন্ডের কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৪.৩ অ্যালমন্ডের কাঠামো-কার্যবাদের সমালোচনা

৩.৫ সারসংক্ষেপ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যেসব বিষয়সমূহ জানতে পারবেন এবং যাদের ওপর মনোনিবেশ করতে পারবেন, সেগুলি হল ঃ

- বিভিন্ন তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা
- ব্যবস্থার ধারণা এবং ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা।
- কাঠামো কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত আলমন্ডের কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা।
- ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

৩.২ ভূমিকা

রাজনীতি পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে সাধারণভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার একটি নির্দিষ্ট ধারাকে বোঝায়। রাজনীতি আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক হতে পারে, যেমন সমগ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আবার তা সংকীর্ণ হতে পারে, জাতীয় বা স্থানীয় রাজনীতির কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা। উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য বিষয় বা ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং এজন্য পরিসংখ্যান ও পরিমাপ সংগৃহীত হয়। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য সমস্যা নির্ধারণ, তথ্য ও পরিসংখ্যান বাছাই ইত্যাদির বিভিন্ন মানদণ্ড থাকে, যা বিভিন্ন ধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। তাই তুলনামূলক আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যখন তাঁদের ধারণাসমূহকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আকারে উপস্থাপিত করেন তখন তাঁদের নির্দিষ্ট আলোচনা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। তাই তুলনামূলক রাজনীতির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরক হিসাবে দেখা যায় বিভিন্ন তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির অস্তিত্ব। ডাইকের[১] মতে, তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি হল সমস্যা, তথ্য ও পরিসংখ্যান বাছাইয়ের মানদণ্ড আর তুলনামূলক পদ্ধতি হল তথ্যসমূহকে সংগ্রহ ও প্রয়োগ করার উপায় বা কৌশল। অর্থাৎ বিভিন্ন তুলনামূলক পদ্ধতি দ্বারা তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার জন্য তথ্য সংগৃহীত ও প্রযুক্ত হয়।

তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনামূলক রাজনীতিসংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব গভীরভাবে সংযুক্ত। তত্ত্বের কাজ হল সামান্যীকরণ, ভবিষ্যদ্বাণী, সূত্রনির্মাণ, কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতির ভিত্তিতেই তত্ত্ব নির্মিত হয়। তাই দৃষ্টিভঙ্গিকে তত্ত্বের স্রষ্টা বলা হয়। দৃষ্টিভঙ্গির কাজ যখন আলোচ্য বিষয়সংক্রান্ত বক্তব্য, পরিসংখ্যান বাছাই, ইত্যাদি থেকে প্রসারিত হয়ে সামান্যীকরণ, সূত্রনির্মাণ, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সম্ভব করে, তখন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রচলিত তুলনামূলক রাজনৈতিক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি[২] নামে পরিচিত ছিল। সেগুলি ছিল আদর্শমূলক, বর্ণনামূলক ও মূল্যবোধযুক্ত এবং দর্শন, ইতিহাস, আইন ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময় থেকে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গত বর্ণনার বদলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, আদর্শ ও মূল্যবোধের বদলে বাস্তব সমস্যা ভিত্তিক আলোচনা এবং দর্শন, ইতিহাস, আইন ও

১. কয়েকটি সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি হল—দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি (প্লেটো ও হেগেল), ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি (মাইকেল ওকশট), আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি (অস্টিন, ডাইসি) ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি (হারমান ফাইনার, আইভর জেনিংস)।

২. আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিগুলি হল—ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি, কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি, যোগাযোগ তত্ত্ব, গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলোচনার বদলে রাজনৈতিক আচরণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আলোচনা, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, পরিমাপ ও পরিসংখ্যানের ব্যবহার, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের আচরণ, তত্ত্বগঠন এবং উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণা প্রাধান্য পেতে থাকে। ফলে তুলনামূলক রাজনীতির বিষয়বস্তু পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তুলনামূলক রাজনীতিতে সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির[৩] প্রতিষ্ঠা ঘটে।

তুলনামূলক রাজনীতিতে সাবেকি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি সমন্বিত উপরি কাঠামোর আলোচনা করে এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করে।

৩.৩ ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৩.১ ব্যবস্থার ধারণা

রাজনীতি অনুধাবনের জন্য ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি একটি সাধারণ তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অনেকের কাছেই রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিপাদ্য বিষয়, রাজনীতি সংক্রান্ত ধারণা, প্রকল্প গঠন, ধারণাগত কাঠামো ইত্যাদি তুলনামূলক রাজনীতিবিদ্‌দের বিভিন্ন বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার কাজকে সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান জীববিজ্ঞানী ভন বার্টালনফ্লাই (Von Bertalanfly) ব্যবস্থার ধারণা প্রসঙ্গে বলেন যে ব্যবস্থা হল পরস্পর সম্পর্কিত এবং একে অন্যের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত উপাদানসমূহ। সামাজিক ব্যবস্থার ধারণার কথা প্রথম বলেন ভিলফ্রেড প্যারেটো (Vilfredo Pareto)[৩] তাঁর সমাজতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে। তাঁর মতে, সমাজব্যবস্থা হল সমাজের মধ্যে পরস্পর-সম্পর্কিত এক সমষ্টি, যার অংশগুলি আপেক্ষিক ও সংযুক্ত। রাজনীতির আলোচনায় সাম্প্রতিক কালে রোজেনাউ (Rosenau), মর্টন ক্যাপল্যান (Morton Kaplan) ইত্যাদিরা ব্যবস্থার ধারণা প্রয়োগ করেন। তবে ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রাজনীতি আলোচনার পথিকৃৎ হিসাবে ডেভিড ইস্টন (David Easton)-এর নামটিই সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর ব্যবস্থাপক তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে উপস্থাপিত হয় "The Political System" গ্রন্থের ১ম সংস্করণে ১৯৫৩ সালে। তাঁর "A Framework for Political Analysis" এবং "A System Analysis of Political Life" (উভয়েই ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থ দুটিতে তাঁর বক্তব্যের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়।

---

৩. প্যারেটোর দুটি গ্রন্থ হল—

(ক) Application of Sociological Theories, 1900.

(খ) Treatise on General Sociology, 1960.

ব্যবস্থার ধারণাকে জীববিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমদানি করা হয়। জীববিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেক জীবদেহ একটা ব্যবস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ, যা হল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াযুক্ত জটিল উপাদানসমূহের সমন্বয়। তাই জীবদেহের প্রতিটি অংশ শুধুমাত্র জীবদেহের ওপর নয়, সমগ্র ব্যবস্থার ওপর এবং নিজেদের পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জীবদেহের মত সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং উপব্যবস্থাগুলি বা ব্যবস্থার অংশগুলিও স্বতন্ত্র একক নয়—সমগ্র ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ফলে ব্যবস্থাপক তত্ত্ব ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম সব ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত। ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারণার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনাকে ক্ষুদ্র স্তরে এবং বৃহত্তর স্তরে—উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ করা যায়। ইস্টনের ব্যবস্থাপক তত্ত্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজ বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তাদের বাস্তব সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। অ্যালমন্ডের মতে, ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

৩.৩.২ ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হল—

(ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থা — ইস্টনের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমগ্র সামাজিক আচরণের মধ্যে থেকে সৃষ্ট কিছু ঘাতপ্রতিঘাতের সমষ্টি, যার মাধ্যমে সমাজে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর বরাদ্দ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টনের কথা বলেন। কর্তৃত্বসম্পন্ন বলতে এমন ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তকে বোঝায়, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং নিজেদের সিদ্ধান্তকে অন্যের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। মূল্য বলতে তিনি কোন মূল্যবোধের কথা বলেন নি, অর্থনীতিবিদ্‌দের মতো তিনিও মূল্যকে দাম বা যোগ্যতার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ, ইসটনের মতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত দ্বারা যোগ্যতার বরাদ্দ হয়ে থাকে এবং রাজনীতি হল কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ। মূল্যবণ্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায় ক্ষমতার খেলা।

(খ) পরিবেশ — রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারপাশের সামাজিক, আর্থিক, ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। শূন্যের মধ্যে ব্যবস্থা থাকে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ আন্তঃসামাজিক ও বহিঃসামাজিক দু'রকমই হতে পারে। যখন কোন আইন বা নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখানকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত ঘটে, তখন তা আন্তঃসামাজিক পরিবেশ থেকে সৃষ্ট হয় আর যুদ্ধকালীন অবস্থা হল বহিঃসামাজিক পরিবেশের উদাহরণ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ইস্টন উন্মুক্ত বলেন, কারণ ব্যবস্থার চারপাশের পরিবেশ থেকে আসা উপাদানসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব সর্বত্র সমান হয় না।

(গ) **প্রতিবেদনশীলতা** — রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিবেদনশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী বৈশিষ্ট্য আছে, যার সাহায্যে ব্যবস্থা তার পরিবেশের যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। ইস্টন বলেছেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিলে ব্যবস্থা নিজেই নিজেকে পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য বিধানের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে। এজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও পদ্ধতিগুলি স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়।

(ঘ) **উপকরণ-উপপাদ** — রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবেশের বিনিময় ও ঘাত-প্রতিঘাতের দুটি উপাদান হল উপকরণ (input) ও উপপাদ (output)। উপকরণের দুটি অংশ—চাহিদা ও সমর্থন। চাহিদা হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিবেশ থেকে আগত জনগণের দাবি। সমর্থন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক সমাজ (Political Community), শাসনপ্রণালী (Regime) ও সরকার (Government) কে এবং করপ্রদান, নিয়মের প্রতি বাধ্যতা, অংশগ্রহণকারী প্রবণতা, সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদিকে। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ চাহিদা ও সমর্থনের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে উপপাদ বলে। উপপাদ হল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ বা মূল্যের বণ্টন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হল উপকরণকে উপপাদে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। এটি হল কর্তৃপক্ষের আচরণ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্যের ওপর উপপাদ নির্ভর করে।

(ঙ) **পুনরাবর্তন বা ফিডব্যাক** — উপকরণের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় এবং উপপাদের সৃষ্টি হয়। তবে সব উপকরণই উপপাদে পরিণত হয় না। উপপাদে পরিণত না হওয়া উপকরণগুলি হারিয়ে যায় না; তারা আবার যে পদ্ধতির মাধ্যমে উপকরণে ফিরে আসে, ভবিষ্যতের উপপাদকে প্রভাবিত করে এবং ভবিষ্যতের সেই উপপাদ থেকে পুনরায় উপকরণে পরিণত হয় সেই পদ্ধতিকে ফিডব্যাক বা প্রেরক-প্রক্রিয়া বলে। উপকরণ-উপপাদ-উপকরণ-উপপাদ-উপকরণ- এই অবিরাম প্রবাহের মধ্যে ফিডব্যাক কাজ করে। অর্থাৎ ফিডব্যাক হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোন ব্যবস্থার কার্যসংক্রান্ত তথ্য এমনভাবে প্রেরিত হয়, যা ব্যবস্থার পরবর্তী আচরণকে প্রভাবিত করে। এই ফিডব্যাক প্রক্রিয়া জটিল প্রকৃতির—এর মধ্যে থাকে তথ্যসমূহ, উপপাদসমূহ এবং তাদের ফলাফলসমূহ।

প্রেরক পথের দুটি দিক আছে—নেতিবাচক দিক ও লক্ষ্যপরিবর্তনকারী দিক। নেতিবাচক প্রেরকপথ দ্বারা ভুলত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর লক্ষ্য পরিবর্তনকারী প্রেরকপথ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের নবনির্দেশ করে। প্রেরকপথ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান।

(চ) **সামর্থ্য (Capabilities)** — রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণসমূহকে সফলভাবে উপপাদে রূপান্তরিত করার ক্ষমতাকে সামর্থ্য বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের আচরণের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, সরকার দ্বারা দ্রব্য বা পুরস্কারের বণ্টন ইত্যাদি।

(ছ) **উপকরণ-উপপাদের মধ্যে ভারসাম্য ও চাহিদা-উপকরণের অতিরিক্ত বোঝা (Equilibrium between input-output and demand-input overload)**— রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চাহিদাচাপ ও সমর্থন-চাপ পূর্ণ করার একটা সামর্থ্য থাকে এবং এই সামর্থ্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই সামর্থ্য থাকে তাহলে সেখানে উপকরণ-উপপাদের মধ্যে ভারসাম্য থাকে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চাহিদা-চাপ ও সমর্থন চাপ পূর্ণ করার সামর্থ্য না থাকলে, কিছু চাহিদা অপূর্ণ থাকলে, ব্যবস্থার মধ্যেকার সমর্থন কমে গেলে বা প্রেরক-পথ বন্ধ হয়ে গেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সামর্থ্যের অতিরিক্ত যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে চাহিদা-উপকরণের অতিরিক্ত বোঝা বলে। এই অতিরিক্ত বোঝা বেশি হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে বা সংকটের সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেওয়ার আগেই ব্যবস্থার কিছু কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সুপারিশ করেন ইস্টন। সেগুলি হল—

(ক) **কাঠামোগত পদ্ধতি (Structural Mechanism)** — রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, গণমাধ্যম ইত্যাদি কাঠামোর সহায়তায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্থাপিত দাবিসমূহকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়।

(খ) **রূপান্তর পদ্ধতি (Conversion Mechanism)** — সরকারি কর্তৃপক্ষ উপকরণকে উপপাদে পরিণত করার সময় চাহিদাসমূহের পরিবর্তন করতে পারে। নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা বা সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **যোগাযোগ পদ্ধতি (Communication Channels)** — সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যম জনগণের দাবির সংখ্যা কমানো যায়।

(ঘ) **সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা (Cultural Inhibitions)** — রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয়। এই নিষেধাজ্ঞাগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপিত দাবিগুলির সংখ্যা কমানো যায়। এ প্রসঙ্গে মতাদর্শগত রাজনৈতিক শিক্ষা ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্টনের বক্তব্যের প্রতিরূপ

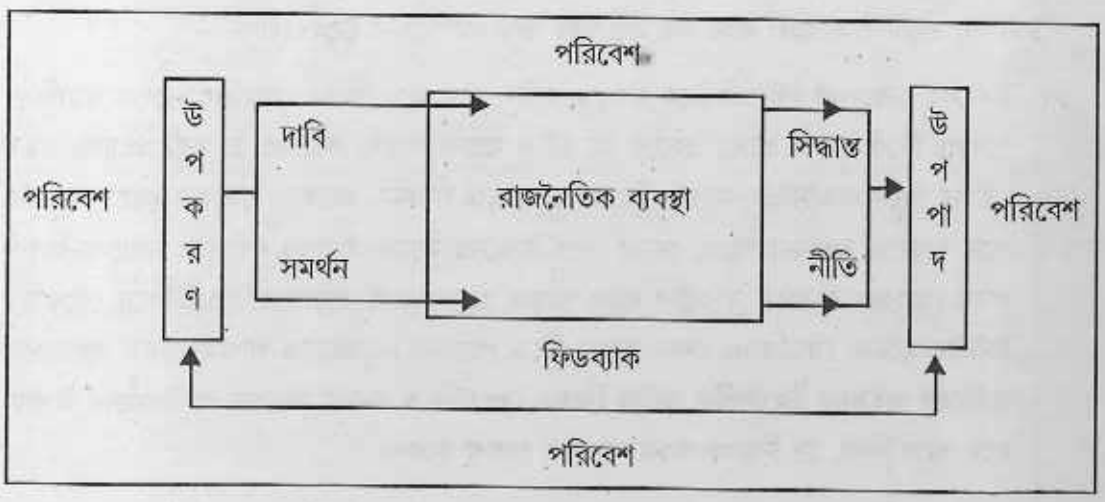

ইস্টনের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একদিকে আছে নাগরিকদের দাবি বা চাহিদা ও ব্যবস্থার সমর্থন, যাদের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন বা নীতি স্থির করেন এবং উপপাদ সৃষ্টি হয়। সব নাগরিকের সব দাবি মেটে না, কারণ শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে সেগুলি নানা বাধা ও নিষেধ আতক্রম করে পৌঁছয়। কর্তৃপক্ষ কিছু দাবি মেটান, যেগুলি মেটে না সেগুলি আবার দাবি হিসাবে উপকরণে ফিরে আসে এবং নতুনভাবে সেগুলি শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে যায় সিদ্ধান্ত বা নীতিতে রূপান্তরকরণের জন্য। ইস্টন এভাবে বোঝাতে চান যে উপপাদ বা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের সঙ্গে নাগরিকরা যুক্ত থাকেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো, মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক, কোন শক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, কোন অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাপ দেখা দেয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙনের সম্মুখীন হতে পারে, ভাঙন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়—এইসব বিশ্লেষণ দ্বারা ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বরক্ষাকে গুরুত্ব দেন। তবে ইস্টনের ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি গতিশীলতার উপাদানযুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের বিরোধী নয়, কিন্তু সেই পরিবর্তন হবে শান্তিপূর্ণ পথে, ধীর গতিতে, যাতে ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং ব্যবস্থা ভেঙে না যায়।

ইস্টন বিজ্ঞানের কলাকৌশল প্রয়োগ করে রাজনীতি অনুশীলনকে বৈজ্ঞানিক করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর দ্বারা বিকশিত ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যে কোন জাতীয় ব্যবস্থা (পশ্চিমের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশ থেকে আফ্রিকার উপজাতীয় ব্যবস্থা) এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্যে কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে তা বোঝা যায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা যায়।

৩.৩.৩ সমালোচনা

ইস্টনের তত্ত্বটি জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার কিছু সমালোচনা উল্লেখযোগ্য—

১। ইস্টনের ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে অনেকে জটিল বলে মনে করেন। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় টিকে থাকার ব্যাখ্যা হিসাবে এই জটিল মডেল সাহায্য করলেও তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। যে সব দেশে রাজনৈতিক সংকট, বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ সবসময় থাকে বা যেকোন মুহূর্তে সরকার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেসব দেশে ইস্টনের মডেল প্রযোজ্য নয় বলে সমালোচকদের ধারণা। আবার ক্রমাগত সংকটের ফলে পড়েও অনেক দেশ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ইস্টনীয় মডেল সেগুলিরও কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তাছাড়াও পশ্চিমী উন্নত গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের শর্তসমূহ উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমস্যা সমাধান বা উন্নয়নের উপায় হতে পারে কিনা, সে নিয়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন।

২। ইস্টনের দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষণশীল বলা হয়। ইস্টন স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইস্টনীয় মডেল দ্বারা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৩। অনেকে বলেন যে ইস্টনের ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনাকে যান্ত্রিক করে তোলে। যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা মানুষের আচরণ ও মানুষের সমাজকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইস্টনীয় মডেলে পরিসংখ্যান, পরিমাপ, ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তুলনামূলক রাজনীতি হল একটি সামাজিক বিজ্ঞান। পরিমাপ, পরিসংখ্যান দ্বারা তার আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

৪। ইস্টনের মডেলটি ঘেরাও, বন্‌ধ্‌, ধর্মঘট ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সাধারণত অনুন্নত দেশগুলিতে এগুলির প্রকাশ বেশি হয়। তাই এই মডেলকে অনেকে অভিজাততান্ত্রিক (elitist) আখ্যা দেন।

৫। ইস্টনীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি বিমূর্ত ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন মিল পাওয়া যায় না।

৬। মার্কসবাদীরা রাজনীতিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন এবং মনে করেন যে শ্রেণীগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা না করলে রাষ্ট্রশক্তিকে বোঝা যায় না। ইস্টনের মডেল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা ও তার স্থায়িত্ব রক্ষার কথা বলেছে। কিন্তু শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এবং শোষণের অবসানের উপায় সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখেননি। তাই মার্কসবাদীদের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজনীতির মূল শক্তিকেই ইস্টন উপেক্ষা করেছেন।

তবে নানা সমালোচনা থাকলেও একথা মানতে হয় যে ইস্টনের ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের বদলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আমদানি করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে কিছু নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে, যেগুলি সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে থাকে।

৩.৪ কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি (Structure-Functional Approach)

৩.৪.১ ভূমিকা

কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি হল তুলনামূলক রাজনীতি চর্চার একটি বহুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রধানত গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ডের নাম যুক্ত, তবে বিংহ্যাম পাওয়েল (Bingham Powell), জেমস কোলম্যান (James Coleman), সিডনি ভার্বা (Sydney Verba) ইত্যাদিদের নামও উল্লেখ করতে হয়।

প্রাথমিকভাবে কাঠামো-কার্যগত মডেলের ভিত্তি নির্মাণে সাহায্য করেন কিছু নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন এবং ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ এমিলে ডুর্কহাইম। ডুর্কহাইমের ধর্মীয় ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাজন সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি কার্যগত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন কার্যবাদের ধারণাকে জোরালো ভাবে উপস্থাপিত করেন এবং সামাজিক কার্যের ধারণাকে জৈব জীবন ও সমাজ জীবনের তুলনার মাধ্যমে আলোচনা করেন।

যে কোন জীবদেহের উদ্দেশ্য হল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা; জীবদেহের অংশগুলি কার্যগতভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং তারা সকলে একত্রিতভাবে জীবদেহকে বাঁচিয়ে রাখে। সমাজবিজ্ঞানের কার্যবাদের ধারণা সমাজকে একটি জীবদেহ হিসাবে দেখে, যার বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং তারা সামগ্রিক সত্তা হিসাবে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

কাঠামো-কার্যবাদের পূর্বসূরী হিসাবে বি. ম্যালিনোস্কি (B. Malinowski), ম্যারিয়ন লেভি (Marion Levy), রবার্ট মার্টন (Robert Merton), ট্যালকট পারসনস্ (Talcott Persons) প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন যে সমাজকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে যেসব ক্রিয়াকলাপ বা প্রক্রিয়া সহায়তা করে সেগুলিই কার্য হিসাবে বিবেচ্য আর কাঠামো হল কোন ব্যবস্থার পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত সামাজিক সংগঠনের সমষ্টি, যাদের মাধ্যমে কার্য সম্পাদিত হয়।

কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গির কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় হল—

(ক) বিশ্লেষণের একক হল সমগ্র ব্যবস্থা,

(খ) সমগ্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু কাজ সম্পাদন করতে হয়।

(গ) সমাজব্যবস্থার কাঠামোগুলি কার্যগতভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার সব অংশগুলি সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করে এবং ব্যবস্থার ঐক্য সংরক্ষণ করে। কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলিকে চিহ্নিত করে, তারা কি কি কাজ করছে তা ব্যাখ্যা করে, তাদের কাজের মূল্যায়ন করে এবং তারা কিভাবে সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বরক্ষার লক্ষ্যকে পূর্ণ করে, তা ব্যাখ্যা করে।

সব সমাজই জীবদেহের মত নিজ অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা করে, কিন্তু সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলি সর্বত্র এক নয়। অ্যামিবার মত সরল এবং মানুষের মত জটিল জীব যেমন আছে, সমাজের ক্ষেত্রেও তেমনই সরল ও জটিল দুটি ধরন থাকে। কার্যগত বিশেষীকরণের ভিত্তিতে সমাজের সরল বা জটিল স্তর স্থির করা হয়।

ট্যালকট পারসনের মতে, সমাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য সমাজকে চারটি কাজ করতে হয়— (ক) ধরনের সংরক্ষণ (Pattern Maintenance), (খ) লক্ষ্য পূরণ (Goal Attainment), (গ) নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য (Adaptation), (ঘ) সংহতিকরণ (Integration)।

কাজের পার্থক্যের ভিত্তিতেই সমাজের বিকাশের পর্যায় নির্ধারণ করা হয়।

৩.৪.২ অ্যালমন্ডের কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৬০ সালে লিখিত অ্যালমন্ড ও কোলম্যানের "Politics of Developing Areas" গ্রন্থটি হল আইনগত ও প্রতিষ্ঠানগত আলোচনার বৃত্তের বাইরে এসে রাজনীতিকে গভীরভাবে বোঝার প্রয়াস এবং উন্নতিশীল দেশগুলির কাঠামো, কাজ ও শাসনপ্রণালীর আলোচনা। ১৯৬৩ সালে "Civic Culture" গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও ভার্বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপকে ব্যাখ্যা করেন। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল দ্বারা ১৯৬৬ সালে লিখিত "Comparative Politics: A Developmental Approach" গ্রন্থে কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গিটি পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে।

অ্যালমন্ডের কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্য বলতে কি বোঝায়, তা জানা প্রয়োজন। অ্যালমন্ডের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা, যার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া আছে এবং যা সমস্ত স্বাধীন সমাজে দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি দ্বারা সমাজের সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পাদিত হয়। যে শক্তি বলপ্রয়োগ করে বা বলপ্রয়োগের হুমকি দেখায়, তার এই কাজের বৈধ অধিকার আছে। বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজকে সংরক্ষণ ও পরিবর্তন করার অধিকার ভোগ করে।

বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে—(১) সামগ্রিকতা (Comprehensiveness), (২) পরস্পরনির্ভরশীলতা (Interdependence), (৩) সীমানার অস্তিত্ব (Existence of Boundaries)।

ব্যবস্থা হল একটি সামগ্রিক ধারণা—তাই ব্যবস্থার মধ্যে আছে যাবতীয় উপকরণ ও উপপাদ, যেগুলি বলপ্রয়োগও বলপ্রয়োগের হুমকিকে প্রভাবিত করে। ব্যবস্থাটি পরস্পর নির্ভরশীল বলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি নির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তন হলে অন্যান্য অংশগুলিরও পরিবর্তন হয়। ব্যবস্থাটি সীমাবদ্ধ, কারণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সমাজের অন্যান্য অংশগুলির সীমা শেষ হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমা শুরু হয়। অ্যালমন্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধারণার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বাইরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বিভিন্ন ধরনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাকে গুরুত্ব দেন। অ্যালমন্ড বলেন যে, ভাষাসংস্কৃতিগত দিক থেকে ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন ধরনের হলেও কার্যগত দিক থেকে তারা এক ধরনের। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যবস্থার চার ধরনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন—

১। সরলতম থেকে শুরু করে জটিলতম—সব ব্যবস্থাতেই সমজাতীয় কিছু কাঠামো থাকে। তবে কাঠামোগত বিশেষীকরণের মাত্রা ও আকার এক রকম হয় না।

২। সর্বত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি একই ধরনের কাজ করে, তবে বিভিন্ন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধারায় বা বিভিন্ন ভাবে সেগুলি সম্পাদিত হয়।

৩। উন্নত ও অনুন্নত—সব ধরনের সমাজেই রাজনৈতিক কাঠামো নানা ধরনের কাজ করে—কোথাও সেগুলি বেশি বিশেষীকৃত, কোথাও কম।

৪। সাংস্কৃতিকভাবে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল মিশ্র ব্যবস্থা। কোন ব্যবস্থাই পুরোপুরি আধুনিক বা পুরোপুরি ঐতিহ্যগত নয়। তবে ব্যবস্থাভেদে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের আপেক্ষিক প্রাধান্য বিভিন্ন হয়।

কাঠামো হল কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত পরস্পর সংযুক্ত কিছু সামাজিক সংগঠন, যেগুলির মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হয়। অ্যালমন্ডের মতে কাঠামো হল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৈধ ধরন, যার দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অস্তিত্ব কোথাও বেশি, কোথাও কম, কিন্তু সর্বত্রই তার অস্তিত্ব আছে।

অ্যালমন্ড বলেছেন যে সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কাজের অস্তিত্ব থাকে। জটিল পশ্চিমী রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে কাঠামোগত বিশেষীকরণ ও কাজের বৈচিত্র্য বেশি হয়। সরল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কাঠামোগত বিশেষীকরণ কম হয়, কাজের বৈচিত্র্যও কম হয়।

কাঠামো ও কাজের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংবিধানসমূহের ক্রিয়াকলাপ হল কাজ আর সংগঠনটি হল কাঠামো। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে আইনসভা হল কাঠামো আর আইনপ্রণয়ন হল কাজ।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যগত দিক প্রসঙ্গে অ্যালমন্ড চার ধরনের উপকরণ সংক্রান্ত কাজ এবং তিন ধরনের উপপাদ সংক্রান্ত কাজের কথা বলেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ	
উপকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী	**উপপাদ সংক্রান্ত কার্যাবলী**
১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও নিয়োগ (Political Socialisation and Recruitment)	১. আইন প্রণয়ন (Rule-making)
২. স্বার্থের গ্রন্থীকরণ (Interest Articulation)	২. আইনের প্রয়োগ (Rule-application)
৩. স্বার্থের সমষ্টিকরণ (Interest Aggregation)	৩. আইনানুযায়ী বিচার (Rule-adjudication)
৪. রাজনৈতিক যোগাযোগ (Political Communication)	

উপকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী—

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও নিয়োগ :

রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামোকে স্থায়ী করতে চায়। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেক সদস্যকে তার রাজনৈতিক সংস্কৃতি শেখানোর জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ যেমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষার সহায়ক তেমনই তার পরিবর্তনেরও উপায়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিবর্তনকামী

রাজনৈতিক ব্যবস্থা নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। পরিবার, স্কুল, চার্চ, কাজের গোষ্ঠী, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন ইত্যাদি হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনাচিন্তা ও মূল্যবোধ সঞ্চার করা।

রাজনৈতিক নিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কাজের জন্য নিযুক্ত হন। নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সবল রাখা ও বিকশিত করার কাজ চলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো বা সংস্কৃতি এক নয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণও রাজনৈতিক নিয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন হয়।

২। স্বার্থের গ্রন্থীকরণ—

স্বার্থের গ্রন্থীকরণের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ, দাবি বা চাহিদা উত্থাপিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংগঠন দ্বারা, যেগুলি পূর্ণ করার জন্য সেগুলিকে উপকরণ আকারে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। দাবিগুলিকে বিবেচনা করার পর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রধানত স্বার্থগোষ্ঠীগুলিই স্বার্থের গ্রন্থীকরণের কাজগুলি সম্পাদন করে। অ্যালমন্ড এই প্রসঙ্গে চার ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর কথা বলেন—

(ক) **প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী (Institutional Interest Groups) :** আইনসভা, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ইত্যাদিদের স্বার্থগোষ্ঠী।

(খ) **সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী (Associational Interest Groups) :** যার উদাহরণ হল পেশাগত স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ, যেমন—ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, নারী সংগঠন ইত্যাদি। ভাষাগত বা জাতিগত স্বার্থগোষ্ঠী যদি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয়, তাহলে তারা সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

(গ) **অসংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী (Non-associational Groups) :** হিসাবে আঞ্চলিক গোষ্ঠী, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) **স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী (Anomic Groups) :** এগুলি হল সাময়িক গোষ্ঠী, যারা দাঙ্গা, ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে দাবি আদায় করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী ও সংগঠন থাকে, বিভিন্ন ধরনের দাবি উত্থাপিত হয় এবং দাবি পূর্ণ করার বিভিন্ন পদ্ধতিও থাকে।

৩। স্বার্থের সমষ্টিকরণ—

যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও সংগঠন বিভিন্ন ধরনের দাবি উত্থাপন করে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সকলের সব দাবি পূর্ণ করতে পারে না। তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিসমূহের সমন্বয় সাধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়াকে নীতিস্তরে

রূপান্তরিত করে। এই কাজকে স্বার্থের সমষ্টিকরণ বলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই কাজের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়।

৪। রাজনৈতিক যোগাযোগ—

রাজনৈতিক যোগাযোগ হল সেই উপায় যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপকরণ-উৎপাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম, যেমন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, সরকারের কাছে দাবি পেশ বা উত্থাপন, বিভিন্ন দাবির সমন্বয়সাধন ইত্যাদি সব কাজই সম্পাদন করে। রাজনৈতিক যোগাযাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সবলও সুশৃঙ্খল রাখে। অ্যালমন্ড বলেছেন যে আধুনিক সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে মিডিয়া বা গণমাধ্যম তার নিজস্ব পেশাদারি নীতির ভিত্তিতে একটি বিশেষীকৃত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের নতুন ধারণা ও রূপের বিকাশে সাহায্য করেছে।

উপপাদ সংক্রান্ত কার্যাবলী—

১। আইন প্রণয়ন—

আধুনিক কালে আইন প্রণয়নের কাজ করে প্রধানত সরকারের আইনবিভাগ। প্রাচীনকালে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনদাতার বিধান, দৈবিক অহিন, প্রথাগত আইন, আইনের পুস্তকের আলোচনা ইত্যাদি মানা হত। তখন অহিনপ্রণয়নের কাজ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাদের বৈধতা সমাজ দ্বারা স্বীকৃত ছিল না। আইন প্রণয়নের আদিম কাঠামো ছিল গ্রামের গোষ্ঠীপতি, যাদুকর, বংশগত গোষ্ঠী, বয়োবৃদ্ধদের সভা ইত্যাদি। পরে উপজাতীয় প্রধান, রাজা, কাউন্সিল ইত্যাদির প্রাধান্য লাভ করে। ইংলন্ডে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের শেষ দিকে পার্লামেন্টের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, পরে সংবিধানের প্রবর্তন ঘটে এবং আইন প্রণয়নের কাঠামো হিসাবে আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। আইনের প্রয়োগ—

বর্তমানে সরকারের শাসন বিভাগ ও আমলাতন্ত্র আইনের প্রয়োগ করে। অতীতে আইন প্রয়োগের কাঠামোর কোন নির্দিষ্ট রূপ ছিল না, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানও ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের নিয়ন্ত্রণে আইন প্রযুক্ত হত। পরে রাজাই হন আইনের প্রয়োগকারী। রাজার কর্মচারীদের এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা ছিল না। ত্রয়োদশ শতকেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। ধীরে ধীরে রাজস্ববিভাগ, রাজার আদালত ইত্যাদিদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায় এবং আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আমলাতন্ত্র শাসক ও আইন-প্রণেতাদের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকর করার বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন ধরন আছে। অ্যালমন্ডের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উপব্যবস্থা হিসাবে আমলাতন্ত্র অন্যান্য উপব্যবস্থাগুলির থেকে বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে—সংখ্যায়, আয়তনে, স্থায়িত্বে, দক্ষতায় এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের দিক থেকে।

৩। আইনানুযায়ী বিচার—

সাধারণত সরকারের বিচারবিভাগ এই কাজ সম্পাদন করে। আইনের সুরক্ষা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের স্বার্থে এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখন নির্দিষ্ট নিয়ম এবং আইনভঙ্গকারীর নিজের কাজকে সমর্থন করার অধিকার স্বীকৃত হয়। সাধারণ দ্বন্দ্ব মীমাংসার ক্ষেত্রে দুটি পথ আছে—

(ক) দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য স্বার্থগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলগুলি নতুন আইনের দাবি তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে আইন বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

(খ) যখন দ্বন্দ্ব মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই, কিন্তু বিরোধ দেখা যায় আইনের প্রয়োগ নিয়ে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মীমাংসার দাবি এসে পড়বে বিচার বিভাগের ওপর। আইনের বিচার প্রসঙ্গে অ্যালমন্ড বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেন। তবে সমাজের শ্রেণীসম্পর্ক এবং নানা ধরনের আইনের জটিলতার মধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। কাঠামো কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাঠামো নির্ধারণ করে তাদের কার্য বিশ্লেষণ করে, অন্যদিকে সমাজের কিছু কার্যের ভিত্তিতে তাদের কাঠামো সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ একটি সুসংহত সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে। সামগ্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অংশগুলি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে আর তাদের পারস্পরিক কাজ দ্বারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হয়, সমাজের মধ্যে সংকট ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই তা দূরীভূত হয় এবং পুনরায় ভারসাম্য ফিরে আসে, স্থিতাবস্থা নষ্ট হয় না। কাঠামো ও কাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই যে কোন সমাজে পরিবর্তন আসে—আর তা আসে ধীরে ধীরে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ সম্পর্কে ঐক্যমত্য এবং সমাজের লক্ষ্য ও নীতির ক্ষেত্রে ঐক্যের মনোভাব থাকলে সমাজব্যবস্থা বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু এই সংক্রান্ত ঐক্যমত্য বা ঐক্যের অভাব ঘটলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। আর সমাজে ভাঙন ঘটে।

৩.৪.৩ অ্যালমন্ডের কাঠামো-কার্যবাদের সমালোচনা (Criticism of Structural–Functionalism of Almond)

অ্যালমন্ডের কাঠামো—কার্যবাদের বিভিন্ন সমালোচনা দেখা যায়। সেগুলি হল—

১। দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যবস্থাকে কিভাবে চালু রাখা যাবে বা রক্ষা করা যাবে, তার কথা বলেছে। এটিকে তাই অনেকে স্থিতাবস্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখার তত্ত্ব বলেন। কিন্তু ব্যবস্থার পরিবর্তন, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বক্তব্য দৃষ্টিভঙ্গিটির মধ্যে পাওয়া যায় না; তাই অনেকে তত্ত্বটিকে রক্ষণশীল ও পরিবর্তন-বিরোধী বলে মনে করেন।

২। অ্যালমন্ডের মডেলকে বিদ্রূপ করে অনেকে বলেন যে তিনি কাঠামো ও কাজের কথা বারবার বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্যটি তাই পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।

৩। অ্যালমন্ড চারটি উপকরণ সংক্রান্ত এবং তিনটি উপপাদ সংক্রান্ত কাজের কথা বলেছেন। এই সাতটি কাজের প্রসঙ্গে ব্লন্ডেল বলেছেন যে, কাজ সংক্রান্ত অ্যালমন্ডের তথ্যগুলি সব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষতঃ সামগ্রিকতাবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর আলোচিত কাজগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। নিউম্যান, দ্যভারজার, ইত্যাদিরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ প্রসঙ্গে, ডয়েট্স রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে এবং ওয়েবার আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত নতুন ভাবনার কথা বলেছেন।

৪। সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে পরিবর্তনের প্রবল হাওয়া যাকে। কাঠামো-কার্যবাদ স্থিতাবস্থার কথা বলে। তাই সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সমস্যাসমূহ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটি অচল।

৫। দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধু বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করে, ইতিহাসের বিশ্লেষণ বা ভবিষ্যতের আলোচনা করে না।

৬। দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজনীতির আলোচনাকে যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপিত করে। যান্ত্রিকতার ভিত্তিতে মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

৭। দৃষ্টিভঙ্গিটি সমাজকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে। মার্কসবাদীরা বলেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, বিপ্লব ইত্যাদিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব দেয় না। তাঁরা আরও বলেন যে দৃষ্টিভঙ্গিটি সমাজের অর্থনৈতিক দিক বা উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের ওপর কোন আলোকপাত করে না।

৮। দৃষ্টিভঙ্গিটি সামাজিক সমস্যা ও সংকটের কারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসফল।

তবে বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গিটির কিছু গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সমাজের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ের ধারণা ও বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটির অবদান আছে। দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার উপযোগী বিভিন্ন পরিভাষা, যেমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক কাজ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সামাজীকরণ ইত্যাদিকে যুক্ত করে তুলনামূলক রাজনীতির পরিধিকে প্রসারিত করেছে, তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় আচরণবাদী তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে এবং তুলনামূলক রাজনীতিকে ধারণাগতভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

৩.৫ সারসংক্ষেপ

রাজনীতি চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা করার একটি নির্দিষ্ট ধারাকে বোঝায়। তুলনামূলক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে প্রধানত দুভাগে ব্যক্ত করা যায়—(ক) সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি, যেগুলি আদর্শমূলক, বর্ণনামূলক এবং মূল্যবোধযুক্ত, যেমন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। (খ) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেগুলি অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বিশ্লেষণমূলক এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ, যেমন, ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গি, কাঠামো—কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণবাদী নয়া-আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পূর্বোক্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়, আবার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাকে পৃথক বলে গণ্য করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণীবিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ব্যবস্থাপক, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যবস্থাপক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন ইস্টন। তাঁর মতে সমাজের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সামাজিক আচরণসমূহ থেকে সৃষ্ট কিছু ঘাত-প্রতিঘাতের সমষ্টি, যাদের মাধ্যমে সমাজে কাঙ্খিত বস্তুর বরাদ্দ নির্ধারিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল উন্মুক্ত ও গতিশীল, যা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, পরিবেশকেও প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মূল্যের কবিত্বসম্পন্ন বরাদ্দ সম্পন্ন হয় এবং উপকরণ (সমাজের চাহিদা ও সামর্থ্য) থেকে উপকরণ (সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত) সৃষ্ট হয়। চাহিদা বেশি থাক হলে বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন কমে গেলে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্ট হতে পারে। তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও পদ্ধতির পরিবর্তন দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় রাকার চেষ্টা চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলে, কিন্তু এত বলে যে সেই পরিবর্তন হবে শান্তিপূর্ণ পথে এবং ধীর গতিতে।

দৃষ্টিভঙ্গিটিকে অনেকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা বলে গণ্য করেন। তবে এর গুরুত্ব হল যে, এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় কিছু ধারণার সৃষ্টি করে।

কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ এবং অংশের কাঠামো ও কাজের বিশ্লেষণ করে। কাঠামো বলতে কার্যসম্পাদনকারী সংগঠনকে আর কাজ বলতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপকে বোঝানো হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমাজকে একটি একক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে, যার মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত কিছু ব্যবস্থা আছে এবং প্রত্যেক ব্যবস্থারই নিজস্ব কিছু কাজ আছে।

ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি উপাদানই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যে সমজাতীয় সামাজিক কাঠামো আছে, যেগুলি একই ধরণের কাজ করে—তবে কোনো কোনো কাঠামো অন্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি বিশেষীকৃত। কাজের আবার দুটি ধরণ আছে—উপকরণ

সংক্রান্ত কাজ এবং উপপাদ সংক্রান্ত কাজ। কাঠামো ও কাজ উভয়ের ভিত্তিতেই সমাজব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় থাকে বলে দৃষ্টিভঙ্গিটি মনে করে।

ভারসাম্য ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই দৃষ্টিভঙ্গিটির বৈশিষ্ট্য। তাই একে অনেকেই রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধী বলে মনে করেন। দৃইষ্টভঙ্গিটি সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পরিবর্তনের হাওয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তবে সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটি সহায়তা করে।

৩.৬ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১. ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি চিত্রসহ আলোচনা করুন।

২. ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

৩. কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী :

১. অ্যালমণ্ডের কাঠামো—কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

২. কাঠামো—কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপকরণ উপপাদ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩. অ্যালমণ্ডের কাঠামো—কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

৪. ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগুলি লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. তুলনামূলক রাজনীতিতে দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ লিখুন।

২. দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ?

৩. ব্যবস্থা বলতে কি বোঝেন?

৪. তুলনামূলক রাজনীতির সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি কোনগুলি?

৫. তুলনামূলক রাজনীতিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝেন?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী :

1. Apter David E, Introduction to Political Analysis.
2. Chatterjee Rakhari, Comparative Politics : History, Methods and Approaches, K. P. Bagchi & Co. Ltd. Calcutta, 1998.
3. Dahl Robert A. : Modern Political Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1963.
4. Dyke, V. V. : Political Science : A Phiolosophical Analysis, Stanford University Press Stanford, 1962.
5. Earston, David : The Political System : Enquiry into the State of Political Science, Scientific Book Agency, Calcutta, 1953.
6. Finer, S. E. : Comparative Government, Penguin Press, Great Britain, 1975.
7. Johari, J. C. : Comparative Politics, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1999.

একক ৪ □ উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের তত্ত্বসমূহ : নয়া উদারনীতিবাদী, নির্ভরতা ও বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব

- ৪.৩.১ নয়া উদারনীতিবাদের অর্থ
- ৪.৩.২ নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্ব
- ৪.৩.৩ নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বের সমালোচনা

৪.৪ নির্ভরতা তত্ত্ব এবং উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণা

- ৪.৪.১ নির্ভরতা তত্ত্বের দুটি ধরন
- ৪.৪.২ সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য
- ৪.৪.৩ সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ৪.৪.৪ নির্ভরতার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

৪.৫ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব

- ৪.৫.১ ভূমিকা
- ৪.৫.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য
- ৪.৫.৩ কিউবার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

৪.৬ বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব

- ৪.৬.১ বিশ্বব্যবস্থার ধারণা
- ৪.৬.২ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের উদ্ভব
- ৪.৬.৩ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের বক্তব্য
- ৪.৬.৪ বিশ্ব-ব্যবস্থার কেন্দ্র, আধাপ্রান্ত, প্রান্ত এবং বাইরের এলাকার ধারণাসমূহ
- ৪.৬.৫ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের সমালোচনা

৪.৭ সারসংক্ষেপ

৪.৬.৫ বিশ্ব-ব্যবস্থার তত্ত্বের সমালোচনা

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীগণ যেসব বিষয় জানতে পারবেন, সেগুলি হল ঃ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণা।
- উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব
- নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্ব।
- নির্ভরতা তত্ত্ব ও তার দুটি ধরন—সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব ও নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব।
- বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব।

৪.২ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তুলনামূলক রাজনীতি শাস্ত্রে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণা যুক্ত হয়। তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীন অফ্রো-এশিয় দেশগুলির উদ্ভব উন্নয়নের ধারণা বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে সদ্যস্বাধীন না হলেও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বলে পরিগণিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের ধারণার সঙ্গে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরও যুক্ত। অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর কম এবং দারিদ্র্য বেশি হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের আফ্রো-এশিয় ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পশ্চিমের উন্নত ও ধনী দেশগুলির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ফারাক সহজেই উপলব্ধি করে। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের ধারণা গুরুত্ব লাভ করে।

উন্নয়নের ধারণাটি সেই সব আফ্রো-এশীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য, যেগুলিতে উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, যেগুলি কৃষিনির্ভর, রাজনৈতিক ভাবে অনভিজ্ঞ এবং অল্প শিল্পোন্নয়নযুক্ত। সেই সব দেশের একটি বা একাধিক দিকের অর্থনীতিগত ও রাজনীতিগত উন্নয়নসংক্রান্ত আলোচনা হল উন্নয়নের আলোচনা, যদিও একই বিষয় সংক্রান্ত উন্নত দেশের আলোচনাকে উন্নয়নের আলোচনা বলা যায় না। অর্থাৎ, উন্নয়ন শব্দটির একটি ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট আছে।

উন্নয়নের আলোচনার উদ্দেশ্য হল তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ কিছু দিকের উন্নয়ন প্রসঙ্গ—অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পায়ন এবং রাজনৈতিক দিক থেকে গণতন্ত্র, স্থায়িত্ব, বৈধতা, জাতীয় ঐক্য, আমলাতন্ত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ। যদি তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জন করে, তাহলে তার উন্নয়ন ঘটেছে বলা হয়। উন্নয়ন শব্দটি কার্যগত অর্থে প্রযুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আধুনিক উন্নত, ধনী, শিল্পপ্রধান ও শহরপ্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের কাজসংক্রান্ত বৈশিষ্টসমূহ অনুন্নত দেশগুলি অর্জন করেছে কিনা দেখা হয়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি আধুনিকীকরণের ধারণা থেকে উদ্ভূত। আধুনিকীকরণ বলতে সাবেকি বা প্রাক্-আধুনিক সমাজের আধুনিক সমাজে উত্তরণের প্রগতিশীল ধারাকে বোঝায়। এই ধারার মধ্যে শিল্পায়ন, শহরায়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ, সাক্ষরতা বৃদ্ধি, গণমাধ্যমের প্রসার, অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচলতা, গণতন্ত্রের প্রসার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদিকে বোঝায়। উন্নয়নের সঙ্গেও এগুলির যোগ আছে। যেসব দেশগুলি আধুনিক, তাদেরকেই উন্নত বলা হয় আর একটি দেশ যত বেশি আধুনিক ও উন্নত, আন্তর্জাতিক স্তরে তার তত বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদা দেখা যায়।

উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কিছু নয়া উদারনীতিবাদ তাত্ত্বিক মনে করেন যে, উপযুক্ত সহায়তা পেলে সাবেকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির উন্নয়নের প্রবাহ আনা যায়—জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা ও চাকরির সুযোগবৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও পরিকাঠামোর সৃষ্টি করা যায়। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঐতিহ্যকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন। এবং সেগুলিকে কোন গুরুত্ব দেন না। আবার তাঁদের সমালোচকদের মতে, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের নামে সাবেকি সমাজের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধ্বংস করা হয়, কিন্তু নতুন কোন সুযোগ যেখানে দেখা যায় না। ফলে তাঁরা মনে করেন যে, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য অনেক সমাজেই সাবেকি দারিদ্র্যের পরিবর্তে দারিদ্র্যের আধুনিক রূপ প্রকটতরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি তত্ত্ব হল নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব, নির্ভরতা তত্ত্ব এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব।

৪.৩ উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব

৪.৩.১ নয়া উদারনীতিবাদের অর্থ

অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লবের পর যে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী দর্শনের আবির্ভাব ঘটে, তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত করে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলে, অবশ্যই অন্যের ক্ষতি না করে। মিল, বেন্থাম প্রমুখরা বলেন যে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিলে ব্যক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং সমস্ত ব্যক্তিদের বিকাশ ঘটলে সমাজেরও অগ্রগতি ঘটবে। এই ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ মুক্ত বাজার, উৎপাদনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের প্রসার, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। কিন্তু ১৯৩০ সালে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা ঘটে তার ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। এই ভয়াবহ মন্দার কারণ

হিসাবে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী নীতিসমূহকে দায়ী করা হয়। এই সময় থেকে মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির বদলে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা বলেন নয়া উদারনীতিবাদীরা, যাকে অনেকে সামাজিক বাজার অর্থনীতি (Social Market Economy) বলেন। নয়া উদারনীতিবাদ হল উদারনীতিবাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমষ্টিবাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ—উভয়ের মধ্যবর্তী পথ, যা একদিকে পুঁজিবাদ-বিরোধী এবং অন্যদিকে সমষ্টিবাদ-বিরোধী তত্ত্ব। ১৯৩৮ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippman), আলেকজান্ডার রাস্টাও (Alexander Rüstow) প্রমুখরা নয়া উদারনীতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ঘটে। তাঁরা অবাঞ্ছিত বাজার কাঠামোর সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কথা বলেন। তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রের কাজ হল বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর করা। বস্তুত, ১৯৬০ সালে চিলিতে রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সামাজিক অসাম্য হ্রাস ও একচেটিয়া কারবার বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু ১৯৭০ সালের শেষ থেকে রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় নয়া উদারনীতিবাদের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি বা সংস্কারনীতির বদলে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের অবাধ বাণিজ্য ও চরমপন্থী ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণার জয়যাত্রা সূচিত হয়। মিল্টন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman) ও ফ্রিডরিশ হায়েক (Friedrich Hayek) এর নামের সঙ্গে এই মতবাদ যুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে চিলিতে পিনোচেট (Pinochet)-এর অভ্যুত্থানের পর নয়া উদারনীতিবাদের বদলে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ ফিরে আসে।

উদারনীতিবাদের ধারণাটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। মিল (Mill), বেন্থাম (Bantham) থেকে শুরু করে ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippman), আলেকজান্ডার রাস্টাও (Alexander Rüstow) এবং সেখান থেকে ফ্রিডরিশ হায়েক, মিল্টন ফ্রিডম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন অর্থে ধারণাটিকে ব্যবহার করেছেন।

৪.৩.২ নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রধানত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। পরে তাঁদের উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণাসমূহ পশ্চিম ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রসারিত হয়। উন্নয়নের নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াল্টার ডব্লিউ রস্টো (Walter W. Rostow), ড্যানিয়েল লারনার (Daniel Lerner), কার্ল ডয়েটশ্ (Karl Deutsch), এস. এম. লিপসেট (S. M. Lipset), ডেভিড অ্যাপ্টার (David Apter), লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) প্রমুখরা। তাঁদের পশ্চিমীকরণ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি ধারণাগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ভয়াবহ মৃত্যুলীলা ও ধ্বংসলীলা ঘটে, তা দেখে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় নয়া উদারনীতিবাদী কিছু মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে, সব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা হলে স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি সম্ভব হবে, নতুবা নয়।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত ওয়াল্টার ডব্লিউ রস্টোর 'Stages of Economic Growth' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উন্নয়ন অর্থনীতির পরিচয় প্রদান করে। রস্টো অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়কে চিহ্নিত করে বলেন যে সব দেশকেই পর্যায়গুলি অতিক্রম করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তাঁর মতে, সব দেশকেই একই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তবে সকলে সমভাবে উন্নত না হলেও সকলেই উন্নয়নের সুফলগুলি পেতে পারে। রস্টোর মতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের অর্থ হল পশ্চিমীকরণ।

রস্টো ধনী ও উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে আমদানি করার ওপর জোর দেন এবং বলেন যে এইসব দেশের সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পরিচালনাধীনে শহরায়ন, শিল্পায়ন, ধনতন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে দেশগুলির সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হবে। উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের শর্ত হিসাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নত দেশগুলির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব, জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি আমদানি করার কথা বলা হয়। দারিদ্র্য, জীবনযাত্রার অনুন্নত মান, সাবেকি উৎপাদনব্যবস্থা, অশিক্ষা ইত্যাদি, তাঁর মতে, উন্নয়নের বিপরীত অর্থ বহন করে। একই ধারণা সমর্থিত হয় ডানিয়েল লারনা-এর "The Passing of Traditional Society" (1958), কার্ল ডয়েট্‌শের "Social Mobilisation and Political Development" (1962) এবং এস. এম. লিপসেটের "The Political Man" (1959) গ্রন্থগুলিতে।

তাঁদের বক্তব্যগুলি তুলনামূলক আলোচনার জন্য এক আন্তর্জাতিক কাঠামো ও বিশ্বজনীন বক্তব্য উপস্থাপিত করে, যা শুধুমাত্র উন্নয়ন সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা নয়, নতুন দেশগুলিতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথাও বলে। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে উন্নত বিশ্ব দ্বারা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান এবং তার ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ ছিল; তবে তার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। মার্শাল প্ল্যান থেকে অনুসৃত মার্কিন উন্নয়নমূলক নীতিগুলি ছিল এক ধরনের মতাদর্শগত স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত—কার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব বিশ্বের কাছে বেশি গ্রাহ্য সেই প্রশ্নে। উভয়েই বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্র (Political Space) কে দখল করতে চেয়েছিল, পুরোপুরি ভাবে উপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মার্কিন চিন্তাবিদ রস্টো তাঁর উন্নয়নসংক্রান্ত বুর্জোয়া নয়া উদারনীতিবাদী ধারণাগুলি প্রচার করেন। কেনেডি রস্টোনীতিকে সমর্থন জানান। আমেরিকা অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য বিভিন্ন সাহায্য সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করে এবং এই সব সাহায্য কর্মসূচী কাঁকড়ার মত তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলিকে চেপে ধরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল ভিয়েৎনামে সামরিক বাহিনী নিয়োগ, ল্যাটিন আমেরিকার প্রগতি সুনিশ্চিতকরণ, মহৎ সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি (Great Society Attitude) বা শান্তিবাহিনীসুলভ মেজাজ (Peace Corps Mood)। এই সময় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনামূলক রাজনীতির কিছু ছাত্র নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বের কিছু ধারণা, বক্তব্য ইত্যাদিকে ভিত্তি

করে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা ও উদারনীতিবাদী বহুত্বের উপাদানগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খোঁজার চেষ্টা শুরু করে।

গ্যাব্রিয়ল অ্যালমন্ড দ্বারা সম্পাদিত "The Politics of Developing Areas" এবং গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও বিংহাম পাওয়েল দ্বারা লিখিত "Comparative Politics: A Development Approach" গ্রন্থ দুটিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রথমটি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক বিধি এবং দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণের কাঠামোগত দিক নির্দেশ করে। দুটি গ্রন্থেরই বক্তব্য হল—

(ক) আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় কয়েকটি বিশেষ কাঠামোর মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ কার্য সম্পাদনকারী জাতীয় রাষ্ট্রসমূহকে।

(খ) তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির কাছে আন্তর্জাতিক সমাজে উপযুক্ত মর্যাদালাভের জন্য আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমজাতীয় হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

(গ) তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছাকাছি পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে একই ধরনের কাজের জন্য একই ধরনের কাঠামো গড়ে তুলবে।

(ঘ) রাজনৈতিক উন্নয়ন চর্চার জন্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিকে আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও কাজের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

লুসিয়ান পাই তাঁর 'Aspects of Political Development' গ্রন্থে বলেছেন যে রাজনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আবার একটি রাষ্ট্রে তখনই রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় যখন সেখানে অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত শর্ত উপস্থিত থাকে। রাজনৈতিক উন্নয়ন হল বিশেষভাবে শিল্পপ্রধান সমাজের রাজনীতি। শিল্পোন্নত নয়, এমন সমাজ ওই মান আয়ত্ত করতে পারলে তাকেও রাজনৈতিক ভাবে উন্নত বলা যায়। রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণকে তিনি সমার্থক মনে করেন। আধুনিকীকরণের সেই সার্বজনীন মান হল পাশ্চাত্য সমাজের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও আচরণের সমতুল্য। নৃকুলবাদ, উপজাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদকে তিনি উপেক্ষা করেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক উন্নয়ন হল জাতীয় রাষ্ট্রের কাজ। তাই উন্নত রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে সংগঠিত হতে হবে, ধর্মীয় সৌভ্রাত্র, উপজাতীয় বন্ধন বা নৃকুল সমাজের ভিত্তিতে নয়। জাতীয় রাষ্ট্রকে জনশৃঙ্খলা রক্ষার সামর্থ্য, যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। রাজনৈতিক উন্নয়নকে তিনি জনযোজন (Mobilisation of People) এবং গণ অংশগ্রহণের সমার্থক মনে করেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নতুন ধরনের জাতীয়তাবোধের জাগরণ প্রয়োজন। এই জাতীয় অনুভূতির জন্ম হতে পারে, তাঁর মতে, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণঅংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে। রাজনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়ন যুক্ত। এই অর্থে রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি উন্নত রাষ্ট্র, যেখানে প্রশাসনিক কাজের জন্য সরকারি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে লুসিয়ান পাই বোঝেন পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবর্তনকে এবং সম্পদসংগ্রহ ও সিদ্ধান্তসমূহকে বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে।

তৃতীয় বিশ্বের নতুন রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক উন্নয়নের পথ মসৃণ নয়—তাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লুসিয়ান পাই-এর মতে সেগুলি হল—

(ক) **পরিচয়ের সংকট (Identify Crisis)** :

নতুন জাতীয় পরিচয়জনিত সাধারণ অনুভূতি লাভ করার জন্য নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণকে তাদের পুরোনো উপজাতীয় তা ভাষাগত পরিচয় পরিত্যাগ করতে হয়। জনগণ এই দুইয়ের মধ্যে চলাফেরা করলে জাতীয় পরিচয় সুদৃঢ় হয় না।

(খ) **বৈধতার সংকট (Legitimacy Crisis)** :

জনগণকে তাদের নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিভিন্ন স্তর) ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাসমূহকে বৈধ বলে মেনে চলতে হবে; নতুবা বৈধতার সংকট দেখা দেবে।

(গ) **ভেদ্যতার সংকট (Penetration Crisis)** :

সরকার ও প্রশাসনকে জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে এবং জাতীয় স্তর ভেদ করে স্থানীয় বা গ্রাম স্তরে জনগণের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য কার্যকর নীতি প্রয়োগ করতে হবে। নতুবা ভেদ্য তার সংকট দেখা দেবে।

(ঘ) **অংশগ্রহণজনিত সংকট (Participation Crisis)** :

গণঅংশগ্রহণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। না হলে অংশগ্রহণজনিত সংকট সৃষ্টি হবে।

(ঙ) **ঐক্যজনিত সংকট (Integration Crisis)** :

জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজন, বিভিন্ন পথে সেই প্রয়োজনের প্রকাশ এবং সেই প্রয়োজনকে সরকারি কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য সরকারি কাঠামোর বিভিন্ন অংশ এবং সরকার ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ককে সংগঠিত করার সামর্থ্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। নতুবা ঐক্যজনিত সংকট ঘনীভূত হবে।

(চ) **বণ্টনজনিত সংকট (Distribution Crisis)** :

জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সরকারি সুযোগসুবিধা বণ্টনের নীতিসমূহের প্রবর্তন এবং প্রয়োজনে তাদের পরিবর্তন করার সরকারি সামর্থ্য দরকার। নতুবা বণ্টনজনিত সংকট ঘটবে।

রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করার পর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে কোন না কোন সময় এই সব সংকটের মোকাবিলা করতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই সব সংকট কোন গতিতে আসে, একসঙ্গে আসে কিনা বা কিভাবে সেগুলির মোকাবিলা করা হয়, তা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনার বিষয়।

৪.৩.৩ নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বের সমালোচনা

উন্নয়নসংক্রান্ত নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত কাঠামো ও আচরণসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু এই দেশগুলির ইতিহাস বা ঐতিহ্যকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তারা চেয়েছিল স্বার্থসমষ্টিকারী রাজনৈতিক দল বা স্বার্থব্যক্তকারী স্বার্থগোষ্ঠী, গণমাধ্যম, আমলাতন্ত্র ইত্যাদির প্রবর্তন। যেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির অনুরূপ ছিল না, সেগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়। ফলে এই উন্নয়ন তত্ত্ব অনেকের কাছে পক্ষপাতপুষ্ট, অবিশ্বজনীন ও জাতিকেন্দ্রিক বলে প্রতিভাত হয়। বিশ্বজনীনতার আড়ালে বিশেষ কোন দেশের সাংস্কৃতিক সুনির্দিষ্টতা বা ঐতিহাসিক পটভূমিকে সরিয়ে দেওয়াকে তারা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না।

আধুনিকীকরণ, পশ্চিমীকরণ ও উন্নয়নকে এই তত্ত্ব সমার্থক বলে মনে করে। অর্থাৎ যেসব বিষয় আধুনিক নয়, সেগুলি হল সাবেকি এবং সেগুলি হল উন্নয়নের পরিপন্থী। আধুনিকতা ও যুক্তিবাদকে একত্রিত করে এই তত্ত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, যা কিছু সাবেকি, তাই যুক্তি-বিরোধী। এই মূল্যায়ন থেকে উন্নয়নের নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব উপজাতীয়তাবাদ বা নৃকুলত্বকে সাবেকি বলে উপেক্ষা করে এবং তৃতীয় বিশ্বের উপজাতীয় বা নৃকুল আন্দোলনসমূহের আধুনিক কারণগুলিকে অস্বীকার করে, যেমন অর্থনৈতিক অসাম্যের উপস্থিতি, বিভেদমূলক রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদি।

নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তাত্ত্বিকরা উপনিবেশবাদের ঘটনাকে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের জন্য উপনিবেশবাদের প্রভাবে ও ঔপনিবেশিক শাসকদের দায়িত্বকে গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ দ্বারা পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি উপকৃত হয়েছে—তাদের পক্ষে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে; একই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়ন তত্ত্বের আধুনিকতার ধারণা ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে না। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম, ভারতে হিন্দু এবং ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিতত্ত্ব (Liberation Theology) যে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে, এই তত্ত্ব তা অস্বীকার করে। ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য কিছু দেশেও ধর্ম রাজনৈতিক বিবেক হিসাবে এবং জনতার একত্রীকরণের শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধর্মীয় ধারণাসমূহ কখনও কখনও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে, কখনও কখনও অবশ্য নয়।

ব্যবস্থার সংরক্ষণের স্বার্থে এবং পরস্পরনির্ভর কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য কাঠামোসমূহের শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ওপর এই তত্ত্ব গুরুত্ব আরোপ করে। এই বক্তব্যকে অনেকে রক্ষণশীলতার প্রকাশ এবং স্থিতাবস্থা বা পুঁজিবাদকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা বলে মনে করেন।

বাস্তবগত ক্ষেত্রেও সমস্যা ঘটে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদির ফলে নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্বের ইউটোপিয়া সম্বন্ধে অনেকের মোহভঙ্গ ঘটে। সামাজিক চলনশীলতা, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ, গণ-অংশগ্রহণ ইত্যাদি তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার বদলে দুর্বল করে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ অবশ্য আগেই স্বাধীনভাবে চলার জন্য

১৯৬১ সালে জোট-নিরপেক্ষ নীতি (NAM) গ্রহণ করেছিল এবং উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্লক সৃষ্টি করেছিল।

নয়া উদারনীতিবাদীদের উন্নয়ন তত্ত্ব ১৯৭০ এর দশকেই প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য দেখা যায় এবং বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্ব দেখা যায়—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল নির্ভরতা তত্ত্ব ও বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব।

তবে সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয় যে এই তত্ত্ব অনেক ধারণার সৃষ্টি করেছিল যেগুলির বৌদ্ধিক যৌক্তিকতা আজও বর্তমান। এই তত্ত্ব রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনাকে ইউরোপ-আমেরিকা বা পশ্চিমী জগৎ থেকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বহু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের দ্বারা অনুসৃত কিছু আধুনিক ব্যবস্থা বা বৈশিষ্ট্যসমূহও গুরুত্ব লাভ করেছে; যেমন গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এখন শুধু ব্রিটেন বা হল্যান্ডের দলব্যবস্থার কথা বলা হয় না, ভারতের দলব্যবস্থাকেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখনও বাজার অর্থনীতি অনুসরণ এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪.৪ নির্ভরতা তত্ত্ব এবং উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ধারণা

৪.৪.১ নির্ভরতা তত্ত্বের দুটি ধরন

১৯৪৯ সালে হ্যানস সিঙ্গার (Hans Singer) ও রল প্রেবিশ Raul Prebish) এর লেখনীর মাধ্যমে সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে। সিঙ্গার-প্রেবিশ (Singer-Prebish) নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য ছিল যে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশগুলি দ্বারা স্থিরীকৃত ব্যবসার শর্তগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক অবনতি বৃদ্ধি করেছে। প্রেবিশের নির্ভরতা তত্ত্ব অনুসারে অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে এবং তাদের উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করে আর ধনী পশ্চিমী দেশগুলি সেগুলির সাহায্যে শিল্পজাত পণ্য (Manufactured Goods) উৎপাদন করে এবং দরিদ্র দেশগুলিকে সেগুলি বিক্রি করে—বহুগুণ বর্দ্ধিত দামে। তাই দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমাগত কম শিল্পজাত পণ্য আমদানি করতে পারে। তাদের রপ্তানির সাহায্যে তারা আমদানির খরচ মেটাতে পারে না।

এই সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বকে মার্কসীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিকশিত করেন পল এ. বারান (Paul A. Baran) ১৯৫৭ সালে তাঁর "The Political Economy of Growth" গ্রন্থে এবং ওয়াল্টার রডনি তাঁর "How Europe Under-developed Africa" গ্রন্থে। তাঁদের তত্ত্বকে নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব বলা হয়। তাঁদের আলোচনার ধারার সঙ্গে রোজা লুক্সেমবুর্গ (Rosa Luxemburg) ও ভি.আই. লেনিনের (V. I. Lenin) সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের কিছু মিল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, নির্ভরতা তত্ত্বের দুটি ধরন দেখা যায়—প্রথমটি হল ল্যাটিন আমেরিকার সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব (প্রবক্তারা হলেন সিঙ্গার, প্রেবিশ, সেলসো ফার্টাডো (Celso Furtado), অ্যানিবাল পিন্টো (Anibal Pinto) এবং দ্বিতীয়টি হল নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব (যার প্রবক্তাগণ হলেন পল এ. বারান, ওয়াল্টার রডনি, পল সুইজি (Paul Sweezy) এবং অন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank)।

৪.৪.২ সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য

পাশ্চাত্যের নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের উন্নয়ন সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নির্ভরতা তত্ত্বের জন্ম হয়। নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব অনুসারে সব সমাজকেই বিকাশের একই ধরনের পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করতে হয়। আজকের অনুন্নত দেশগুলির অবস্থাকে তারা উন্নত দেশগুলির অতীতের অবস্থার সমজাতীয় বলে মনে করে এবং তাদের দারিদ্র্যমুক্তির জন্য তাদেরকে উন্নয়নের সাধারণ পথ গ্রহণ করতে বলে, যেমন স্বাধীন ও মুক্ত বাজার সৃষ্টি, পুঁজি বিনিয়োগ, শিল্পপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব এই নয়া উদারনীতিবাদী বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে। সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব অনুসারে অনুন্নত দেশগুলি আজকের উন্নত দেশের প্রাচীন রূপ শুধু নয়, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো আছে এবং তারা বিশ্ব অর্থনীতিতে দুর্বল সদস্য হিসাবে থেকে গেছে।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে তৃতীয় বিশ্বে—ল্যাটিন আমেরিকায়। এই তত্ত্বের স্রষ্টা প্রেবিশ ছিলেন একজন আর্জেন্টিনীয় অর্থনীতিবিদ্ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ল্যাটিন আমেরিকার জন্য কমিশন (United Nations Commission for Latin America) এর সদস্য। তিনি দেখেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি অনায্য ও অসম অবস্থায় আছে। তারা দরিদ্র, তাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ কম, তাদের অর্থনৈতিক ও সামারিক ক্ষমতা কম, তাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হল কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তারা আছে উন্নয়নের পথ থেকে শত হস্ত দূরে। অন্যদিকে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি ধনী, তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত ধরনের, তাদের প্রভূত অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নতি ঘটেছে এবং তারা উন্নয়নের উচ্চশিখরে অবস্থিত। বস্তুতঃ তারা বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। এই অসাম্যের কারণ অনুসন্ধান, অসাম্যের দূরীকরণ এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর গবেষণা পরিচালিত হয়। তিনি অনুন্নত দেশগুলির পিছিয়ে পড়া অবস্থানের জন্য উন্নত দেশগুলিকে দায়ী করেন। তাঁর সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য হল যে একটি উন্নত দেশ কয়েকটি অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে আটকে রাখে এবং তাদের ক্ষতিসাধন করে। এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং তাদের অর্থনীতির চাবিকাঠি থাকে নিয়ন্ত্রক উন্নত দেশের হাতে।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলিকে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে—প্রথমটি হল উন্নত রাষ্ট্রসমূহ—যারা কর্তৃত্বকারী, কেন্দ্রীয় বা মহানগরী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয়টি হল অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি, যারা অধীনস্থ, প্রান্তিক বা উপনগরী হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলি সকলেই শিল্পসমৃদ্ধ (উদাহরণ: আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ) এবং অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলি ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত, যাদের মাথাপিছু আয় কম, দারিদ্র্য বেশি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য নিজ

কাঁচামাল বা কৃষিপণ্য রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলি বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক পণ্য বাজার ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক সাহায্য প্রদান, কারিগরি ও প্রযুক্তির চালান ইত্যাদি যে কোন পন্থার মাধ্যমে অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিতে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে। উভয় গোষ্ঠীর (কর্তৃত্বকারী ও অধীনস্থ) সম্পর্ক গতিশীল, উভয়েই আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় যুক্ত এবং এই প্রক্রিয়ার ফল হল উভয়ের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি। উন্নত রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিণাম হল অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির আরও অনুন্নয়ন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অল্পোন্নত ব্যবস্থাকে সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব তাদের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির আন্তঃসম্পর্কের পরিণাম বলে ব্যাখ্যা করে। নির্ভরতা তত্ত্বের বহু প্রবক্তাই পুঁজিবাদকে নির্ভরতার সম্পর্কের চালিকাশক্তি বলে গণ্য করেন। পুঁজিবাদ যে কঠোর আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তার ফলে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল বা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলিকে সস্তায় খনিজ দ্রব্য, কৃষি পণ্য ও শ্রম সরবরাহ করে এবং অনেক বেশি দামে উন্নত বা কর্তৃত্বকারী দেশগুলি থেকে প্রযুক্তি, শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি করে। এই লেনদেনের শর্ত স্থির করে উন্নত দেশগুলি। শর্তগুলিকে তারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। ফলে অনুন্নত ও অধীনস্থ তৃতীয় বিশ্ব অনুন্নত ও দরিদ্র থেকে যায়।

সনাতনী নির্ভরতার তত্ত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ব্যাখ্যা করে অধীনস্থ বা নির্ভরশীল রাষ্ট্রের অল্পোন্নতি বা অনুন্নতির কারণ আর দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণ করে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকে। প্রথমটি বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম আর দ্বিতীয়টি জানায় সাম্রাজ্যবাদের কারণ। তাছাড়াও সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব অনুসারে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্র নিজেই নিজের বিনাশ ডেকে আনে। অধীনস্থ অঞ্চলসমূহকে কব্জা করার জন্য কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ হল তাদের বিনাশের কারণ, কিন্তু সনাতনী নির্ভরতার তত্ত্ব অনুসারে নির্ভরশীলতা বা অধীনতার সম্পর্ক (উন্নত দেশের ওপর অনুন্নত দেশের) নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের কিছু কিছু লেখক শুধু ধনতন্ত্রকে নির্ভরতার সম্পর্কের চালিকাশক্তি বলে মানতে নারাজ। তাদের মতে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিও নির্ভরতার সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হয়।

৪.৪.৩ সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সনাতনী নির্ভরতার তত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য হল—

১। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না। বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বোঝা যায়। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে উন্নত দেশগুলির রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উন্নত দেশগুলি (কেন্দ্র বা মূল) থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে (অঞ্চল বা প্রান্ত) নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার প্রভাব প্রবাহিত হয়। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা উন্নত দেশগুলিকে অল্পই প্রভাবিত করে।

২। বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুন্নত দেশ (অঞ্চল বা প্রান্ত) গুলির সঙ্গে উন্নত দেশ (কেন্দ্র বা মূল) গুলির এবং উন্নত দেশ (কেন্দ্র বা মূল) গুলির নিজেদের মধ্যে নানা আদান প্রদান ঘটে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলি (প্রান্ত বা অঞ্চল)-র নিজেদের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া খুবই কম হয়। ফলে অনুন্নত দেশ (অঞ্চল বা প্রান্ত) গুলি দুর্বল হয় এবং তারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়। শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ উন্নত দেশ (কেন্দ্র বা মূল) গুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলি (অঞ্চল বা প্রান্ত)-র সম্পর্ক সমস্তরের হয় না।

৩। রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর সংযুক্ত—তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ছাড়া তাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা যায় যে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলির সম্পর্ক প্রথমোক্তদের পক্ষে সুবিধাজনক, কিন্তু শেষোক্তদের পক্ষে অসুবিধেজনক। অনুন্নত দেশগুলিকে শুধুমাত্র কাঁচামালের উৎপাদক ও সস্তা শ্রমের ভান্ডার হিসাবে উন্নত দেশগুলি দেখে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে, সেই সুযোগ অনুন্নত দেশগুলির নেই। উন্নত-অনুন্নত দেশসমূহের ব্যবসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ক্রমাগত বর্ধিত করে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বাড়তে থাকে, সংকুচিত হয় না।

৪। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলির সম্পর্ক বা ব্যবসাগত আদান-প্রদানের ফল হল যে প্রথমোক্তরা দ্বিতীয়োক্তদের অনুন্নয়ন সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়োক্তরা প্রথমোক্তদের উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং দ্বিতীয়োক্তরাই প্রথমোক্তদের উন্নয়নকে সম্ভব করে অর্থাৎ উন্নত ও অনুন্নত দেশ বা বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র ও অঞ্চল এলাকা হল বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি অংশ এবং একের অস্তিত্ব অন্যকে বাদ দিয়ে নয়।

৫। যতদিন পুঁজিবাদের প্রাধান্য থাকবে, ততদিন উন্নত বা অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের কোন পরিবর্তন হবে না। অনুন্নয়ন সাময়িক অবস্থা নয়, স্থায়ী অবস্থা। যদি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কেন্দ্র বা উন্নত দেশগুলি আরও শক্তিশালী হবে এবং অঞ্চল বা অনুন্নত দেশগুলি আরও দুর্বল হবে। উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি পৌঁছানোর বদলে বর্তমানের অনুন্নত দেশগুলি আরও পশ্চাতে যাত্রা করবে। খুব সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে ব্যতিক্রমী অবস্থা দেখা যায়, সেখানে অনুন্নত দেশ বা অঞ্চল বা এলাকা উন্নত বা কেন্দ্র এলাকায় পৌঁছতে পারবে।

৬। বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলির মধ্যে যে সম্পর্কের ধারা দেখা যায়, তার প্রতিচ্ছবি তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক দেশের মধ্যে একটি কেন্দ্র এলাকা আছে, যা সাধারণত সেই দেশের রাজধানী, বা বড় শহর; এরা সেই দেশের অঞ্চলসমূহকে (প্রত্যন্ত এলাকা) শোষণ করে এবং নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত ও সামরিক ক্ষমতা সেই কেন্দ্র এলাকায় কেন্দ্রীভূত থাকে এবং দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা ও সম্পদ অঞ্চলগুলির

তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে রাজধানী ও বড় শহরগুলি ক্রমাগত বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে আর গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলি দুর্বলতর হয়ে পড়ে। অঞ্চলগুলি থেকে সম্পদ কেন্দ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার বদলে রাজধানী ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৭। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় থেকে উন্নত দেশগুলির ওপর অনুন্নত দেশগুলির নির্ভরতার সম্পর্ক চলে আসছে। অনুন্নত দেশগুলির বর্তমান নেতারা বা এলিট সম্প্রদায় (সরকারি প্রশাসক, আমলা, সেনাবাহিনী, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মালিক) এই অধীনতার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চান, কারণ তাঁদের নিজেদের স্বার্থ কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁরা উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং উন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান, পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদির অংশীদার হন। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির নেতাদের সাদৃশ্য দেখা যায়, তাঁদের নিজেদের অনুন্নত রাষ্ট্রের নাগরিকদের সঙ্গে নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাঁরাই বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নিজেদের দেশের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন এবং এই যোগাযোগকে তাঁরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন, যাতে উন্নত দেশগুলি বা বিশ্বের কেন্দ্র এলাকা এই যোগাযোগ থেকে লাভবান হয়। তাঁরা নিজেরা ব্যক্তিগত স্তরেও লাভবান হন। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার জন্য তাঁরা নিজ দেশের জনগণকেও প্রতারিত করেন।

৮। নির্ভরতা তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ আছে, যা ব্যক্ত করা যায়। তবে এই জাতীয় স্বার্থরক্ষা করা যায় সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর প্রয়োজন পূর্ণ করার মধ্যে, ধনী, ব্যবসায়ী বা সরকারের শ্রীবৃদ্ধি করে নয়।

৪.৪.৪ নির্ভরতার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি বিশ্লেষণের ধারণাগত কাঠামো নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অসাম্যজনিত সমস্যাসমূহের সমাধানের কথাও ভেবেছেন। নির্ভরতা তত্ত্বের বিভিন্ন ধরন আছে এবং তাদের সমাধান সংক্রান্ত বক্তব্যও নানা রকম।

রল প্রেবিশ ও নরমপন্থী তাত্ত্বিকদের মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি সুপারিশ হল কমন মার্কেট বা সাধারণ বাজার গঠন বা ব্যবসা-ব্লক বা কার্টেল গঠন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়। সকলে একত্রিতভাবে উন্নত দেশগুলির সামনে একটি কমন ফ্রন্ট বা সাধারণ জোট গঠন করলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এই যোগাযোগ থেকে অনেক বেশি সুবিধা আদায় করতে পারবে। ব্লক বা কার্টেল গঠন করলে কেন্দ্র বা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উপকৃত হবে, কারণ একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের একক ক্ষমতার থেকে সকলে সম্মিলিত ভাবে অনেক বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তবে আধুনিক কালের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে কার্টেল গঠন সুবিধাজনক হবে না।

দ্বিতীয় সুপারিশ হল যে তৃতীয় বিশ্বের এলিট গোষ্ঠী তাদের দেশের নির্ভরশীল অবস্থা পরিবর্তনের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে এগিয়ে আসতে পারে। তাদের কিছু সম্পদ তারা জাতির শিল্প নির্মাণ কাজ বা সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করতে পারে, বিলাসদ্রব্য বা দামী গাড়ি আমদানি না করে বা বিদেশে ছুটি কাটানোর জন্য অর্থ ব্যয় না করে। এলিট গোষ্ঠীকে সেক্ষেত্রে তাদের বিলাস, ভোগ ও স্বার্থরক্ষা ত্যাগ করে জাতির উন্নতির কাজে তাদের অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর সেই অর্থ তারা বিনিয়োগ করবে নিজেদের দেশে, বিদেশে নয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের এলিট গোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি।

চরমপন্থী নির্ভরতা তত্ত্ব অনুসারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় এমন কাজে প্রবৃত্ত হবে না, যা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। পরার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি প্রীতি ইত্যাদি আদর্শ হিসাবে খুব ভাল, কিন্তু তাদের বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন। তাই তাঁরা বৈপ্লবাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশবাসীকে সেই সব নেতার থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন, যারা তাদের প্রতারণা করেছে। তাঁরা উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অসাম্য দূর করার জন্য বৈপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংগঠনের কথা বলেন।

নির্ভরতা তত্ত্ব আধুনিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিরোধী। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রচলিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাই তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। এই তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের সমস্যাগুলি দূর করার জন্য মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলে এবং স্থায়িত্ব রক্ষার বদলে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। নয়া উদারনীতিবাদীরা প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের স্থায়িত্ব রক্ষাকে গুরুত্ব দেন এবং তাকেই সমাধান বলে মনে করেন। আর নির্ভরতার তাত্ত্বিকতা বলেন যে প্রচলিত ব্যবস্থাই সমস্যাসমূহের কারণ; তাই প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা তাঁরা বলেন

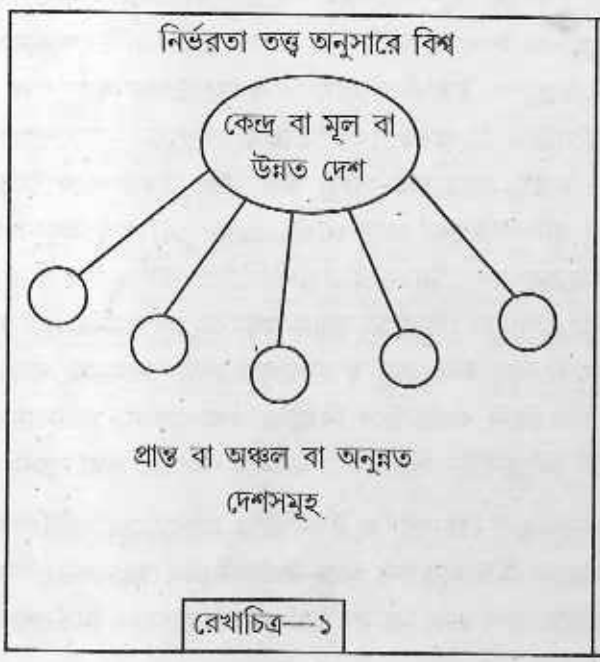

রেখাচিত্র—১

রেখাচিত্র—২

৪.৫ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব

৪.৫.১ ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বের বহুসংখ্যক দেশের অল্পোন্নতি এবং পশ্চিমের অল্পসংখ্যক দেশের সমৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে অসাম্য ঘটেছে, এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যে পশ্চিমের দেশগুলির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রদান করে রচিত হয় সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব। সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে সংরক্ষণ নীতি ও শিল্প আমদানির মাধ্যমে শিল্পায়নের পথে যেতে বলে, যা ১৯৫০-এর দশকে স্বল্পস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়, কিন্তু কিছু দিন পরেই ঘটে অর্থনৈতিক নিশ্চলতা, মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মহীনতা। এই সময় দেখা দেয় নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব, যার অন্যতম দুই প্রবক্তা হলেন পল বারান (Paul Baran) এবং আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank)

৪.৫.২ নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য

বারানের মতে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত অর্থনীতি—এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র। তিনি তৃতীয় বিশ্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁর মতে উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহ (Surplus cxtraction) ও মূলধন সঞ্চয় (Capital accumulation) এর চেষ্টা প্রয়োজন। উন্নয়ন নির্ভর করে ন্যূনতম জীবনযাত্রার থেকে বেশি উৎপাদন করতে পারার সামর্থ্যের ওপর বা উদ্বৃত্তের ওপর। সেই উদ্বৃত্তের একটা অংশ মূলধন সঞ্চয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে—যা উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি ক্রয় করবে। উদ্বৃত্তকে বিলাসদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদিতে ব্যবহার করলে উন্নয়ন আসবে না। বারান অনগ্রসর দেশগুলিতে দু'ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করেছেন—আগেকার উপনিবেশগুলিতে (Plantation agriculture) সবজি ক্ষেত্র চাষ-ব্যবস্থা ছিল—যার উদ্বৃত্ত অংশ যেত জমির মালিকদের কাছে। তাঁরা উন্নত দেশগুলির ধনী ব্যক্তিদের ভোগ (Consumption) ধারা অনুসরণ করতেন এবং জামাকাপড়, গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করতেন। ফলে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের কিছু থাকত না। আধুনিক কালে প্রান্তিক তৃতীয় বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দেখা যায়। তার উদ্বৃত্ত যায় প্রথমতঃ কোম্পানির শেয়ার মালিকদের হাতে মুনাফার আকারে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যয় করা হয় ভোগ্যপণ্যের ক্রয়ে। সামান্যই থাকে উন্নয়নের জন্য। এই ধারাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনি রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা বলেন। মার্টিনসেন এজন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পায়নকে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন।

ফ্রাঙ্কের মতে তৃতীয় বিশ্বের অল্পোন্নতির কারণ হল মহানগরী ও উপনগরীর ধারণা। সব বাণিজ্যিক পুঁজির লক্ষ্যস্থল হল মহানগরী আর মহানগরীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য আছে উপনগরীগুলি। মহানগরীগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়া উপনগরীগুলির স্বল্পোন্নতিকে জিইয়ে রাখে এবং মহানগরীগুলির ওপর তাদের নির্ভরশীল

করে তোলে। নির্ভরতার সমস্যার সমাধানের জন্য ফ্রাঙ্ক বলেন যে তৃতীয় বিশ্বের উচিত কার্যকরভাবে বিশ্ববাজার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, যাতে একটি দেশ নিজের বিকাশের সুযোগ পায়, তা দেখা। ফ্রাঙ্ক তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বাইরের কারণসমূহকে—উপনিবেশবাদ ও তার ইতিহাসকে; তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি, বিনিয়োগের অভাব ইত্যাদিকে নয়—যেগুলি নয়া উদারনীতিবাদের আধুনিকীকরণ প্রবক্তারা বলেছিলেন।

মহানগরী-উপনগরী ধারণার বদলে আমির আমিন কেন্দ্র ও প্রান্তিক ধারণাকে বেশি ব্যবহার করেন। কেন্দ্র হল স্বনির্ভর স্বকেন্দ্রিক কাঠামোযুক্ত উন্নত অর্থনীতি আর প্রান্তিক হল অনুন্নত দেশগুলির নির্ভরশীল কাঠামোযুক্ত অর্থনীতি। অনেক প্রান্তিক অর্থনীতিতে দেখা যায় অত্যুন্নত রপ্তানি ক্ষেত্র, যেখানে কৃষকরা নিজেদের জন্য উৎপাদন করে আঞ্চলিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং বদলে বিলাসদ্রব্য ও বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসে। এই অত্যুন্নত রপ্তানি ক্ষেত্র ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রান্তিক অধীনতার সঙ্গে আছে কেন্দ্র ও প্রান্তিক অর্থনীতিগুলির মধ্যে পণ্যের অসম বিনিময় সমস্যা। কেন্দ্র বা প্রান্ত—কোথায় তারা কাজ করে তার ভিত্তিতে তাদের মজুরি স্থির করা হয়। প্রান্তিক দেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি ও প্রান্তিক দেশে আমদানি করা পণ্যের অসম বিনিময়ের ফলে প্রান্তিক দেশগুলিতে দেখা দেয় কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা। তিনি সুপারিশ করেন সক্রিয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দ্বারা দেশীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্তি।

ভেরনেগো (Vernego)-র মতে নির্ভরতার সম্পর্ক প্রযুক্তিগত সূক্ষতার ওপর নির্ভর করে না, যা সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্বের বক্তব্য ছিল। বরং তা নির্ভর করে কেন্দ্র ও প্রান্তিক দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তির ওপর—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল প্রান্তিক দেশগুলির নিজেদের মুদ্রায় (Currency) ঋণগ্রহণের সুযোগ না থাকা। তাঁর মতে, আমেরিকার আধিপত্যের কারণ হল অর্থবাজারে তার গুরুত্ব—আন্তর্জাতিক মজুত তহবিল হিসাবে আমেরিকান ডলারের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ।

ফার্নান্ডো হেনরিক কারডোসো (Fernando Henriue Cardoso)-র নির্ভরতা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) প্রান্তিক দেশগুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থ ও প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

(ii) এর ফলে প্রান্তিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে এবং প্রান্তিক দেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে অসম অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্ট হয়েছে।

(iii) এই পথে প্রান্তিক দেশগুলির স্বনির্ভর উন্নতি সম্ভব নয়।

(iv) এই পথ বিশেষ ধরনের শ্রেণীসম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।

(v) এই পথ রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে; রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধন—উভয় দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি মনে করেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী বলে গণ্য করা যায় না। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধ আছে। সেগুলির যথাযথ বিবেচনা প্রয়োজন।

৪.৫.৩ কিউবার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত

নির্ভরতা সংক্রান্ত তত্ত্বগুলির প্রথাগত ধারণাসমূহ কিউবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। কিউবা সোভিয়েত জোটের দিকে ঝুঁকে পড়ে কমেকন (COMECON)-এর সদস্য হয়। সে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমাগত আখ রপ্তানি করে এবং সেখান থেকে শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি, পেট্রল, কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে। এই প্রচেষ্টা ছিল নয়া উদারনীতিবাদের আধুনিকীকরণ ধারা। আখের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে বাজারের থেকে ৫.৪ গুণ বেশি দাম দিত। ফলে কিউবার বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটে—শিক্ষা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। কিন্তু এই উন্নয়নের জন্য তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আকস্মিক ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটায় কিউবার বাণিজ্য, আমদানি ও রপ্তানি কমে যায়। এই সময় কিউবা নিজস্ব পথে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবুজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায়, যা এখন বিকল্প মডেল নামে পরিচিত। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল: জৈব কৃষির বিকাশ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বড় খামারের বদলে ছোট ছোট কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা, নগরভিত্তিক কৃষির প্রচলন ইত্যাদি।

বলা হয় যে ছোট দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে না, আমদানির মাধ্যমে অভাব পূর্ণ করতে হবে, কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়া খাদ্য উৎপাদন বাড়বে না, কিন্তু কিউবা আমদানির পথে না গিয়ে নিজেরাই নিজেদের খাদ্যসংকট দূর করেছে, ছোট ছোট কৃষকদের নেতৃত্বে, বড় বাণিজ্যিক বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার পরিকল্পনাধীনে নয়। বলা হয় যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া খাদ্যাভার দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু কিউবা তার স্থানীয় উৎপাদনের মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলেছে। কিউবা প্রমাণ করেছে যে নিজস্ব মৌলিক ও সৃজনশীল পথে নির্ভরতার কবল ছেড়ে বেড়িয়ে আসা যায়।

সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব ও নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের মিল		সনাতনী নির্ভরতা তত্ত্ব ও নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্বের অমিল		
গবেষণার বিষয়	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন		সনাতনী নির্ভরতাতত্ত্ব	নব্য মার্কসবাদী নির্ভরতাতত্ত্ব
বিশ্লেষণের একক	জাতীয়	পদ্ধতি	(i) বিমূর্তকরণ, (ii) নির্ভরতার সাধারণ তত্ত্ব	(i) ঐতিহাসিক-কাঠামোগত (ii) নির্ভরতার নির্দিষ্ট রূপ
মূল বক্তব্য	(i) কেন্দ্রের ওপর প্রান্তের নির্ভরতা। (ii) প্রান্ত এককভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে সমর্থ নয়। (iii) উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির গুরুত্ব। (iv) বিদেশী মূলধন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কারণ তা প্রযুক্তির চালান ঘটাতে পারে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়।	নির্ভরতার কারণ	(i) বাহিরের শক্তি (ii) অসম বিনিময় (iii) উপনিবেশবাদ (iv) ধনতন্ত্র	(i) আভ্যন্তরীণ শক্তি (ii) শ্রেণী সংঘাত (iii) রাষ্ট্র
		প্রকৃতি	প্রধানত অর্থনৈতিক	মূলতঃ রাজনৈতিক-সামাজিক
গবেষণাগত সিদ্ধান্ত	নির্ভরতা উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর	নির্ভরতা ও উন্নয়নের সম্পর্ক	পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র	সহাবস্থান সম্ভব

৪.৬ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব

৪.৬.১ বিশ্বব্যবস্থার ধারণা

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব হল বিশ্ব ইতিহাস ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সমষ্টিগত স্তরের একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা জাতীয় রাষ্ট্রের বদলে বিশ্ব-ব্যবস্থাকে সামাজিক বিশ্লেষণের মুখ্য একক বলে গণ্য করে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ব কিছু কেন্দ্র (Core) এলাকা বা উন্নত এলাকা, আধা-প্রান্ত (Semi-peripheri) এলাকা এবং প্রান্ত (Periphery) এলাকার বিভক্ত। কেন্দ্র এলাকাগুলি উচ্চস্তরের মানবিক দক্ষতা, মূলধনভিত্তিক উৎপাদন এবং যন্ত্রপাতি ও শিল্পকারখানাকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে মানবিক দক্ষতার অভাব, শ্রমভিত্তিক উৎপাদন ও কৃষিনির্ভরতা বেশি দেখা যায়—দ্বিতীয় ক্ষেত্রগুলি থেকে তৃতীয় ক্ষেত্রগুলিতে এগুলি অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এই বিশ্বব্যবস্থায় কেন্দ্র এলাকাগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ব্যবস্থাটিকে কিছুটা গতিশীল বলা যায়, কারণ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যানবাহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ইত্যাদির ফলে যে কোন সময়ে যে কোন রাষ্ট্র তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলতে পারে, আবার নতুনভাবে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও করতে পারে। বিশ্বব্যবস্থার প্রাধান্য নেদারল্যান্ড থেকে যুক্তরাজ্য এবং এখন আমেরিকার কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা হল সমগ্র বিশ্বকে একটি অখণ্ড ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা। বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন, সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে বিশ্ব-ব্যবস্থা গঠিত হয়। যে কোন ব্যবস্থার কতকগুলি অংশ থাকে, যারা পারস্পরিক নির্ভরতার সূত্রে আবদ্ধ থাকে। বিশ্ব-ব্যবস্থা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত হলেও তাদের মধ্যে এক যোগসূত্র আছে—তা হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্তর্গত সব স্বাধীন রাষ্ট্রই কোন-না কোনভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্বারা আবদ্ধ। এই নির্ভরশীলতাকে তারা খেয়ালখুশীমত পরিচালিত করতে পারে না। একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এলাকাকেও ছোট প্রান্ত বা আধাপ্রান্ত এলাকার ওপর নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরশীলতা হল বিশ্ব-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যাকে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্রই চলতে পারে না।

বিশ্ব-ব্যবস্থা একথা বলে না যে তার অন্তর্ভুক্ত সব একক বা জাতীয় রাষ্ট্রকে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে, বরং বলে যে প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ স্বাতন্ত্র্য ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখে বিশ্বব্যবস্থার অন্যান্য এককগুলির সঙ্গে লেনদেন ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করবে। বিভিন্ন এককের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ থাকতে পারে এবং বাস্তবক্ষেত্রে আছেও, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বব্যবস্থার ধারণাটির ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। গত কয়েক দশকে যানবাহন ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব সাফল্য, সন্ত্রাসবাদের আশংকা ইত্যাদির ফলে ঐক্যবদ্ধ বা বিশ্ব-ব্যবস্থার ধারণাকে কোন রাষ্ট্রই অস্বীকার করতে পারে। বিশ্ব-ব্যবস্থার ধারণাটি বাস্তববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪.৬.২ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের উদ্ভব

১৯৭০ সালে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (Imanuel Wallerstein)-এর হাতে বিশ্ব-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ বিকাশ লাভ করে। ওয়ালারস্টাইনের মতে, দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে সামন্ততন্ত্র ছিল। পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের সংকট থেকে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্র দেখা দেয়।

ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পর ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়; বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব করে এবং দক্ষ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ব্যবসাপথ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বিশ্ব-অর্থনীতির ওপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ২ওয়ালারস্টাইনের মতে এর আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত যোগাযোগের ভিত্তিতে এত বৃহদাকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় নি। আগে যে ভূখণ্ডগতভাবে বড় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল তা ছিল একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের আধিপত্য। ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে বিশ্ব-অর্থনীতি একটি রাষ্ট্রের সীমার বাইরে প্রসারিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত, তাদের শ্রমিকদের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের ধরন নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রথমে নিজেদের দেশে উন্নয়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয় এবং তারপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির অর্থনীতি, বিকাশ, উন্নয়ন ইত্যাদিকে নির্দেশিত করতে থাকে। ফলে বিশ্বব্যাপী অসম উন্নয়ন সৃষ্টি হয়। উন্নত দেশগুলি মূলধন-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের কাছে অন্যান্য এলাকাগুলি শ্রম ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে থাকে। ফলে অসম উন্নয়ন আরও জোরদার হয়।

ইউরোপের উত্থানের প্রথম দিকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ছিল কেন্দ্র অঞ্চল, মেডিটেরানিয়ান ইউরোপ ছিল আধা-প্রান্ত এলাকা এবং পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়া ছিল প্রান্ত এলাকা। ১৪৫০ সালের কাছাকাছি স্পেন ও পর্তুগাল পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা সাগর পেরিয়ে অনেক উপনিবেশ সৃষ্টি করে। তবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য তারা বেশিদিন রক্ষা করতে পারেনি।

সপ্তদশ শতকে নেদারল্যান্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা জাহাজ নির্মাণ শিল্প, রপ্তানি বৃদ্ধি, বাইরে থেকে মূলধনের খোঁজ এবং লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। নেদারল্যান্ডের স্থলে ঊনবিংশ শতকে ব্রিটেনের আধিপত্য দেখা দেয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে যে তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। পরে ব্রিটেনের স্থান নেয় জার্মানি, তারপর ইটালী এবং জাপান।

১৯০০ সাল নাগাদ বিশ্ব-ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ প্রান্ত এলাকাগুলি কেন্দ্র এলাকাগুলির অধীনস্থ হয়ে পড়ে। অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিও একই ভাবে কেন্দ্র এলাকাগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান ও ইটালীর ধ্বংস ঘটে এবং আমেরিকা বিশ্ব-অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বিংশ শতকের আগে ইউরোপের কিছু দেশ ও আমেরিকা এবং অল্পদিন এশীয় দেশ জাপান শিল্পোন্নত কেন্দ্র এলাকায় অবস্থান করেছে। বিশ্বব্যবস্থার আধা-প্রান্ত দেশ হিসাবে পরিগণিত হয় সেই দেশগুলি, যারা বহুদিন ধরে স্বাধীন, কিন্তু কেন্দ্র এলাকার প্রভাবের সমকক্ষ নয়। আগে যেসব দেশ কেন্দ্র এলাকাগুলির উপনিবেশ ছিল, তারা অনেকে পরিচিত হয়েছে প্রান্ত এলাকা হিসাবে।

৪.৬.৩ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের বক্তব্য

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বটি হল নয়াউদারনীতিবাদী আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া বা সমালোচনা। ওয়ালারস্টাইন বিশেষভাবে নয়া উদারনীতিবাদী আধুনিকীকরণ তত্ত্বের তিনটি প্রতিপাদ্যের সমালোচনা করেন—

(ক) বিশ্লেষণের একক হিসাবে জাতীয় রাষ্ট্রের ওপর গুরুত্ব;

(খ) সমস্ত দেশগুলির জন্য উন্নয়নের মাত্র একটি পথই আছে;

(গ) অতিজাতীয় (Transnational) কাঠামোসমূহের অস্বীকৃতি, অথচ সেগুলি জাতীয় ও স্থানীয় স্তরের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বটি প্রধানত পূর্ববর্তী তিনটি চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছে—

(ক) অ্যানালেস স্কুল (Annales School) এবং বিশেষভাবে এর তাত্ত্বিক ফার্নান্ড ব্রাউডেল (Fernand Braudel) ওয়ালারস্টাইনকে দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি এবং বিশ্লেষণের একক হিসাবে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অঞ্চলসমূহের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

(খ) মার্কসবাদ সামাজিক দ্বন্দ্বের গুরুত্ব, মূলধন সঞ্চয় প্রক্রিয়া, প্রতিযোগিতামূলক শ্রেণীসংগ্রাম, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রূপের সাময়িক প্রকৃতি এবং দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে।

(গ) নির্ভরতা তত্ত্বের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নব্য মার্কসবাদী ব্যাখ্যা তাঁকে প্রভাবিত করে।

১৯৭০ থেকে পরিবর্তনের যুগ শুরু হয়, যা তাঁর মতে, ভবিষ্যতের বিশ্ব-ব্যবস্থার চেহারা নির্ণয় করবে।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের অন্যান্য কয়েকজন চিন্তাবিদ হলেন সমীর আমিন (Samir Amin), জিয়োভানি আরিঘি (Giovanni Arrighi), বেভারলি সিলভার (Beverly Silver), ডেল টমি (Dale Tomich), জেসন ডব্লিউ. ম্যুর (Jason W. Moore) প্রমুখ।

ওয়ালারস্টাইনের মতে একটি বিশ্ব-ব্যবস্থার অর্থ হল একটি একক, যার একটি শ্রমবিভাজন আছে এবং বহু সংখ্যক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আছে। এই এককের নিজস্ব সীমারেখা, কাঠামো, সদস্যগোষ্ঠী, বৈধতা, নিয়ম এবং পরস্পর-সংযুক্তি আছে। ব্যবস্থাটির মধ্যে আছে বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক শক্তিসমূহের প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি, যেগুলি একদিকে ব্যবস্থাটিকে সংযুক্ত রাখে এবং অন্যদিকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। ব্যবস্থাটির একটি জৈবিক বৈশিষ্ট্য আছে। তাই ব্যবস্থাটির জীবনকালে তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আবার স্থায়িত্ব লাভ করে। ব্যবস্থাটির আভ্যন্তরীণ কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যবস্থাটির বিভিন্ন কাঠামোগুলি বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী বা দুর্বল হতে পারে।

বিশ্ব-ব্যবস্থা দু'ধরনের হতে পারে—বিশ্ব-সাম্রাজ্য এবং বিশ্ব-অর্থনীতি। বিশ্ব-সাম্রাজ্য (রোমান সাম্রাজ্য) হল একটি বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, যার একটিমাত্র রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং এক ধরনের শ্রমবিভাজন আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আছে। বিশ্ব-অর্থনীতি হল এক ধরনের শ্রমবিভাজন, কিন্তু তা বহু রাজনৈতিক কেন্দ্র ও বহু সংস্কৃতিযুক্ত।

ওয়ালারস্টাইনের মতে বিশ্ব-ব্যবস্থা হল বিশ্ব-অর্থনীতির একটি ব্যবস্থা, যা প্রান্ত বা বিশ্বের অনুন্নত, দরিদ্র ও কাঁচামাল রপ্তানিকারী অংশ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য কেন্দ্র বা বিশ্বের উন্নত ও শিল্পোন্নত অংশগুলির কাছে পৌঁছে দেয়।

মানবজাতির ইতিহাসে ওয়ালারস্টাইন তিন ধরনের ব্যবস্থার কথা বলেন—ক্ষুদ্র ব্যবস্থা (উদাহরণ উপজাতি সমাজ) এবং দু'ধরনের বিশ্ব-ব্যবস্থা—প্রথমটি রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ (এক-রাষ্ট্রিক বিশ্ব-সাম্রাজ্য) এবং দ্বিতীয়টি সেভাবে ঐক্যবদ্ধ নয় (বহু-রাষ্ট্রিক বিশ্ব-অর্থনীতি)। আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থা হল শেষোক্ত ধরনের। আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে ১৪৫০-১৫৫০ থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং ১৯০০ সালের মধ্যে ভৌগোলিকভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তার প্রসার থেকে। ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীন শ্রমিকদের ব্যবহার করে স্বাধীন উৎপাদকদের দ্বারা স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন, যেগুলি বাজারে ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হয়।

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্র হল বিশ্ব-অর্থনীতির অংশ, তাদের নিজ অর্থনীতি বলে কিছু নেই। বিশ্ব-ব্যবস্থা হল কেন্দ্র, আধা-প্রান্ত ও প্রান্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক শ্রমবিভাজন ব্যবস্থার প্রকাশ। কেন্দ্র এলাকাগুলি তার অন্তর্গত আধা-প্রান্ত ও প্রান্ত রাষ্ট্রগুলির সমর্থনসহ শ্রম-বিভাজনজনিত অধিকাংশ লাভজনক কাজকর্মের পূর্ণ অধিকার বা একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ করে।

নির্দিষ্ট দেশকে কেন্দ্র, আধা-প্রান্ত বা প্রান্ত এলাকাভুক্ত করার মানদণ্ড হিসাবে পিয়ানা (Piana) ২০০৪ সালে কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের ধারণাকে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে কেন্দ্র এলাকাগুলি গঠিত হয় স্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে, যারা অন্যদের ওপর আধিপত্য করে, কিন্তু নিজেরা অন্যের আধিপত্যাধীন নয়। আধা-প্রান্ত এলাকাগুলি সাধারণত কেন্দ্র এলাকার আধিপত্যাধীন, কিন্তু তারা অন্যদের (সাধারণত প্রান্ত অঞ্চলসমূহ) ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রান্ত হল সেই সব এলাকা যেগুলি অন্যের আধিপত্যাধীন।

অষ্টাদশ শতকে ও উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ধনতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় দেখা যায়—যেসব রাষ্ট্রে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল, সেগুলিতে পুঁজিবাদীরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি অর্জন করে এবং ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা সূচিত হয়। কিন্তু বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব অনুসারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে আগেই দেখা দিয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন লাভ করে বলে যে নয়াউদারনীতিবাদী বক্তব্য ছিল, তাকে এই তত্ত্ব তা অস্বীকার করে। বিশ্ব-ব্যবস্থাবাদীরা বিশ্ব স্তরবিন্যাস ব্যবস্থাকে কার্ল মার্কসের মত শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি বা উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা বা মালিকানা

না থাকা এবং মার্কস ওয়েবারের মত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মালিকানা ছাড়াও কার্যগত দক্ষতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর জোর দেয়। কেন্দ্র এলাকাগুলি বিশ্বের উৎপাদনের অধিকাংশ উপায়ের ওপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ভোগ করে এবং উৎপাদন সংক্রান্ত উচ্চ দক্ষতার কাজগুলি সম্পাদন করে। প্রান্ত এলাকাগুলি বিশ্বের উৎপাদনের খুব অল্পসংখ্যক উপায়ের ওপর মালিকানা ভোগ করে। উৎপাদন ক্ষেত্র তার নিজস্ব প্রান্ত এলাকাতে হলেও তার মালিকানা তার হাতে অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। তারা কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজগুলি করে। বিশ্ব-অর্থনীতির শ্রেণী অবস্থানের ফলে সম্পদের অসম বণ্টন হয়। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অধিকাংশ ভাগই কেন্দ্র এলাকাগুলি পায় আর প্রান্ত এলাকাগুলির ভাগে জোটে খুব সামান্য অংশ। তাছাড়াও তারা প্রান্ত এলাকাগুলি থেকে অল্প দামে কাঁচামাল, শ্রম ও প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে এবং তাদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের ওপর উচ্চ মূল্য দাবি করে।

ওয়ালারস্টাইনের মতে, আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অভিনব বৈশিষ্ট্য হল ধনতান্ত্রিক প্রকৃতি, বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব-অর্থনীতি, যা রাজনৈতিকভাবে একটি বিশ্ব-সাম্রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ নয়।

৪.৬.৪ বিশ্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্র, আধা-প্রান্ত, প্রান্ত এবং বাইরের এলাকার ধারণাসমূহ

বিশ্ব-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এলাকাগুলি হল—

(ক) অর্থনৈতিকভাবে এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশসমূহ;

(খ) সেই দেশসমূহ, যাদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুদৃঢ় সামরিক বাহিনী আছে,

(গ) সেইসব দেশসমূহ, যাদের যথেষ্ট করপ্রাপ্তি আছে, যার ফলে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদৃঢ় অর্থনীতি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ করতে পারে।

(ঘ) সেই দেশগুলি, যারা শিল্পোন্নত শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করে ও সেগুলি অন্য দেশে আমদানি করে;

(ঙ) তথ্য প্রযুক্তিগত, অর্থসংক্রান্ত এবং সেবা-সংক্রান্ত শিল্পের বিশেষীকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন দেশসমূহ।

(চ) যেসব দেশে শক্তিশালী বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী আছে সেই দেশগুলি;

(ছ) যে দেশগুলির প্রান্ত ও আধাপ্রান্ত এলাকাগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে সেগুলি; এবং

(জ) সেই দেশগুলি যারা বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।

আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার ইতিহাসে দেখা যায় যে কয়েকটি কেন্দ্র এলাকা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত থেকেছে বিশ্বের সম্পদ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি করায়ত্ত করার জন্য এবং প্রান্ত এলাকাগুলির ওপর

আধিপত্য বিস্তারের জন্য। মাঝে মাঝে অন্যদের ওপর আধিপত্যভুক্ত কেন্দ্র এলাকার পরিবর্তনও দেখা গেছে। ওয়ালারস্টাইনের মতে, একটি এলাকা যখন বেশ কিছুদিনের জন্য তিন ধরনের অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তখন সেই এলাকাটি কেন্দ্র এলাকায় রূপান্তরিত হয়।

সেই তিন ধরনের অর্থনৈতিক আধিপত্য হল—

(ক) উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আধিপত্য বা অন্য রাষ্ট্রগুলির থেকে কম খরচে বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন;

(খ) ব্যবসাক্ষেত্রে আধিপত্য বা অনুকূল ব্যবসার পরিবেশ যার ফলে অনেক বেশি দেশ তার পণ্য ক্রয় করে।

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য, যার ফলে আধিপত্যকারী দেশটি থেকে কম অর্থ বাইরে যায়, কিন্তু বেশি অর্থ ভেতরে আসে। আধিপত্যকারী দেশগুলির ব্যাঙ্কগুলি বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হল সামরিক আধিপত্য। তবে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় সামরিক বাহিনী দিয়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদাহরণ নেই।

বর্তমানে কেন্দ্র অঞ্চলগুলি হল পশ্চিম ইউরোপ (প্রধানতঃ ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বব্যবস্থার আধা-প্রান্ত এলাকাগুলি হল—

আধা-প্রান্ত এলাকাগুলি হল প্রান্ত ও কেন্দ্র এলাকাগুলির মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ। তারা শিল্পায়নের পথে যাত্রা করছে। তাদের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে উন্নত, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি কম। তারা কিছু পরিমাণে কেন্দ্রীয় এলাকাসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তবে তারা আবার প্রান্ত এলাকাগুলির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তারা কেন্দ্র ও প্রান্ত এলাকার মধ্যে বাফারের কাজ করে এবং বিশ্ব-ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আধা-প্রান্ত এলাকার সদস্যরা উন্নত প্রান্ত অঞ্চল বা পিছিয়ে পড়া কেন্দ্র অঞ্চল উভয় অঞ্চল থেকেই আসতে পারে। স্পেন ও পর্তুগাল হল আধা-প্রান্ত দুটি এলাকা, যারা কেন্দ্র এলাকা থেকে পিছিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকায় তাদের প্রভাব দেখা যায়। বিংশ শতকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ড আধা-প্রান্ত এলাকা হিসাবে বিবেচিত ছিল। এখন ভারতবর্ষ, ব্রাজিল ও সাউথ আফ্রিকা হল আধা-প্রান্ত এলাকাসমূহ।

বিশ্বব্যবস্থার প্রান্ত এলাকাগুলি হল—

(ক) যেগুলি অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত;

(খ) যেগুলি প্রধানতঃ দুর্বল সরকার দ্বারা চালিত,

(গ) যাদের কর সংগ্রহ ব্যবস্থা দুর্বল; ফলে তাদের পক্ষে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

(ঘ) যেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ এক ধরনের ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়—কেন্দ্র এলাকায় কাঁচামাল রপ্তানি;

(ঙ) যেখানে শিল্পের বিকাশ খুব কম;

(চ) যারা কেন্দ্র এলাকার বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির বিনিয়োগের লক্ষ্য। কেন্দ্র এলাকাগুলি তাদের শ্রম সস্তায় কিনে নেয় এবং তাদের দেশেই বেশি দামে নিজ দেশের শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করে।

(ছ) যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যা কম, কৃষক শ্রেণীর সংখ্যা বেশি।

(জ) যাদের জনসংখ্যা বেশি এবং যাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অশিক্ষিত।

(ঝ) যেখানে অল্প সংখ্যক লোক উচ্চশ্রেণীভুক্ত, তারা প্রায় সমস্ত জমির মালিক এবং তাদের সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির যোগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র। ফলে সামাজিক অসাম্য প্রকট।

(ঞ) যারা কেন্দ্র এলাকাগুলি এবং তাদের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি দ্বারা বিশেষভাবে শোষিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র এলাকা নিজ স্বার্থে এবং প্রান্ত দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক স্বার্থ এলাকাও লিস বিরোধী অর্থনৈতিক কর্মসূচী বা নীতি গ্রহণে প্রান্ত এলাকাগুলিকে বাধ্য করে। বস্তুতঃ এই দেশগুলিতে নিজেদের ব্যবহারের জন্য নয়, ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির স্বার্থে পণ্য উৎপাদন করা হয়। পূর্ব-ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রান্তিক এলাকাগুলিকে প্রান্ত এলাকা বলা যায়।

বাইরের এলাকা

ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার থেকে স্বাধীনভাবে যে সব দেশ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রেখেছিল তাদের বাইরের এলাকা বলে। ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন হল বাইরের এলাকার উদাহরণ।

৪.৬.৫ বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বের সমালোচনা

বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্বটি অর্থনীতির বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। অনেকে বলেন যে তত্ত্বটি সাধারণীকরণকে যথোপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে নি। মার্কসবাদীরা বলেন যে বিশ্ব-ব্যবস্থার তাত্ত্বিকরা শ্রেণীর ধারণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি। রাষ্ট্র ও ব্যবসার মধ্যে সীমারেখাকে তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। সমালোচকরা বিশ্ব-ব্যবস্থার বদলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই বিশ্লেষণের একক হিসাবে মনে করেন।

কিন্তু ওয়ালারস্টাইনের মূল অবস্থান হল যে ষোড়শ শতক থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়েছে তা হল একটি বিশ্ব-ব্যবস্থার উদাহরণ। এ কথাও ঠিক যে, বর্তমানে বিশ্ব-অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, কোন বিশ্ব-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও নেই। সমগ্র বিশ্বে একটিমাত্র বিশ্ব-অর্থনীতি আছে, যা আকারগত দিক থেকে ধনতান্ত্রিক।

প্রতিরূপ-১

নির্ভরতা তত্ত্ব ও বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের মিল		
গবেষণার বিষয়	বিশ্ব-ব্যবস্থার অসাম্য অনুসন্ধান	(বিশ্ব-ব্যবস্থাতত্ত্ব)
	উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে অসাম্যের কারণ নির্ণয়	(নির্ভরতাতত্ত্ব)
ধনতন্ত্র বিকাশের ফল	(i) বিশ্ব ব্যবস্থায় অসাম্য বৃদ্ধি	(বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব)
	(ii) তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নত বিশ্বের মধ্যে অসাম্য বৃদ্ধি	(নির্ভরতা তত্ত্ব)
	(iii) বিশ্ব বাজার সৃষ্টি	(উভয়ে)
	(iv) সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব	(উভয়ে)

প্রতিরূপ-২

নির্ভরতাতত্ত্ব ও বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের অমিল		
	নির্ভরতাতত্ত্ব	বিশ্বব্যবস্থাতত্ত্ব
বিশ্লেষণের একক	জাতিরাষ্ট্র	বিশ্ব ব্যবস্থা
বিশ্লেষণের পদ্ধতি	কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক দিক থেকে জাতিরাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ	বিশ্বব্যবস্থার ঐতিহাসিক চালিকাশক্তির সন্ধান
কাঠামোগত অবস্থান	কেন্দ্র-প্রান্ত (দ্বিমাত্রাযুক্ত)	কেন্দ্র-আধা-প্রান্ত-প্রান্ত (ত্রিমাত্রাযুক্ত)
গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু	প্রান্ত	প্রান্ত, আধা-প্রান্ত ও কেন্দ্র এবং বিশ্ব অর্থনীতি
বক্তব্য	(i) নির্ভরতা তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর (ii) কেন্দ্র এলাকা প্রান্ত এলাকাকে শোষণ করে	(i) বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়ন বা অবনয়ন (ii) কেন্দ্র এলাকা সমস্ত ধনতান্ত্রিক এলাকার শ্রমিকদের শোষণ করে।

৪.৭ সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণার আবির্ভাব ঘটে ১৯৫০ সালের কাছাকাছি, যখন আমেরিকার একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ সদ্যস্বাধীন আফ্রিকা ও এশিয়া এবং দরিদ্র ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক এশিয়া এবং দরিদ্র ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই সময়। রাজনৈতিক উন্নয়নের অর্থ সম্পর্কে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা অ্যালমন্ডের মতে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মনিরপেক্ষকরণকে। কার্যকারিতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যকে কোলম্যান রাজনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। ড্যানিয়েল লারনার আবার রাজনৈতিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের সমার্থক বলে গণ্য করেন। বস্তুত, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ—উভয় ধারণাই প্রাক-আধুনিক থেকে আধুনিক সমাজে রূপান্তকরণ এবং এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত জাতি রাষ্ট্রে উন্নত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মত শহরায়ন, শিল্পায়ন, গণতন্ত্র, জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, শ্রমবিভাজন, যুক্তিবাদ ইত্যাদির প্রবর্তনকে বোঝায়।

রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল—

(i) নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব—উদারনীতিবাদ শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাবেকি বা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, অবাধ বাণিজ্য, বেসরকারিকরণ এবং গণতন্ত্র, গণঅংশগ্রহণ, স্বাধীনতা ও অধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে বোঝাত। পরবর্তীকালে দেখা দেয় সামাজিক উদারনীতিবাদ, যা শক্তিশালী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা বলে। আরও পরে দেখা দেয় নয়াউদারনীতিবাদ, যা সাবেকি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের ধারণাসমূহের পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দেয়।

নয়া উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ হায়েক ও মিল্টন ফিডম্যান মনে করেন যে সমস্ত সমাজকেই রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের একই ধরণের স্তর অতিক্রম করতে হয়। আজকের উন্নয়নশীল বা অনুন্নত সমাজগুলি হল আজকের উন্নত সমাজগুলির অতীতের কোন এক সময়ের প্রতিরূপ। রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য তাদেরকে গণতন্ত্র, পশ্চিমায়ন, শিল্পায়ন, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্তি ইত্যাদি পশ্চিমী পথ অনুসরণ করতে হবে।

(ii) নির্ভরতা তত্ত্ব—নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয় নির্ভরতা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত সমাজও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো আছে। এবং সর্বত্র উন্নয়নের রাস্তাও একরকম নয়।

নির্ভরতা তত্ত্ব মনে করে যে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের জন্য উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিই দায়ী। বিশ্ব অর্থনীতিতে তারা দুর্বল অংশ হিসাবে থেকে গেছে, কারণ—

(ক) তারা উন্নত দেশগলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তায় শ্রম ইত্যাদির যোগান দেয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত বাজার হিসাবে পরিগণিত হয়।

(খ) উন্নত পশ্চিমী দেশগুলি তাদের ওপর দরিদ্র ও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির নির্ভরতাকে নানা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বজায় রাখে। নির্ভরতা তত্ত্ব এবং মার্কসবাদী নির্ভরতা তত্ত্ব।

(iii) বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব—এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের একক হিসাবে জাতি-রাষ্ট্রের বদলে বিশ্বব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিশ্বব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র, মধ্যে-প্রান্ত এবং বাইরের এলাকা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে। এই তত্ত্ব মনে করে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে কেন্দ্র অঞ্চলগুলি অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকদের শোষণ করে এবং বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল প্রান্ত বা আধাপ্রান্ত এলাকা থেকে উন্নত বা কেন্দ্র অঞ্চলে সম্পদের প্রবাহকে সুনিশ্চিত করে, তিনটি তত্ত্বেরই নানা সমালোচনা দেখা যায়।

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

১. নয়া উদারনীতিবাদীগণ কিভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেন তা আলোচনা করুন।

২. নয়া উদারনীতিবাদী উন্নয়ন তত্ত্বের সমালোচনা লিখুন।

৩. লাতিন আমেরিকার সাবেকী নির্ভরতা তত্ত্বের সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী :

১. নয়া মার্কসবাদীদের নির্ভরতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. নির্ভরতা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করন।

৪. বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বের উৎস ও বিকাশ আলোচনা করুন।

৫. বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্র, আধাপ্রান্ত এবং বাইরের এলাকা বিষয়ে ধারণা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. উন্নয়ন বলতে কি বোঝেন?

২. আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা দিন।

৩. নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের নাম লিখুন।

৪. "নির্ভরতা তত্ত্বের নিরিখে কিউবা ব্যতিক্রম"—ব্যাখ্যা করুন।

৫. দুই ধরণের নির্ভরতা তত্ত্বের তুলনা করুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী :

1. M.P. Cowen and R.W., Shenton, Doctrines of Development, Routledge, 1996.
2. Walt whiteman Rostow, the Srages of Economic growth, the Economic History Review, 12 : 1–16, 1959.
3. Peter W. Preston, Rethinking Developments, Routledge and Kegan Paul Books Ltd., 1988
4. Amin, S, Unequal Development : an Essay on the Social Formations of Peripheral Capiralism, New York, Monthly Review Press.
5. Bornschier V., Western Society is Transition, Transaction publishers, 1956, Ng, 1996.
6. Cardoso, F.H and Faletto E, Dependency and Development is Latin America, Univo of California Press, 1979.
7. Stiglity Joseph, Globalisation and its Discontents, W.W. Norton and Company, 2002.
8. David M. Kotz, The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism, Hervard Union Press, 2015.
9. Noam Chomsky, Profit over People—Neoliberalisms and Global Order, Seven stories Press, New York, 1999.
10. Thomas Friedman, The World is Flat : The Globalized World in the 21st Century, Penguin, Londan.

পর্যায় - ২

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতি : তুলনামূলক পর্যালোচনা

একক - ১ : ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনে জাতীয়তাবাদ ও জাতি নির্মাণ

একক - ২ : রাষ্ট্র ও পৌর সমাজ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে

একক - ৩ : তুলনামূলক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন

একক - ৪ : পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা

একক ১ □ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনে জাতীয়তাবাদ ও জাতি নির্মাণ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ জাতি-জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য
১.৪ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার বিকাশ
১.৫ চীনের জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণার পর্যালোচনা
১.৬ সারসংক্ষেপ
১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী
১.৮ গ্রন্থসূচি

১.১ উদ্দেশ্য

বিষয়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হবেন।

- জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার তাত্ত্বিক দিকটি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে পরিষ্কার হবে।
- আলোচনার ভেতর থেকে শিক্ষার্থী পশ্চিমি দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি ও জাতীয়তাবাদ চিন্তাটিকে বুঝতে পারবেন।
- বিষয়টি আমাদের চীন, ব্রিটেন ও ফরাসী জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক আলোচনার সম্পর্কে সচেতন করবে।
- জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার ধারণা বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞাটি এই বিষয় থেকে লাভ করবে।
- তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় জাগরণ ও জাতিগঠনের আঙ্গিককে আলোচনার মধ্য থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে ধারণা গঠন করতে পারবে।

১.২ ভূমিকা

আধুনিক যুগে 'জাতি' (Nation) সম্ভবত মানুষের প্রধান পরিচিতি (Identity)। আধুনিক বিশ্বের একক হল জাতি রাষ্ট্র (Nation-State)। জাতি তার ভাষা পায়, নিজেকে প্রকাশিত করে রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সমস্যা হল, আধুনিক বিশ্বে এত গুরুত্বপূর্ণ যে 'জাতি' তার কিন্তু কোনো স্থান নেই আধুনিকতার সামাজিক তত্ত্বে বা দর্শনে। আধুনিকতা (Modernity) ধরে নেয়, ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ আজ মানুষের অস্তিত্বের প্রায় বিশ্বজনীন পরিচিতি। তা-সত্ত্বেও আধুনিককালের কোনও নির্দিষ্ট চিন্তাবিদ লক থেকে মার্কস এমন কী মিশেল ফুকো পর্যন্ত কেউই জাতীয়তাবাদের পক্ষে তত্ত্বগত অবস্থান গ্রহণ করেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম ইউরোপীয় যুক্তিবিদ ও ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া প্রসূত ছিল রোমান্টিক চিন্তাবিদ, যেমন হার্ডার এবং ফিকটে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা শ্রেণী অধিকারের পক্ষে জোরালো দার্শনিক সাওয়ালের অভাব নেই। অবশ্য জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ভাবনার অভাব থাকলেও এর গড়ে ওঠার সমাজতাত্ত্বিক, কার্যগত বা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়নি এমনটা নয়।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে আমরা প্রথমেই জাতি ও জাতীয়তা বোধের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব—পরবর্তী পর্বে আমরা অগ্রসর হব গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন এই তিনটি দেশের জাতি ও জাতীয়তা বাদ সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনায়। কারণ এই আলোচনার ধারাই আমরা একনজরে পশ্চিম ও পূর্বের জাতি-জাতীয়তাবাদ ধারণার বিকাশের ধারাকে আংশিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা চালাবো।

১.৩ জাতি ও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনের জাতি-জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে সংক্ষেপে আমরা সামগ্রিক ভাবে দুটি বিষয়ের উদ্ভবের ইতিহাসটাকে এক নজরে দেখার চেষ্টা চালাই। জাতি কাকে বলে? জাতি গঠনের ভিত্তি কী? এসব সকল প্রশ্নের আলোচনা করেছেন অনেকে। তবে নিঃসংশয় জবাব অবশ্য মেলেনি। জাতি সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন মিরোস্লাভ রচ (Miroslav Hroch)। রচ রচিত দুটি উপাদানের বর্ণনা খানিকটা সাদামাটা ভাবে বর্ণনা দিলেও তার বর্ণনায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল প্রথমতঃ জাতি হল একটি বড় সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group)। কয়েকটি বস্তুগত সম্পর্ক এবং যৌথ চেতনায় এদের প্রতিফলন গোষ্ঠীবদ্ধতার উৎস। এই সম্পর্কগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত। এদের মধ্যে তিনটি বন্ধন বিশেষ জরুরী।

১। একটা অতীতের স্মৃতি যে অতীতের তার সবাই ভাগীদার।

২। ভাষাগত বা সামগ্রিক গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন যার ফলে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সংযোগ অনেক বেশি নিয়মিত এবং সহজ গোষ্ঠী-বহির্ভূতদের সাথে সম্পর্কের তুলনায়।

৩। এমন একটা বোধ যে গোষ্ঠীর সদস্যরা একটি নাগরিক সমাজের (Civil Society) সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশ। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জাতির ধারণাটির পেছনে ভৌগোলিক সীমানা (Geographical Location) ও মুদ্রণের প্রভাব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

আর জাতি ধারণাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত হল জাতীয়তাবাদের ধারণা। এর দ্বারা প্রতিটি জাতীর অন্তর্গত জনগণ নিজ-ভৌগোলিক সীমানার পবিত্রতা রক্ষার্থে সর্ব স্বার্থ ত্যাগ করতে পিছপা হয়না। এ হল জাতির সদস্যদের মধ্যে এক আত্মিক টান যা জাতিকে একটি মালার মতো করে বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। বিংশ শতকের অন্যতম জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন জাতি হল একটা পরিবার, যেখানে সদস্যদের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ববোধ কারণ, তারা সকলেই এই কল্পিত মায়ের সন্তান। তবে একথা সত্যি যে ইউরোপের জাতীয়তাবাদের ধারণার বিবর্তন বহু পূর্বে সূচিত হয়েছে, ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) মধ্য দিয়ে হলেও পরবর্তীকালে ১৮১৫-১৯৪৮ সালকে ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশে কুলগত বা ভাষাগত ঐক্য-বাসনার যুগ বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে USSR (Union of Soviet Socialist Republics)-এর পরবর্তীকালে পূর্ব-ইউরোপ ও মধ্য-ইউরোপের জাতীয়তাবাদের নতুন জোয়ার আসে। তবে পরবর্তীকালে আধুনিকতার ছোঁয়া এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদের রূপ নিয়েছে।

তবে তৃতীয় বিশ্ব বা এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ উপনিবেশ শাসিত জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা পশ্চিমি তাত্ত্বিক প্রভাবের দ্বারা চালিত হলেও তার প্রেক্ষাপটটি ছিল মোটামুটি একই। অর্থাৎ স্বাধীনতা এই লক্ষ্যপূরণের স্বার্থেই এই দেশগুলির জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রধান কারণ।

১.৪ জাতি ও জাতিরাষ্ট্র ফ্রান্স ও ব্রিটেন

জাতিগঠন ও জাতীয়তাবাদী ধারণা বিকাশ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাই এই আলোচনা অপরিহার্য। জাতীয়তাবাদী আলোচনার প্রতি ঝোঁক পশ্চিমি দেশগুলিতে বিশেষত অষ্টাদশ শতকেই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এই আলোচনার ইতিহাস তিন শতাব্দীর। তবে এই ধারণার অস্পষ্ট পরিচয় আগেও পাওয়া গেছে। আবার ম্যুর (Muir) প্রমুখ অনেকের অভিমত হল যে, জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ইংলন্ডে, ফ্রান্সকে অধিকার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শক্তির উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সেও পঞ্চদশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ধর্মীয় আধিপত্য ও অন্যায় অবিচারের থেকে অব্যহতি লাভের আশায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হয়। স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারাই এই আন্দোলনের পেছনে বর্তমান ছিল। রোমের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ধর্মীয় সংঘর্ষ ও ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই দুটি ঘটনা ব্রিটিশদের মনে স্বতন্ত্র জাতি (Nation) সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডের ইতিহাস বহু দিনের পুরানো। কারণ, পূর্বের ইংল্যান্ড ও বর্তমান ইংল্যান্ডের মধ্যে কোনও রূপ মিল আমরা পাব না। কারণ ২০০০ বছর আগে বর্তমান ইংল্যান্ড প্রায় ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল পরবর্তীকালে ১৫৪১ থেকে ১৬৯১ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটিকে কমিয়ে ২-এ আনা হয় (Kingdom of England) ও (Kingdom of Scotland) এই ভাবে প্রাথমিক পর্ব থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ব্রিটেন বরাবরই রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত ছিল তবে নানা বিপ্লব আন্দোলন (গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮) পিউ রিটান বিপ্লব (১৬৪১-৪৮) ইত্যাদির দ্বারা জাতি ও জাতীয়তাবাদী ধারণার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন

করে। এর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান আলোকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ ও সর্বোপরি পুঁজিবাদী চিন্তাচেতনার প্রভাবে ব্রিটেনের জাতীয়তাবাদী চেতনা অনেক অংশেই বর্তমান অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তবে একথাও ঠিক ব্রিটেনের জাতি গঠনও জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনাকে সমগ্র ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে না বিচার করাটা অন্যায় হবে। কারণ ইউরোপের বিবর্তন ১৬৪৮ ওয়েস্টফলিয়ার চুক্তি জার্মান উপজাতির সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব ও সর্বোপরি ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ইতালির পুনঃজাগরণ সবকিছুকেই সামনে রেখে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

ফরাসী দার্শনিক বোঁদা (Bodin) জাতি রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা দান করেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বৈধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তা ছাড়া তিনি নাগরিক শৃঙ্খলা ও নাগরিক অনুগত্যের নীতি নিয়েও আলোচনা করেন। এই সকল বিষয়ে বোঁদার বক্তব্য জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মোষ ঘটায়। তবে (১৭৮৯) সালের ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে তথা ইউরোপের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি উপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সকল সংগ্রাম। রাজকীয় একচ্ছত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় ফ্রান্সের ফরাসী জনসাধারণের স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ফরাসী জাতিকে একটি অখণ্ড সত্তারূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। জ্যাকোবিনবাদের স্বাদেশিকতার ধ্যান-ধারণা জাতীয়তাবাদী ধারণারূপে বিবেচিত হয়। বার্নসের মতানুসারে আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তা আসলে ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক দার্শনিকগণের অবদানও এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিশেষত রোমান্টিক বিপ্লবের (Romantic Revolution)-এর অন্যতম দার্শনিক রুশো (Rousseau)-র জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রচার করেন। এর ফলে ফরাসীদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এইভাবে আমরা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জাতি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার পর্যালোচনার দ্বারা সমগ্র ইউরোপের এই ধারণা দুটির বিকাশের পর্যায়কে তুলে ধরতে পারি।

১.৫ চিনের জাতি ও জাতীয়তাবাদ ধারণার বিকাশ

এখানে আমরা আগে পূর্বে (East)-এ জাতি ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার আলোকে চীনের এই দুটি ধারণার বিকাশকে পর্যালোচনা করব। মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমী ধারণা থেকে জাতি ও জাতীয়তাবাদ ধারণা দুটি নিজ পুষ্টি সাধনের অনেকটাই রসদ পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ হল প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অধিবাসীদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রতিকূল অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই এ ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের পীড়নমূলক প্রকৃতি এই সকল দেশগুলির জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশের

প্রধান কারণ। চীন প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয় ১৯১২ সালে কিং (Qing Dynasty) শাসনব্যবস্থার পতনের পর। এর আগের চীন ছিল সংবিধানিক প্রজাতন্ত্র (Constitutions Republic) যা ৮০০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়। Qing সাম্রাজ্য চীনে ১৬৪৪-১৯১২ পর্যন্ত শাসন করে। ১৯২৮ সালে চীন প্রজাতন্ত্র কুয়োমিনতাং (Kuomintang-KMT)) অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯২১ সালে চীনে কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে এই সময়ে জাপানি আগ্রাসন ও সর্বোপরি স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার শ্রেণী ও দ্বিতীয় চীন-জাপান (Second Sino-Japan) যুদ্ধের (১৯৩৭-১৯৪৫) জন্য চীনের জাতিগঠন প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সালে চীনে মাও জে দং-এর নেতৃত্বে চীনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে চিয়াং-কাই শেখ এর। এইভাবে দীর্ঘ বিপ্লবের ফলে মাও এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য থেকেই আমরা চীনের জাতীয়তাবাদী বিকাশের ধারণা লাভ করতে পারি। কারণ মাও-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা অধিকার ও স্বতন্ত্র জাতীয়সত্তা হয়ে ওঠার তীব্র বাসনা চীনের জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদকে সঞ্চারিত করে। পরবর্তীকালে মাও এর সংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution) ও শিল্প অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ এই জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে অনেকটাই পূর্ণতা দান করে।

তবে এটাও ঠিক যে ভিন্ন ভাষা ধর্মের মানুষ বসবাস করলেও তাদের একটি জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশের বাসনা কখনো আটকে থাকে নি। তবে চীনের জাতীয়তাবাদের বিকাশে সংস্কৃতিক বিপ্লবের অভাব অনবদ্য কারণ তা চীনের প্রত্যেক কোণার মানুষকে একটি মালার দ্বারা গ্রথিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

১.৬ সারসংক্ষেপ

এই আলোচনা থেকেই আমরা জাতি এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের দিকে নজর দিতে পারি। এ দুয়ের মিলন সঞ্জাত জাতি রাষ্ট্র (Nation State) আজ মানব অস্তিত্বের প্রায় বিশ্বব্যাপী সাংগঠনিক রূপ হিসাবে গৃহীত। জন লক (Locke) থেকে জন রলস (John Rawls) প্রত্যেকেই রাষ্ট্রকে দেখেছেন, মুক্ত যুক্তিশীল, স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পরিণতি রূপে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাদের মতে মানুষের অধিকারকে রক্ষার প্রয়োজনেই। তবে একথাও সমানভাবে সত্য যে, জাতির প্রয়োজনে নাগরিক যেমন নিজের জীবনকে বলি দেওয়ার সাহস রাখে সেটাই একটা জাতির আত্মার সাথে ব্যক্তির আত্মার মিলন। কারণ প্রত্যেকটি নিজ নাগরিকদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যেমন যুক্তবদ্ধ তেমনই নাগরিকগণের মহৎ কর্তব্য হল জাতির অখণ্ডতা রক্ষা এইভাবে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির নাড়ির টান অক্ষুণ্ণ থাকে।

তবে এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জাতীয় জাগরণের ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রেও পশ্চিমি চেতনার প্রভাব অন্যতম কারণ, পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ থেকে অব্যহতির আশাই তাদের মনের মধ্যে

জাতীয় জাগরণের সঞ্চার করে। তাই স্বাভাবিক কারণের এই ধারণার মধ্যে পশ্চিমী দার্শনিক প্রভাবও বেশ জোরালো। পার্থ চ্যাটার্জী এক্ষেত্রে একটি কথা বলেন, বা প্রশ্ন তুলেছেন—অ-পশ্চিমী দুনিয়া কেন পশ্চিমী উদারনৈতিক জাতিরাষ্ট্রের মডেলের কোনো বিকল্প—তাদের নিজস্ব ইতিহাস উৎসারিত বিকল্প কল্পনা করতে পারল না। এই বিকল্পের সন্ধান ইউরোপীয় জ্ঞানালোকের তার যুক্তিশীলতার এবং ইতিহাসের বিশেষ গতিসূত্রগুলির বিশ্বজনীনতার দাবিকে প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করাবে।

সে যাই হোক এই বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই যে চীনের জাতি ও জাতীয়তাবাদী বিকাশের গতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তবে একথাও সমানভাবে সত্যি যে জাতির ধারণার মধ্যে তফাৎ থাকলেও জাতীয়তাবাদী চিন্তার মধ্যে কোনো সাধারণ পার্থক্য থাকার কথা নয়।

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনার পশ্চিমী ভাবনাটি পর্যালোচনা করুন।

২। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনের প্রেক্ষিতে জাতি-জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিষয়টির একটি তুলনামূলক সমীক্ষা লিখুন ।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। জাতি ও জাতীয়তাবাদ ধারণাটির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

২। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিকদের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিন।

২। ফরাসী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে টীকা লিখুন।

১.৮ গ্রন্থসূচি

১। চক্রবর্তী, সত্যব্রত, (সম্পা:) "*রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি*" কলকাতা, একুশে প্রকাশন, ২০০৪

২। Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and The Colonial World : A Derivative Discourse,* Zed Books, London.

৩। Asraf Ali and L. N. Sharma, *Political Sociology.*

একক ২ □ রাষ্ট্র ও পৌর সমাজ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ নাগরিক সমাজ: বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট

২.৪ পশ্চিমে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ

২.৫ উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

২.৬ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

২.৭ প্রাচ্যে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ

২.৮ রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ: নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

২.৯ সারসংক্ষেপ

২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১১ গ্রন্থসূচি

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

- বিষয়টির ভূমিকার অংশ থেকে শিক্ষার্থীগণ পৌর সমাজ ও রাষ্ট্র ধারণাটির উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে অবগত হবেন।
- বিষয়টির আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত নানান দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে সচেতনতা লাভ করবেন।
- বিষয়টি শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্র ও সমাজের একটি তুলনামূলক আলোচনায় সাহায্য করবে।
- এই আলোচনা রাষ্ট্র ও সমাজ ধারণাটির পূর্ব-পশ্চিম মাত্রাটিকে পরিস্ফুট করবে।

২.২ ভূমিকা

আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই নাগরিক সমাজের ধারণাটি গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক তত্ত্বে ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে নাগরিক সমাজের ধারণাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নাগরিক সমাজের আলোচনাটি আমরা উদারবাদী ও মার্কসবাদী উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই খুঁজে পাই তবে মার্কসবাদী আলোচনাতে এ বিষয়ে গভীর কোনো আলোচনা আমরা পাই না।

নাগরিক সমাজের ধারণাটি আড়াইশো বছরের পুরানো হলেও গত দু'দশক ধরে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পর থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে নাগরিক সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ভূমিকাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্যে আধুনিকতার সূচনায় এই ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি মুক্ত, স্বাধীন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যক্তি মানুষের স্বার্থে ও সর্বশক্তিমান ও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে নাগরিক সমাজের ধারণাটির বিবিধ অর্থ পরিগ্রহ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে নাগরিক সমাজের ধারণাটি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবস্থায়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন তা সে বামপন্থী, ডানপন্থী যাই হোক না কেন বা নয়া সামাজিক আন্দোলন সব ক্ষেত্রেই নাগরিক সমাজের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ধারণাটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ও তার গঠন, তার টিকে থাকা ও তাকে গৌরবান্বিত করার ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি আবার রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কের স্বাধীন কাজের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে নাগরিক সমাজকে।

২.৩ নাগরিক সমাজ: বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট

নাগরিক সমাজ শব্দটি প্রাথমিকভাবে ল্যাটিন শব্দ "Societas Civitas" থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। রোমান চিন্তাবিদ সিসেরোর কাছে রাষ্ট্রের (Civitas) অর্থ অংশগ্রহণ (societas)। তবে এরও আগে অ্যারিস্টটলের আলোচনাতে আমরা নাগরিক সমাজের আলোচনা পাই। তিনি "koinonia politike" বলে একটা শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছিলেন। যার অর্থ ছিল একটি গোত্র যেখানে নাগরিকরা মুক্ত, সমান ও গুণসম্পন্ন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শহরগুলিতে নাগরিক সমাজের ধারণাকে ব্যবহার করা হত মূলত প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিন্তু মুক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার স্বার্থে। নাগরিক সমাজের গড়ে ওঠার সূচনায় দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এক, আইন ও আইন প্রক্রিয়া। দুই, ন্যায়। রোমের আইনের ব্যবস্থা নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খ্রিস্টীয় সমাজ

ব্যবস্থায় আইনের কাজ ছিল দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা ও অরক্ষিত মানুষের ব্যক্তি অধিকারকে সুরক্ষিত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইওহানেস; আলথুসিয়াস, অ্যারিস্টটল, সিসেরো এবং খ্রিস্টীয় চিন্তাভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগরিক সমাজের ভাবনাকে গঠনমূলক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার ধারণায় এটি এমন একটি সমাজ যার ভিত্তি আদান-প্রদান ও দেওয়া নেওয়া।

নবজাগরণ ও জার্মান চিন্তাধারা নাগরিক সমাজের বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের অন্তরের বৌদ্ধিক উন্নয়ণকে পরিপুষ্ট করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইনি ব্যবস্থা এবং মানুষের মধ্যে সাম্য এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মেকিয়াভেলি সমাজে সাম্যকে মানবমুক্তির মূল চাবিকাঠি বলে মনে করতেন এবং লুথার এই নীতিকেই প্রসারিত করলেন সর্বক্ষেত্রে।

পরবর্তীকালে সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে যার মূল ভিত্তি ছিল ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস এবং স্বজনপোষণ যার সঙ্গে সাম্যের মতো সামাজিক মূল্যবোধের প্রত্যক্ষ সংঘাত দেখা দিয়েছিল। যার পরিণতিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং পুঁজিবাদের উত্থান সূচিত হয়েছিল এবং এই প্রেক্ষাপটটি নাগরিক সমাজের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাগরিক সমাজ বলতে মূলত সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার জগতটিকে বোঝাত। উনিশ শতকে এই ধারণার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয় যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র কতকগুলি অধিকারকে বোঝাতে শুরু করে, যার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সম্পত্তি, সৌজন্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের মতো বিষয়গুলি। নাগরিক সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে আইনগত ভাবে "মুক্ত ব্যক্তি"-র ধারণার উপর। একইভাবে এ হল একান্ত ব্যক্তিদের যৌথ সত্তা। প্রধানত ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে গঠিত হলেও নাগরিক সমাজ মূলত সার্বজনিক ক্ষেত্রে বিরাজ করে।

২.৪ পশ্চিমে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ:

নাগরিক সমাজের ধারণাটির মূলে রয়েছে দুটি পূর্বানুমান। এদের একটি রাজনৈতিক অপরটি সমাজতাত্ত্বিক। নাগরিক সমাজের রাজনৈতিক ধারণাটি মূলত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বের ইঙ্গমার্কিন ঘরাণার মধ্যে নিহিত। অন্যদিকে নাগরিক সমাজের সমাজতাত্ত্বিক ধারণাটি রাষ্ট্র ও পরিবারের মাঝে মধ্যে অবস্থিত একটি সংঘবদ্ধতার জগতের কথা বলে থাকে। এই অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রটি মানুষের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের জায়গা এবং যা খানিকটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে।

২.৫ উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:

পশ্চিমের উদারবাদী চিন্তাধারাতে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাধারা আমরা পাই না। এক্ষেত্রে চারটি উদারনৈতিক ভাবধারা নাগরিক সমাজের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলি হল যথাক্রমে ব্রিটিশ, স্কটিশ, ফরাসি ও জার্মান ভাবধারা।

ক. ব্রিটিশ ভাবধারা :

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাগরিক সমাজ সম্পর্কিত এক বিশেষ আলোচনা পাই ব্রিটিশ তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ জন লকের আলোচনায়। এক্ষেত্রে ১৬৮৯ সালে তাঁর প্রকাশিত—"Two Treatises on Civil Government" এবং "An Essay Concerning Human Understanding" গ্রন্থ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাগরিক সমাজ ছিল প্রকৃতির রাজত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকৃতির রাজত্বের অর্থ একই ধরনের মানুষের মধ্যে সাম্য ও মুক্তির ব্যবস্থা। জন এরেনবার্গ দেখিয়েছেন নাগরিক সমাজ প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বার্থরক্ষা করার ক্ষেত্রে। যে অর্থনৈতিক শক্তি নাগরিক সমাজকে সংগঠিত এবং তাকে স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে আইনের কাঠামোর মধ্যে প্রথিত করে। তার দ্বারা একটি উদারবাদী রাষ্ট্র সুরক্ষিত হবে—এমনই ছিল তাঁর ভাবনা। নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই একমাত্র এটা সম্ভব হতে পারে। লকের মতে নাগরিক সমাজ হল সেই ক্ষেত্র যেখানে মানুষ প্রকৃতির রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়।

খ. স্কটিশ ভাবধারা :

স্কটিশ আলোকায়ন (Enlightenment) ভাবধারাতে আমরা লকের দার্শনিকতাকে অতিক্রম করে নাগরিক সমাজের আরও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় আলোচনার সন্ধান পাই। এই ভাবধারার আলোচনায় ব্যক্তি ও সমাজের জটিলতর মাত্রাগুলি যুক্ত হয়। এই ভাবধারার তাত্ত্বিকদের মধ্যে অ্যাডাম ফারগুসন, ফ্রান্সিস হাচেসন, এবং অ্যাডাম স্মিথ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে আডাম স্মিথ এর "Wealth of Nations" (1776), এবং ফারগুসনের "Essay on the History of Civil Society" (1767) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অ্যাডাম স্মিথের মতে, মানুষ সমাজপ্রিয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই বোঝে যে তার ব্যক্তিগত চাহিদার পূরণ অন্যের উপর নির্ভরশীল। ফলে নাগরিক সমাজ শুধু প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে উদ্ভব হয় না। তার মতে নাগরিক সমাজকে এক আত্মসচেতন ব্যক্তির স্বাভাবিক আশ্রয় হিসেবে দেখা যেতে পারে। তার মতে সব ব্যক্তিই যেহেতু আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক, সেহেতু তার ফলে সমাজের প্রত্যেকেরই আত্মস্বার্থ প্রসারিত হয়। মানুষের আত্মবাদী প্রকৃতির প্রকাশ ঘটে তার মুনাফা সন্ধানী আচরণে এবং এই মুনাফা লাভের চেষ্টা মানুষের এমন এক স্বাভাবিক প্রবণতা যা সমাজকে করে তোলে সক্রিয়। মুনাফার তাগিদ ব্যক্তি স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটায়, সমন্বয় বাড়ায়, যার ফলে সমাজের নৈতিক ভাবগত ও পার্থিব উন্নতি ঘটে।

অন্যদিকে ফারগুসনের মতামত ছিল অ্যাডাম স্মিথের বিপরীতে। তার মতে সম্পদ মানুষকে আত্মশ্লাঘা দেয়, দেয় ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা। কিন্তু এগুলিকে সরিয়ে নিলে সম্পদ শুধুমাত্র পার্থিব ভোগের রসদে পর্যবসিত হয় এবং সেক্ষেত্রে সমস্ত সৃজনশীল, সার্বজনিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার মতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সার্বজনিক ক্ষেত্র হিসেবে নাগরিক সমাজ শুধুমাত্র বাজারে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এমন একটি নৈতিক ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়। এই নৈতিক ক্ষেত্রে লোকহিতের ধারণা অগ্রগণ্য যা ছাড়া নাগরিক সমাজ একটি কৃষ্ট (Civil) সমাজ হয়ে

উঠতে পারে না। এই লোকহিত বা সার্বজনিক মঙ্গল অর্জনের জন্য যখন ব্যক্তির সুখ বা স্বাধীনতার সাথে সামাজিক হিতের বিরোধ বাধে, তখন প্রথমটাকে বর্জন করতে হয়। তার মতে ব্যক্তি সমগ্রের একটি অংশ এবং সার্বজনিক মঙ্গল যদি ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে একথাও সমানভাবে সত্য যে, ব্যক্তির সুখ নিশ্চিত করা নাগরিক সমাজের বড় লক্ষ্য।

গ. ফরাসি ভাবধারা :

ফরাসি ভাবধারার চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্তেস্কু ও টকভিল। ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত "The Spirit of the Laws" গ্রন্থে মন্তেস্কু তুলে ধরলেন নাগরিক সমাজ কীভাবে রাজনৈতিক শাসক ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ করে। তার মতে নাগরিক সমাজ মধ্যবর্তী কিছু মতাবলম্বী শক্তির দ্বারা সংগঠিত, যা বিস্তৃত এস্টেট থেকে চার্চ ও অন্যান্য নিচুতলার সংগঠন পর্যন্ত, যা রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরোধিতা করে থাকে।

টকভিল এর প্রায় একশ বছর পরে তার লেখা "Democracy in America" তে মন্তেস্কুর এই চিন্তাকে আরও পরিপুষ্ট করলেন মূলত মার্কিন গণতন্ত্রের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তার মতে নাগরিক সমাজ হল এমন এক পরিসর যেটা পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে তার অবস্থান। যেখানে কতকগুলি গোষ্ঠী রয়েছে যে গোষ্ঠীগুলি কোনো ভাবেই জন্মসূত্রে বা রক্তসূত্রে আবদ্ধ নয়। যারা এই সংগঠনের সদস্য হয় তা মূলত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এবং সদস্যরা সেই সংগঠনের যে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন থাকে সেগুলো মেনে চলে। আবার সদস্যরা ইচ্ছা করলে সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার মতে নাগরিক সমাজের অবস্থান হল রাষ্ট্রের বাইরে এবং নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রকে সমালোচনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে, যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা করবে।

ঘ. জার্মান ভাবধারা :

এই ভাবধারার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হলেন হেগেল। উপরিউক্ত আলোচিত তিনটি ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারার উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। নাগরিক সমাজ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। যদিও তার কিছু গুরুত্ব আছে এটাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নাগরিক সমাজকে তিনি মূলত অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের একটি ক্ষেত্র হিসেবে মনে করতেন। হেগেলের মতে, সকল মানুষকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন, আর সম্পত্তির স্বীকৃতির মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। তিনি মনে করতেন পরিবারে ভালবাসার যে স্থান, নাগরিক সমাজে সম্পত্তির সেই স্থান। হেগেলীয় ধারণায় নাগরিক সমাজ হল বুর্জোয়াদের সমাজ। তবে তার কাছে "বুর্জোয়ার" অর্থ শুধুমাত্র আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক মানুষ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

যে ব্যক্তিমানুষের নিয়ে নাগরিক সমাজ গঠিত হয়, তারা শুধু সর্বাধিক পরিমাণে আত্মস্বার্থ অর্জনে সচেষ্ট এমন নয়। বরং একটি "সার্বিক পরিবার" গঠন তাদের লক্ষ্য এবং এই সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধের যথেষ্ট পরিমাণ পারস্পরিকতা ও আদান-প্রদান দেখা যায়। নাগরিক সমাজ হল এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শুধুমাত্র বিশেষ স্বার্থ নয়, সাধারণ স্বার্থও উপস্থাপিত হবে। Philosophy of History গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

একজনের কাজ এমনভাবে সম্পাদিত হয় তাতে একই সাথে সকলেরই কাজ হয় এবং এর ফলে সমগ্র জনসমাজের স্বার্থপযোগী বিধি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

তবে হেগেলের মতে বিশেষ স্বার্থগুলির পারস্পরিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজের অধঃপতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এই কারণে তিনি মনে করতেন যে, একটি নৈতিক বা আদর্শস্থাপনকারী ব্যবস্থা হিসেবে নাগরিক সমাজ বাস্তবায়িত হয় রাষ্ট্রে রূপান্তরের মাধ্যমে এবং যে রাষ্ট্র হল প্রকৃত নৈতিকতার মূর্ত রূপ। এইভাবে নাগরিক সমাজের ধ্রুপদী ধারণায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যে যে পরিষ্কার পার্থক্য করা হয়েছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

২.৬ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:

ধ্রুপদী মার্কসবাদে নাগরিক সমাজকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে. মার্কস নাগরিক সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্তরের একটি সূচক হিসেবে দেখেছেন। নাগরিক সমাজের জন্ম বুর্জোয়া দর্শনের কোনো বস্তুবাদে যা আধুনিক বহিঃপ্রকাশ এবং যা মূলত ব্যক্তিস্বার্থবাদের সমার্থক। মার্কসের মতে, নাগরিক সমাজ আসলে এক হবসীয় দুঃস্বপ্ন যা অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং উগ্র ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের সমাহার। তার মতে প্রাক-পুঁজিবাদী স্তরে নাগরিক সমাজ সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কিছু গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করত কিন্তু পরবর্তীকালে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় এই ক্ষেত্রটি বুর্জোয়াদের দ্বারা করায়ত্ত হয়। মার্কস নাগরিক সমাজকে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করতেন মানবমুক্তির স্বার্থে নাগরিক সমাজকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার। অর্থাৎ নাগরিক সমাজ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক।

নাগরিক সমাজ সম্পর্কে ধ্রুপদী মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই আন্তনিও গ্রামশির রচনাতে। ইতালির এই বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নাগরিক সমাজকে শুধুমাত্র শিল্প-ব্যবসাকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে না দেখে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। তিনি মার্কসের সঙ্গে একটা বিষয়ে একমত ছিলেন যে সমাজে শোষক শ্রেণী শোষিতশ্রেণীর উপর ক্ষমতা বিস্তারের জন্য হিংসার আশ্রয় নেয়। তবে এর পাশাপাশি তিনি আরও বললেন যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শুধুমাত্র হিংসার মাধ্যমেই শাসন চালায় তা নয় বিশেষ করে সেই সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেখানে উদারবাদী গণতন্ত্র অবস্থান করে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ বেশ উন্নত সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে শাসন চালায় তা নয় এক্ষেত্রে শাসিতদের সম্মতি আদায়ের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার শাসন চালায়।

উপরিউক্ত ভাবনাকে তাঁর আধিপত্যবাদের মূল তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে গ্রামশি এই উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন যে, কেন ১৯১৭ সালের পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হল না। তাঁর মতে, সামাজিক কাঠামোতে দ্বিস্তরীয় উপরিতল আছে। প্রথম স্তর নাগরিক সমাজ য়ার মধ্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবস্থান করে। দ্বিতীয় স্তরে আছে রাজনৈতিক সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র। এই দুই স্তর মিলিয়েই সমাজে আধিপত্য গড়ে ওঠে, এবং এই ক্ষেত্রে গ্রামশির মার্কসবাদ নাগরিক সমাজের একটা গুরুত্ব আছে।

নাগরিক সমাজ বলতে তিনি মূলত চার্চ, শ্রমিক সঙ্ঘ, রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী তাঁর মতাদর্শকে অনেকবেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং শোষিত শ্রেণী অজান্তেই এই বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য জ্ঞাপন করে। গ্রামশির মতে, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষিত শ্রেণীর উপর আধিপত্য কায়েম করে। কাজেই পশ্চিমী ধনতন্ত্রে শ্রেণী বৈরিতার কোনো ধারণা না থাকায় বিপ্লবের কোনো সুযোগ নেই। তিনি মনে করেন এই সমস্ত দেশে নাগরিক সমাজ পুঁজিবাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেয়। কাজেই এই সমস্ত দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে প্রথমে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির আদর্শগত অবস্থানকে জয় করতে হবে। অন্যদিকে রাশিয়ার ক্ষেত্রে গ্রামশির মত হল যে এখানে নাগরিক সমাজের অনুপস্থিতির ফলে শ্রেণী বৈরিতা প্রত্যক্ষভাবে দেখা দেয় না এবং এই ধরনের শাসন ব্যবস্থাতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় মূলত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, যা মানুষের শোষণের মাত্রাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। ফলে মানুষের সচেতনতাকে বৃদ্ধি করে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাভাবিকভাবে প্ররোচিত করে।

২.৭ প্রাচ্যে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ :

প্রাচ্যে তথা অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের বিষয়টি খুব সমস্যাকীর্ণ। পশ্চিমী রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের আলোচনাতে যেরকম সুদৃঢ় তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা পাই, অ-পশ্চিমী রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের আলোচনাতে সেরকম কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা পাই না। সুদীপ্ত কবিরাজের মতে, অ-পশ্চিমী সমাজের রাজনৈতিক আধুনিকতা বোঝার জন্য পশ্চিমী সামাজিক তত্ত্বের স্মরণ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু একই সাথে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, অ-পশ্চিমী রাষ্ট্র-সমাজগুলির বিষয়গুলি এত জটিল যে, তা পশ্চিমী ঘরানার সহজ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ধরা যায় না। কাজেই পূর্বে তথা অ-পশ্চিমী দেশগুলির নাগরিক সমাজের বিকাশ ও চরিত্র আলোচনা করতে হবে সম্পূর্ণভাবে অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থার নিরিখেই।

আমরা যদি ভারতবর্ষের মতো অ-পশ্চিমী দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব রাষ্ট্র সম্পর্কে মোহভঙ্গের কারণেই নাগরিক সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। দীপঙ্কর গুপ্তর মতে, ভারতে বিশেষত গত পাঁচ দশকে প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্র বিশেষ কোনও সুফল দিতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের বর্তমান দাবি উপেক্ষা করে ভারতরাষ্ট্র নিজের এবং তার কার্যনির্বাহীদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থেকেছে। রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গের কারণে দুটি ভিন্ন ধরনের দাবি উপস্থাপিত হচ্ছে। একদিকে, রাষ্ট্রের সমস্ত কাঠামোসহ অতীতে প্রত্যাবর্তনের আর্তি; অন্যদিকে অন্তর্বর্তী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে রূপায়িত করার আর্জি।

প্রথম প্রবণতা থেকে জন্ম নিচ্ছে লোকসমাজ (Community) যেক্ষেত্রে প্রাচীন বন্ধন ও প্রথাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রবণতাটি স্পষ্টভাবেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক আন্দ্রে

বেতেই (Andre Beteille) আইনি—যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনা দ্বারা চালিত নাগরিক সমাজের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এটা ঠিক যে, ভারতের অন্তর্বর্তী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট এবং পালিত। কিন্তু তা কোনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তের ফলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেতের মতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার নির্জীব করে ফেলা হয়েছে। বেতের জোরালো মত হল, নাগরিক সমাজের স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল নির্ভর করে।

বেতেই নাগরিক সমাজের গঠনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, পৌরনিগম, রাজনৈতিক দল, ব্যাঙ্ক, শ্রমিকসংঘ ইত্যাদির মতো মুক্ত ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র বা বাজার কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে চলবে না। অর্থাৎ বেতের এই আলোচনার সঙ্গে আমরা পশ্চিমী অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার মিল খুঁজে পাই।

অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এখনও পশ্চিমী গণতন্ত্রের মতো বিকশিত নয় সেখানে লোকসমাজের আনুগত্যের প্রাবল্য নাগরিক সমাজের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের জাতপাত ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থায় পূর্বারোপ, ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাস, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা প্রভৃতি নীতিগুলির কারণে এমন ব্যক্তিমানুষ গড়ে ওঠে, যে একটি বিশেষ ধরনের নৈতিক সমাজের অধীন এবং এমন এক প্রকৃতি প্রদর্শন করে যা তার জন্ম ও পেশার স্বাভাবিক পরিণাম বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যদিকে ইউরোপে যে ব্যক্তির ধারণা গড়ে উঠেছে তার সাথে এর প্রভেদ স্পষ্ট। সুতরাং পূর্বে তথা অ-পশ্চিমী দেশগুলিতে নাগরিক সমাজকে শনাক্ত করা অনেক বেশি কষ্টকর। এর প্রধান কারণ নাগরিক সমাজ ও লোকসমাজের বৈপরীত্য।

অ-পশ্চিমী দেশগুলির নাগরিক সমাজের আলোচনাতে পার্থ চ্যাটার্জীর আলোচনা আমাদের বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে। তার মতে আমরা যদি অ-পশ্চিমী দেশগুলি বিশেষত ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে দেখব ভারতে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায়ের মধ্যে নাগরিক সমাজের ধারণা গড়ে ওঠে এবং এই নাগরিক সমাজের মধ্যে অ-পশ্চিমী দেশের নাগরিক সমাজের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জীর বক্তব্য হল অ-পশ্চিমী দেশগুলিতে নাগরিক সমাজের বাইরে যারা অবস্থান করছে অর্থাৎ সাধারণ জনগণ তারা কি নাগরিক সমাজের অঙ্গ? এবং এই সাধারণ জনগণের কি স্বার্থ রক্ষার কোনো অধিকার আছে? এই পরিপ্রেক্ষিতে তার মত হল যে, অ-পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণ জনগণ নিজেদের উদ্যোগে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে এবং এই ক্ষেত্রটাকে তিনি রাজনৈতিক সমাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই রাজনৈতিক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এক, এই রাজনৈতিক সমাজের কাজকর্ম আইন বা সাংবিধানিক নীতি মেনে হয় না। দুই, রাজনৈতিক সমাজের অধিকার মূলত যৌথ অধিকার, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকার নয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিস্কার যে অ-পশ্চিমী দেশের নাগরিক সমাজের চরিত্র ব্যাপক ও জটিল প্রকৃতির। এই সমস্ত দেশগুলির রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের বিশেষ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

২.৮ রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ: নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

সাধারণভাবে নাগরিক সমাজকে মূলত দেখা হয়েছে রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে একটি স্বাধীন অবস্থানকারী বৃত্ত হিসেবে। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্বায়ন ও নয়া উদারবাদের সূচনা নাগরিক সমাজের ধারণার ক্ষেত্রে তৈরি করেছে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং শুরু হয়েছে আরও চুল চেরা বিশ্লেষণ।

১৯৯৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক রবার্ট পাটনাম তাঁর লিখিত "Making Democracy Work" এ নাগরিক সমাজ প্রসঙ্গে এক নতুন ধারণার উদ্ভব করেছেন যেটা হল "Social Capital" বা সামাজিক পুঁজির ধারণা। এই আলোচনাতে তিনি দেখিয়েছেন যে কোনো একটি দেশের নাগরিক সমাজ সেই দেশের গণতন্ত্রকে কিভাবে আরও সক্রিয় করে তোলে। তার মতে যখন কোনো দেশের কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতিবোধ কাজ করে এবং যেটা পারস্পরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে সব থেকে বেশি শক্তিশালী হয় এর পাশাপাশি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধন তৈরি হয় তখনই আমরা বলতে পারি যে সেই সমাজে সামাজিক পুঁজি কাজ করছে। পাটনাম এর মতে এই ধরনের সমাজেই একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব। কারণ এই সমাজে জনগণের সঙ্গে সরকারের এক পারস্পরিক বিশ্বাসের ধারণা গড়ে ওঠে।

নাগরিক সমাজের আলোচনাতে আমরা আরও এক নতুন ধারণা পাই বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক হেবারমাসের আলোচনাতে। তার মতে নাগরিক সমাজ হল এমন একটা গণপরিসর যেখানে গণতান্ত্রিক পন্থায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনমত গঠনের সুযোগ তৈরি হয়। এই আলোচনাতে মূলত সমাজের সাধারণ স্বার্থের বিষয়ই উঠে আসে। হেবারমাসের মতে যখন মুক্ত বাজার অর্থনীতি ছিল তখন আলোচনার এই পরিসর ছিল। কিন্তু যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রবণতা দেখা দিল তখন গণপরিসরের ধারণা বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয়।

১.৯ সারসংক্ষেপ

বর্তমানে নাগরিক সমাজের আলোচনা শুধুমাত্র জাতীয় সীমানার মধ্যে আটকে নেই তা এক বিশ্বায়িত রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং একটি নতুন শব্দবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে যেটা হল "বিশ্বায়িত নাগরিক সমাজ" (Global Civil Society)। এক্ষেত্রে নীতিভিত্তিক আন্দোলন ও N.G.O এই দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে কাজ করে থাকে। বিশেষতঃ মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে অনেক সমালোচক অবশ্য N.G.O-দের কার্যাবলীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কারণ তারা মনে করে যে N.G.O গুলির কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব আছে এবং রাষ্ট্র বিরোধী কাজ সংগঠিত করতে পারে। পরিশেষে একটা কথা আমরা বলতে পারি যে, বর্তমানে নাগরিক সমাজ নাগরিকদের স্বার্থে রাষ্ট্রের বিরোধিতা যেমন করে থাকে তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবেও কাজ করে থাকে।

২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্ব-পশ্চিম তুলনাটি বর্ণনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। সমাজ সম্পর্কিত পশ্চিমী ধারণাটি সংক্ষেপে লিখুন।

২। রাষ্ট্র ধারণাটির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। সমাজ সম্পর্কিত উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে লিখুন।

২। নাগরিক সমাজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি লিখুন।

২.১১ গ্রন্থসূচী

১। Sudipta Kaviraj and Sunil Khilnani (eds.), *"Civil Society : History and Possibilities"*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001

২। Adam Seligman, *"The Idea of Civil Society"*, New York, Free Press, 1992.

৩। সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), *রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি*, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, ২০০৪।

একক ৩ □ তুলনামূলক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ আমেরিকা ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩.৪ আমেরিকা ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের মধ্যে তুলনা

৩.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থসূচি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

- প্রথম ভাগের আলোচনা (ভূমিকাতে) তুলনামূলক আলোচনার সূচনা ও বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাবে।
- রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুটির (USA এবং UK) মধ্যে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- তৃতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী দুটি দেশের রাজনৈতিক দলের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা রাজনৈতিক দলের কার্যপদ্ধতি বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৩.২ ভূমিকা

তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা বা তুলনামূলক রাজনীতি এই দুটি অভিব্যক্তিতেই তুলনামূলক শব্দটি বিশ্লেষণ আকারে এলেও বাস্তবে শাসনব্যবস্থা বা রাজনীতির চরিত্র নির্দেশক নয়। তুলনামূলক বলতে বোঝানো হয় শাসনব্যবস্থা বা রাজনীতির চর্চা করার অন্যতম পদ্ধতিতে অর্থাৎ তুলনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বৌদ্ধিক উপাচার

নিয়ে রাজনীতির বাস্তবতাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা। সংক্ষেপে তুলনামূলক রাজনীতি বলতে শব্দগতভাবে বোঝায় রাজনীতির তুলনামূলক পাঠ।

তবে একথা সত্যি যে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিশেষত আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (Behaviouralist Political thinker)-দের হাত ধরে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চা বহুলপ্রচলিত হলেও প্রাচীন গ্রীস ও রোমান যুগে তুলনামূলক রাজনীতির চর্চা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত প্লেটো (Plato), অ্যারিস্টটল (Aristotle) তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করতেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকরূপে অ্যারিস্টটল ১৫৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীকালে সিসেরো (Cicero), পলিবিয়াস (Polybius), ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli), মন্তেস্কু (Montesquieu), জন স্টুয়াট মিল (J.S. Mill)

—এই তুলনামূলক পদ্ধতির পর্যালোচনাকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করেন, তবে বিংশ শতকের মধ্যভাগে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হাতে এই আলোচনা মধ্যে আলোচনা ক্ষেত্রের/পরিধির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কারণ এই সময় থেকে তুলনামূলক সরকার (Comparative Politics) কথাটির পরিবর্তে তুলনামূলক রাজনীতি কথাটির প্রচলন (Comparative Politics) দেখা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন—মুনরো (Munro), সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong), হারম্যান ফাইনার (Harman Finer), অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (Almond & Powel), কোলম্যান (Colmeman), আরও অনেকে।

আলোচনার স্বার্থে আমরা এখানে তুলনামূলক আলোচনার স্তরের কথা বলতে পারি, অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনা বিভিন্ন স্তরে হতে পারে—Micro Level Study, Middle Level Study ও Macro Level Study, আমাদের আলোচনা হল মধ্যবর্তীস্তরের আলোচনা।

৩.৩ আমেরিকা ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারীগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার পীঠস্থানরূপে ব্রিটেনকে আমরা অভিহিত করে থাকি। আর সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উপস্থিতি কারণ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী ব্যতীত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মানুষের পক্ষে অংশগ্রহণ এক প্রকারের অসম্ভব। তবে এটা ঠিক যে বর্তমানে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ এভাবে সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতকের আগে তা এরকম ছিল না। তখন রাজনৈতিক দল বলতে প্রধান দু'টিকেই বোঝাতো, হুইগ (Whigs) ও টোরি (Tory), তবে এগুলিকে আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক দল বলা ঠিক হবে না। বর্তমানে আমরা ব্রিটেনের দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখি (Conservative Party ও (Labour Party) পর্যায়ক্রমে টোরি ও হুইগ দলেরই পরিবর্তীত রূপ এটির সঙ্গে আমরা যদি ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করি তা হলে সেক্ষেত্রে ও ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীর ইতিহাসেও সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, এই সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের বহুবিধ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ব্রিটেনের

স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার প্রকারভেদ ও কাজের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান অধ্যাপক হার্ভে ও ব্যাথার এগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন যথা—অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ও অর্থনৈতিক নয় এমন গোষ্ঠী।

পক্ষান্তরে আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তবে মার্কিন সংবিধানের প্রণেতাগণ দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবকে অকাম্য বলে মনে করতেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের দ্বিতীয়বার কার্যভার গ্রহণের সময় দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দল (Federalist Party) ও যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দল (Anti Fidiralist) পরবর্তীকালে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দল গড়ে ওঠে। তবে এইভাবে সূচনা হলেও অনেক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বর্তমানে আমেরিকার রাজনৈতিক দল বলতে আমরা দুটি দলের কথা বলি যথা— Democratic ও Republican।

তবে স্বার্থগোষ্ঠীর কথা বলতে গেলে একথা বলা জরুরী যে ব্রিটেনের তুলনায় আমেরিকার স্বার্থগোষ্ঠীর সংখ্যাগত আধিক্যও যেমন আকর্ষণীয় পাশাপাশি আমেরিকার স্বার্থগোষ্ঠীর সংখ্যা ও কাজের পদ্ধতিগত ক্ষেত্র ও যেন সম্প্রসারিত।

৩.৪ আমেরিকা ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের মধ্যে তুলনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা আমরা দুটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলের ভূমিকা অনুধাবন করতে পারি।

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয়দেশেই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব বর্তমান। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় Democratic ও Republic দলের অস্তিত্ব দেখা যায়, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সেখানে Conservative ও Labour দলের অস্তিত্ব সর্বজনবিদিত।

২। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল দুটির প্রকৃত ক্ষমতা সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরে কেন্দ্রীভূত। অর্থাৎ ব্রিটিশ দল কেন্দ্রীভূত। ব্রিটেনে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। তাই দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে ও এককেন্দ্রীকতা পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান দুটি দলের প্রকৃত ক্ষমতা সংগঠনের নিম্নস্তর সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। অর্থাৎ মার্কিন দলব্যবস্থা বিকেন্দ্রকৃত তার অন্যতম কারণরূপে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই প্রধানত দায়ী করে থাকি।

৩। ব্রিটেনের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংহতি পরিলক্ষিত হয়। এর অন্যতম কারণ রূপে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমন্সসভার কাছে মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা অনেকটা পরিমাণে কাজ করে।

তবে আমেরিকার দল ব্যবস্থার মধ্যে এইরূপ দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না। যার অন্যতম কারণরূপে আমরা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার কথা বলতে পারি।

৪। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও নীতির ভিত্তিতেই ব্রিটেনের প্রধান দুটি দল নির্বাচনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। সরকারি ক্ষমতা দখল করতে পারলে দল দুটি দলীয় নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করে।

Potter-এর মতানুসারে মার্কিন দল-দুটির মধ্যে কর্মসূচী ও নীতিগত তেমন কোন পার্থক্য নেই।

৫। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দলের মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ রকম কোনো পার্থক্য অনুপস্থিত।

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ার জন্য এখানে দলীয় সরকার নেই।

অন্যদিকে ব্রিটেনের সংসদীয় রীতিনীতি অনুসারে নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই সরকার গঠন করে তাই সরকারের কাজকর্মে রাজনৈতিক দলগুলির যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫ স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আলোচনা অপরিহার্য।

১। উভয়দেশের স্বার্থগোষ্ঠী সমূহ বিভিন্ন স্বার্থের সংহতি ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমরূপে কাজ করে। সেই কারণে উভয়দেশের সরকার যখন জনস্বার্থে কোনো নীতি গ্রহণ করে তখন সরকার সংশ্লিষ্ট স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পন্থা ও পদ্ধতির অবলম্বন করে থাকে তার মধ্যেও অনেক মিল বর্তমান।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যালোচনা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। মার্কিন ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অধিক। অন্যদিকে ব্রিটিশ গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের পরিধি এত ব্যাপক নয় এবং ভূমিকাও এত তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও এটা বলা বাঞ্ছনীয় ব্রিটিশ গোষ্ঠীগুলির তুলনায় আমেরিকার গোষ্ঠীগুলি অনেকটাই সংগঠিত।

৪। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন লবি আইনসভার স্তরে সংগঠিত ভাবে সক্রিয় থাকে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটেনে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির সংসদীয় স্তরে এত সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে লবির ব্যবস্থা করতে পারে না।

৫। ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারবিভাগের স্তরে কাজকর্ম করে না। কারণ ব্রিটেনের আদালত পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে না। এর অন্যতম কারণরূপে আমরা পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার কথা বলতে পারি।

অন্যদিকে এর ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্য আমেরিকার বিচার বিভাগের মধ্যে দেখা যায় এই কারণে আমেরিকার বিচার বিভাগ অনেকটা সক্রিয়ভাবে বিচার বিভাগীয় স্তরে কাজকর্ম করতে পারে।

৬। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবেশে ব্রিটেনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সক্রিয় ও বেশ কার্যকরী ভাবে সরকার বা শাসনবিভাগের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। আমেরিকায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠী কাজ করলেও ব্রিটেনের মত এত কার্যকরী ভাবে কাজ করতে পারে না।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা আমরা অতি সহজেই দুটি দেশের বহু প্রাচীন রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে পারি। বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ গোষ্ঠীর উৎপত্তিকাল ও অনেক পূর্বে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন দুটি দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে পারি, পাশাপাশি আমরা সহজেই দুটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার কারিগররূপে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের পরিধি, পদ্ধতি, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারি। যা তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনাকে অনেকবেশি গ্রহণযোগ্যতা দেবে। কারণ এর আলোকে আমরা অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর কাজকর্মের পর্যালোচনা করে উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারি। এইভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হিসাবে তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনা বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে—তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা লিখুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কাজের প্রকৃতি পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমূহের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২। ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

৩.৮ গ্রন্থসূচী

Rakhahari Chatterjee, *"Introduction to Comperative Political Analysis"*. Sarat Book Distributors: Kolkata.

Almond, G. A., G. B. Powell, K. Strom and R. J. Dalton. (2004) *Comparative Politics Today : A World View.* Pearson Education : New dElhi.

Duverger, Maurice. (1972). *Party Politics and Pressure Groups : A Comparative Introduction.* Thomas Y. Crowell Company : New York.

Web Sources :

Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/index.htnilEn Encyclopaedia Britannica.http://www.britannica.com/

একক ৪ □ পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনা-বাহিনীর ভূমিকা

একক - ৪ (ক) পাকিস্তান ঃ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ আঞ্চলিকতা ও পাকসেনাবাহিনী

৪.৪ সেনাবাহিনীর অধিপত্যের ইতিহাস

৪.৫ সেনাবাহিনী ও মৌলবাদের সম্পর্ক

৪.৬ ব্যতিক্রমী সেনাপ্রধান

৪.৭ আন্তর্জাতিক প্রভাব

৪.৮ সারসংক্ষেপ

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১০ গ্রন্থসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

- ভূমিকাতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব বিস্তারের সামগ্রিক পরিচিত পাওয়া যাবে।
- সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রভাব ও মৌলবাদের প্রভাব বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ অবগত হবেন।
- পাক সেনাবাহিনীকে কতখানি প্রভাবিত করেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি তার সম্পর্কে জানা যাবে।

৪.২ ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের হাত ধরে পাকিস্তান সৃষ্টি তার পূনর্গঠনের আগে জিন্না প্রয়াত হন—১৯৪৮ সালে। জিন্নার প্রয়াত হওয়ার ফলে

লিয়াকত আলি খান প্রধানের আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে এক আত্মঘাতি হানায় লিয়াকত আলি খান ও প্রয়াত হন। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির চার বছরের মধ্যে দুই প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শূন্যতা পূরণ করা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ফলে শুরুতেই যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়—পরবর্তী সময়ে তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে, ভারতবর্ষ শুরু থেকেই সংবিধান সভার গঠন এবং ১৯৫১ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে চলেছে। যা বর্তমানে বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। আর সেখানে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময় লেগে গেছে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে। আর এই সময়কালের মধ্যে সাতজন প্রধানমন্ত্রি নির্বাচিত হয়েছে এবং বহিষ্কারও হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার না থাকার ফলে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভাবের কারণেই প্রথম থেকে অভিজাত আমলাতন্ত্র ও পাক-সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রাধান্য লাভ করেছে। তার ফলাফল—১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রপতি ইসকানদার মির্জাকে সামনে রেখে সেনাপ্রধান আয়ুব খানের সামরিক আইন জারি (Martial Law) করে।

রাজনৈতিক দলের গঠন ও সংবিধান গঠিত না হওয়ার কারণে; সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র এই দুই অনির্বাচিত প্রতিষ্ঠান (Twin Unelected Institution) পাকিস্তানের প্রধান ভিত্তি হিসাবে উঠে আসে।

১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬৮ বছরের পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাসে চারবার সামরিক শাসন (Martial Law) জারি হয়েছে। অক্টোবর ১৯৫৮, মার্চ ১৯৬৯, জুলাই ১৯৭৭ এবং অক্টোবর ১৯৯৯ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্ট হওয়ার ১১ বছরের মাথায় প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন সংগঠিত হয়। সংবিধান তৈরিতে ৯ বছর সময় লাগিয়ে দেয় পাকিস্তান।

৪.৩ আঞ্চলিকতা ও পাকসেনাবাহিনী

আঞ্চলিকতা ও নৃকৌলিকতা হল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবথেকে বড় শক্তি। পাঞ্জাব প্রদেশ এবং North West Frontier প্রদেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অধিক সংখ্যক অফিসার এই দুই প্রদেশ থেকে উঠে আসে—ফলে এই দুই প্রদেশের সেনা আধিকারিকরা আমলাতন্ত্রের সাথে যোগসাজ করে আধিপত্য বিস্তার করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাসে তিনজন সেনাপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে—যারা পাঞ্জাব এবং পাচতুন এলাকাভুক্ত নন। এরা হলেন জেনারেল মোহম্মদ মোসা (বালুচস্থান), জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ (করাচি) এবং জেনারেল পারভেজ মেশারফ (করাচি)। এর ফলে সিন্ধু ও বালুচ প্রদেশের সেনা অফিসাররাও—পাঞ্জাব এবং পাচতুনদের মধ্যে দ্বৈরাথ্য সর্বদা বজায় রয়েছে।

৪.৪ সেনাবাহিনীর আধিপত্যের ইতিহাস

বর্তমানে ইসলামাবাদের মসনদে রয়েছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। যার মাথায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। সত্যি বলতে প্রধানমন্ত্রি শরিফ নিজেই জানেন না, তার নিজের পদটা কতখানি সুরক্ষিত!

কারণ এর আগে সামরিক অভ্যুত্থানে সেনাপ্রধান পারভেজ মোশারফের হাতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল। যেতে হয়েছিল নির্বাসনে। শুধু পারভেজ মোশারফ নন, পাকিস্তানের ইতিহাসে সামরিক অভ্যুত্থানের নায়করা হলেন আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান থেকে মহম্মদ জিয়া উল হক যাদের সামরিক শাসনের অধীনে থেকেছে পাকিস্তান। যতই গণতান্ত্রিক সরকার হোক না কেন, পাকিস্তানের অতীত ইতিহাস বলছে—দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি সেনার অমতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় পুরো কার্যকাল শেষ করতে পারেনি। ব্যতিক্রমী একমাত্র প্রয়াত নেত্রী বেনজির ভুট্টোর দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকার (Pakistan Peoples Party) যারা একমাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালের পুরো মেয়াদ সম্পূর্ণ করে।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে একটি অসামরিক সরকার যে ক্ষমতা ভোগ করে পাকিস্তানে তার সম্ভবপর নয়। সেনাবাহিনীর সরাসরি রাজনীতি জড়িয়ে পড়া পাক সেনার একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাক সেনার রাজনীতিকরণ ও ইসলামিকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহুদলীয় ব্যবস্থা, নির্বাচন, সংখ্যাগুরু রাজনৈতিক দলের সরকার গঠন, সবকিছু উপরে উপরে থাকলেও সেনা, মৌলবাদ ও পাকসেনার গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই (ISI)-এই তিনশক্তি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পাকিস্তানে "সমান্তরালে ক্ষমতা ভোগ" করে। আন্তর্জাতিক চাপে পাক সরকার কাশ্মীর নিয়ে আলোচনায় বসতে সামান্যতম সদিচ্ছা দেখালেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখনও চায়না আলোচনা হোক। তারা যেন তেন প্রকারে আলোচনা ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। পাক সেনাবাহিনীর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। নওয়াজ শরিফ যখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির সঙ্গে লাহোর শান্তি আলোচনা করেছেন, আর তখন সেনাপ্রধান মোশারফ কার্গিল আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাম্প্রতিক রাশিয়ার উফাতে পাকিস্তানের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা মিলিত হন। উফার বৈঠকে ঠিক হয়—পরবর্তী জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা ভারতবর্ষে হবে। কিন্তু NSA পর্যায়ের সেই বৈঠক বাতিল করা হয়—দুই দেশের পক্ষ থেকে—কারণ আলোচনার বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধিতা। আর এই ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, গণতান্ত্রিক সরকারের উপর আলোচনার বিষয়কে কেন্দ্র করে চাপ সৃষ্টি করে পাক সেনাবাহিনী।

৪.৫ সেনাবাহিনী ও মৌলবাদের সম্পর্ক

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়—জেনারেল জিয়া-উল-হকের ১১ বছরের সামরিক শাসনের হাত ধরে। ১৯৭৭ সালে জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। অহিন-শৃঙ্খলার অবনতির দোহায় দিয়ে জেনারেল জিয়া-উল-হক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন ১৯৭৭ সালের ৫ই জুলাই। এরপর ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আর এই সময়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির পট-পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান দখল করে। আর আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উৎখাত করার জন্য মৌলবাদি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে তৈরি করা শুরু হয়—পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই (ISI) মাধ্যমে। যার নেতৃত্বে ছিল তৎকালীন

গোয়েন্দা প্রধান—হামিদ গুল। আর এই ক্ষেত্রে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান শত্রু আমেরিকা অস্ত্র ও অর্থ নিয়ে পাক সেনাবাহিনী ও জঙ্গি সংস্থাগুলিকে সাহায্য প্রদান করে। সোভিয়েতের পতন এবং কাবুলের মসনদে তালিবানিরা দখল করার পরই আই এস আই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত করে। তার ফলে কাশ্মীরে চোরা-হামলা বর্তমান রয়েছে—আর এই সবকিছুর মূলে রয়েছে পাকসেনা বাহিনী।

৪.৬ ব্যতিক্রমী সেনাপ্রধান

জেনারেল মোশারফ সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালে নতুন সেনাপ্রধান হিসাবে নিযুক্ত হল জেনারেল আসিফ কিয়ানি। সমগ্র বিশ্ব এবং পাকিস্তানবাসীকে অবাক করে দিয়ে—প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মোশারফের বিশ্বস্ত অনুগামী জেনারেল কিয়ানি ঘোষণা করে যে—তার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সংবিধান প্রাপ্ত তার যে দায়িত্ব দেশকে বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা তা পালন করবে। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন পাক-সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানের হয়ে থাকে। জেনারেল কিয়ানি সাধারণ নির্বাচনে সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে না বলে ঘোষণা করেন। এবং সরকারি অনুরোধ ছাড়া আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। জেনারেল কিয়ানির সেনাপ্রধান হিসাবে কার্যকাল অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল—সেনাবাহিনীর চিরাচরিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়ায়। জেনারেল কিয়ানির কার্যকালে—পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম কোন রাজনৈতিক দল পুরো সময় ক্ষমতা দিতে টিকে থাকতে পেরেছে—সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়ায়। জেনারেল কিয়ানির আমলে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—অ্যাবটাবাদে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আল-কায়দা প্রধান ওসামা-বিন-লাদেনকে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের মাটিতে আমেরিকান সৈন্যরা হত্যা করে। এর ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসাবে পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য। আর এই ক্ষেত্রে, পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই, মৌলবাদী সংগঠনগুলি যোগসাজ করে এই ঘটনাগুলি ঘটিয়ে থাকে। সম্প্রতি তালিবানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, তালিবান প্রধান মোল্লা ওমরের মৃত্যু হয়েছে। তালিবানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মোল্লা ওমরের মৃত্যু হয়েছে—পাকিস্তানে। সুতরাং এর ফলে অনুমান করা যায় যে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং সেনাবাহিনীর যোগসাজ। জেনারেল আসিফ কিয়ানি নতুন সেনাপ্রধান রাহিল শরিফের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর গ্রহণ করেছেন।

৪.৭ আন্তর্জাতিক প্রভাব

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার একদিকে ছিল আমেরিকা, অন্যদিকে ছিল—সমাজতন্ত্রিরা, সোভিয়েত ইউনিয়ন যার নেতৃত্ব প্রদান করেছে। দুই ভাগে বিভক্ত গোষ্ঠীরা তাদের মিত্র দেশের সন্ধানে নেমে পড়ে। আর সেই থেকেই পাকিস্তান মার্কিন নেতৃত্বে গঠিত Seato এবং Cento

তে যোগদান করে। এই মার্কিন সামরিক জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে পাক সেনাবাহিনীর অবদান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের এই মার্কিন সামরিক জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে ছিল—ভারতের দিক থেকে তার সুরক্ষা বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা। আর মার্কিন সামরিক সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাক সেনাবাহিনীর পক্ষে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের দরজা খুলে যায়। এর ফলে আমেরিকার স্বৈরতান্ত্রিক পাক জেনারেলদের সাথে বোঝাপড়া সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। জেনারেল আয়ুব খান ছিলেন—এই রকম একজন মার্কিন প্রেমী সেনাপ্রধান—যে পরবর্তী সময়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে।

১৯৭৭ সালে সেনাপ্রধান জিয়া-উল-হক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জুলফিকার আলি ভুট্টোর গণতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মার্কিন মদতপুষ্ট ছিলেন। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত যখন আফগানিস্তান দখল করে। তখন আমেরিকা জিয়া-উল-হকের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে যুদ্ধক্ষেত্র বানায় সোভিয়েত বিরোধীতার জন্য। আর এই যুদ্ধে পাকিস্থানি সেনাবাহিনী মুজাহিদিন গঠন করে—যা পরবর্তীকালে তালিবান নামক জঙ্গি সংগঠনে রূপধারণ করে। যা বর্তমান পাকিস্তানের সব থেকে বড় সমস্যা। এই একই আমেরিকান কৌশল বজায় ছিল পারভেজ মোশারাফের সময়। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে সন্ত্রাসবাদীদের নিধনের জন্য তখন মোশারফ ছিল আমেরিকার সব থেকে ঘনিষ্ঠ মিত্র। আর সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য বরাবরই আমেরিকা পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রদান করে গেছে নিঃশর্তভাবে। তার ফলে বরাবরই আন্তর্জাতিক প্রভাব পাক সেনাবাহিনীকে প্রভাবিত করেছে।

৪.৮ সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সরকারগুলি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পারার কারণে, জনগণ অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তার সুযোগ নিয়ে সামরিকবাহিনী—অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে গণতান্ত্রিকভাবে তাদের দায়িত্বপালনে সচেষ্ট হতে হবে। সাথে সাথে নাগরিক সমাজকে ও এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের চাপ তৈরি করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলির উপর যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে মানুষের ইচ্ছাগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং সেনাবাহিনী যাতে অসামরিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি কতখানি দায়ী? আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। মৌলবাদ ও পাকসেনার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। প্রাদেশিকতা পাক সেনাবাহিনীকে কিভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। পাক নাগরিক সমাজ কি পাক রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব বিস্তারকে সমর্থন জানায়? আপনার উত্তরের পক্ষে চারটি যুক্তি দিন।

২। পাক রাজনৈতিক দলগুলির বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন?

৪.১০ গ্রন্থ সূচী

1. Jalal Aysha , The State of *Martial Rule,* The *Origins of Pakistan's Political conomy of Defence.* New York : Cambridge University Press. 1990.
2. Kalia, Ravi, ed. *Pakistan : From the Rhetoric of Democracy of the Rise of Militancy.* New Delhi, Routledge Publication, 2011.
3. Leo E. Rose, Noor A. Husain, ed. *United States Pakistan Forum* : Relations *with the Major Powers.* Vanguard Books, 1987.
4. Magnus Marsden; *Living Islam–Muslim Religous Experience in Pakistan's North-West Frontier,* Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
5. Musharaf, Pervez, *In the Line of Fire : A Memori, New York, Free press, 2006*

একক ৪ □ পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা

একক - ৪ (খ) ইন্দোনেশিয়া ঃ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার আত্মপ্রকাশ

৪.৪ ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও রাষ্ট্রপতি সম্পাদিত শাসন ক্ষমতার বিস্তার

৪.৫ সামরিক বাহিনীর উচ্ছেদ ও পরবর্তী শাসনব্যবস্থা

৪.৬ সারসংক্ষেপ

৪.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৮ গ্রন্থসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল: —

- ভারত তথা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ইন্দোনেশিয়া নামক একটি শক্তিশালী দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন ও তার পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠন ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সাথে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক বিষয়টি অনুধাবন করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- ইন্দোনেশিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

৪.২ ভূমিকা

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে সহস্র দ্বীপের সমাগমে (১৭,৫০৮) এক বিপুল জনরাশি পূর্ণ (বিশ্বে চতুর্থ)

একটি অর্থনৈতিক ও সামরিক ভাবে সমৃদ্ধশালী দ্বীপরাষ্ট্র হল ইন্দোনেশিয়া। যারা আশিয়ান (ASEAN) এর প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং জি-২০ (G-20) এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরূপে বিশ্ব দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার দরুণ বিশ্বের অন্যান্য অনেক উন্নত দেশকেই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সামিল করেছে এবং সামরিক শক্তিকে জাহির করেছে।

তবে আজকের বা বর্তমানের এই ইন্দোনেশিয়া দেশটি একদিন হঠাৎ করে বিশ্ব রাজনীতির প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করেনি। শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া দেশটির পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই দেশটির প্রতি একটি আলাদা উৎসাহ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা দেশ তথা এশিয়া ও ইওরোপেও দেখা যায়। প্রাচীনকাল হতেই নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ীক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী ছিল। (ভারত ও চীনের সাথে পূর্ব হতেই বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বজায় ছিল)। জীব বৈচিত্রের এক বিপুল সমাগম ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হওয়ার দরুণ ভারত ও চীন ছাড়াও পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, জাপানিদের বাণিজ্যিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ফলে বিশ্বময় ঔপনিবেশিকতা ও পরাধীনতার কবল হতে ইন্দোনেশিয়াও রেহাই পাইনি। বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির আগমনের ফলে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় আর বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত থাকায় ইন্দোনেশিয়া সহজেই একটি বাণিজ্যিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ইন্দোনেশিয়ায় বাণিজ্যিক স্বার্থে দীর্ঘকাল প্রায় ৩৫০ বছর (১৬০২-১৯৪৫) পর্তুগীজরা ঔপনিবেশিক ঘাঁটি বজায় রেখেছিল। ১৯৪৫ সালে সুকর্ণ সামগ্রিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রপতি পদে নিজেকে ঘোষণা করে যে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার রেশ আজও বর্তমান রয়েছে যেখানে প্রথম দিকে সামরিক শক্তিকে প্রাধান্য দিলেও পরবর্তী সময়ে সামাজিকতা ও মানবিতকাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪.৩ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার আত্মপ্রকাশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ও পরিণতি ইন্দোনেশিয়ার সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় (রাষ্ট্রনেতাদের মননে) আলোড়ন সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল থেকে আরও জটিলতর হয়ে উঠলে তৎকালীন ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা (Nationalist Leader) সুকর্ণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের দাবী করে। ১৯৪৫ সালে জাপানকে সামরিকভাবে পরাস্ত করে ইন্দোনেশিয়াবাসীদের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করে এবং তার পরবর্তী সময় থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পর্তুগীজ বা ডাচদের সঙ্গে তিক্ত সামরিক যুদ্ধ ও কূটনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণ সামরিক সহযোগিতা ও তীব্র গেরিলা যুদ্ধের সমাগমে ১৯৪৯ সালে ডাচদের চিরতরে বিতাড়িত করে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ১৯৪৫ সালে জাপানকে পরাস্ত করে সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ায় যে সংবিধানের প্রস্তাবনা করেছিল তার পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৯৪৯ সালে ডাচদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করার পর। জাতীয়তাবাদী সুকর্ণ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও মহম্মদ হাট্টা উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়ে রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি পদে বহাল

হয়ে সুকর্ণ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রে যোগ্য শাসন ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহী হন।

৪.৪ ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও রাষ্ট্রপতি সম্পাদিত শাসন ক্ষমতার বিস্তার

ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও জাতীয়তাবাদী পন্থাকে সম্প্রসারিত করতে রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এক অভিনব সামরিক ব্যবস্থার আয়োজন করে। জাতীয় স্বার্থ, ঐতিহ্য ও সহযোগিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমগ্র জনগণকে সামরিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে সামরিক নজরদারি বহাল রাখে। ১৯৪৫ সালে সুকর্ণ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেও ১৯২৯ সালে রাজনীতিতে সুকর্ণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন সমসাময়িক অর্থাৎ ১৯৩০ সালের পর থেকেই স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের মননে জাতীয়তাবাদী সংগঠনও বিপ্লবের ধারাকে প্রবাহিত করে। এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে ভারতবর্ষ বিশ্ব দরবারে নিজস্ব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া বিশেষ ভূমিকা রাখে জাতীয়তাবাদী স্বার্থকে তুলে ধরার জন্য।

শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার জনগণকে জাতীয়তাবাদে উৎসাহিত, গণতান্ত্রিকতা, উদারতা, মানবিকতা, সামাজিক সাম্যতা এবং ঈশ্বর বিশ্বস্ততার উদ্দেশ্যে পঞ্চশীল নীতির প্রবর্তন করেন। এর দরুণ সুকর্ণ-এর হাত ধরে "Guided Democracy"-"নির্দেশক গণতন্ত্র" ইন্দোনেশিয়া মারফৎ বিশ্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিচালন গণতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা যুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা অর্থসহায়তা মূলক যে সাম্রাজ্য বিস্তারকারী নীতির বিস্তার ঘটিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই সুকর্ণ নির্দেশক গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিলেন। সুকর্ণ তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে "কনফ্রন্টাশী" নীতির প্রয়োগ ঘটাতে সামরিক দিককে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সুকর্ণ তার শাসন ব্যবস্থায় মার্কসবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ইসলামবাদকে প্রাধান্য দিয়ে একটি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিপূর্ণময় শক্তিশালী ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠনে উদ্যত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে সামরিক আইন জারি করে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে মানবিকতার খাতিরে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বিভাগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে জনগণের দায়বদ্ধতাকে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত করেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান অংশরূপে স্থলবাহিনীকে গুরুত্ব দেন এবং দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণকে স্থলবাহিনীতে যুক্ত হওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর হতে বিবেচনা করেন। এবং বাকী জনগণের অংশকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও নীতি নির্ধারণের জন্য উদ্যত করে বহুমুখী প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি রাখতে সম্মত করেন। দ্বীপ-রাষ্ট্রপুঞ্জ হওয়ার দরুণ সমগ্র দ্বীপগুলির সাথে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীকে বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করেন। দেশের সামরিক সক্ষমতার পরিচয় প্রদানে দেশের

বায়ুসেনাকে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে দায়িত্বশীলতা পূরণ করার কথা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৬৪ সালে জনগণের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে সামরিক বিভাগ হতে জাতীয় পুলিশ বাহিনীর আয়োজন করা হয় এবং এদেরকে বহুমুখী কাজের সাথে যুক্ত করা হয়। সুকর্ণ এই রাজনৈতিক সক্ষমতার পেছন সামরিক শক্তিকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি এটা বুঝেছিলেন যে রাষ্ট্র জয়ের ধারা যেমন সামরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় ঠিক তেমনি জাতীয়তাবাদী ধারাকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে সামরিক শক্তির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীলতা বজায় রাখেন। সামরিক শক্তি ব্যতীত তার কার্যকলাপ অব্যাহত হবে এই ভেবে সুকর্ণ রাজনীতির সাথে সামরিক শক্তিকে একজোট করে, সরকার এবং সামরিক শক্তির মলবন্ধন ঘটিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সুকর্ণ তার শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রদান করে একটি গ্রহণীয় সামরিক আইন জারি করে জাভা, সুমাত্রা, দক্ষিণ শালূএশী, একত্রিত করেন ও বহুদলীয় ব্যবস্তার প্রবর্তন করে গণতান্ত্রিক নেতার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালে ১৭ই অক্টোবর সুকর্ণ পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে যে কনফোন্টাশি নীতির মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নের ধারাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন তার সম্মুখে বিপুল বাধা দেখা দেয়। তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল, সামরিক খাতে ব্যয়ের বিপুলতা সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হয় যার দরুণ বিরোধীরা সুকর্ণর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলেছিল।

এই সুবাদে সামরিক বিভাগীয় প্রধান সুহার্ত নাটকীয় ভাবে ইন্দোনেশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করে সুকর্ণকে জোর করে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করা হয়। সম্পূর্ণরূপে সামরিক সহযোগিতায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সুহার্ত (Suharto) এক প্রকার সামরিক একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সামরিকভাবে সম্পূর্ণ ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক শক্তিকে হাতিয়ার করে মূলত স্বেচ্ছামূলক কার্যকলাপই সম্পাদন করেছিল। এই উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি ওফ ইন্দোনেশিয়াকে একত্রিত হওয়া থেকে সংযত রাখে, এবং গণহত্যা মূলক কার্যকলাপকে প্রসারিত করে। ঠান্ডা যুদ্ধকালীন এই সময়ে বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতা দখলের বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়দানে সুকর্ণ ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়েছিল তার পরিবর্তে সুহার্ত (Suharto) "New Order" বা নব নির্দেশ জারি করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের আশিয়ানের (ASEAN) সূচনার মাধ্যমে এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমির দরুণ সামরিকভাবে নিজের প্রতিপত্তির মাধ্যমে সুহার্ত (Suharto) নিজের আর্থিক প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত বজায় রাখে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে একপ্রকার সহয়োগিতা মূলক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চীন, মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিয়ে বিশাল অর্থনৈতিক (Great Economy) সমাহার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জনগণ ও প্রশাসনকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক বিভাগের বহু নেতাদেরকে তিনি প্রশাসনিক আওতাভুক্ত কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং একপ্রকার সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে ইন্দোনেশিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সামরিক শক্তির জোরে ইস্ট তিমর (East Timor) ও পশ্চিম নিউগিনিয়াকে (West New Gunia) ইন্দোনেশিয়ার সাথে সংযুক্ত করে ক্ষমতা বিস্তারে ব্রতী হয়ে ওঠে। উন্নয়ন স্বার্থে পরিকাঠামোর পরিবর্তন, অপরাধ প্রবণতা রোধ, মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোটার অধিকার, কর প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সুকর্ণ যে স্থায়ী ইন্দোনেশিয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সম্পূর্ণ রূপে বিবর্তন ঘটিয়ে সুহার্ত (Suharto)

একচেটিয়া দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপই জারি রেখেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের বন্দিকরণ বিরোধী দলকে অসংগঠিত রেখে একপ্রকার আগ্রাসী রাজনীতিরই পরিচয় দিয়েছিল। সম্পূর্ণ ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় সামরিক বাহিনীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে সরকারী আমলা ও মন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে ওঠে, যার দরুণ ১৯৯০ সালে যে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তার ঘোরতর ছায়া ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক সচ্ছলতাকে গ্রাস করে। সুহার্ত (Suharto) সামরিক প্রতিপত্তির দরুণ যে শক্তিশালী প্রভাব বজায় রেখেছিল তার দুর্বলতম দিকটি আর্থিক অসচ্ছলতার প্রকাশ পায়। ১৯৯৮ সালে এশিয়ান ফাইনান্স ক্রাইসিস এর মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীতে বিশ্ব জুড়ে যে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তা স্বৈরাচারী সুহার্ত (Suharto) নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এবং বিপুল দুর্নীতিমূলক কাজের সহিত যুক্ত থাকায় ১৯৯৮ সালে জনগণের দাবিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং এর দরুণ দীর্ঘকাল ধরে ইন্দোনেশিয়ায় যে সামরিক বাহিনীর প্রতিপত্তি বজায় ছিল তার অবসান ঘটে।

৪.৫ সামরিক বাহিনীর উচ্ছেদ ও পরবর্তী শাসন ব্যবস্থা

দীর্ঘকালীন সামরিক স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৮ সালে বাচার উদ্দিন জোসেফ "Golkar" "গোলকার দল" হতে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়ে সুহার্তের (Suharto) প্রচলিত গণতন্ত্রের বিবর্তন ঘটাতে উদ্যত হয়। ইস্ট তিমরকে ইন্দোনেশিয়া হতে মুক্ত করে আগ্রাসী মনোভাবকে বিসর্জিত করে। অজস্র রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করে বহুদলীয় ব্যবস্থা তথা বিরোধীদের প্রাধান্য দেন। জনস্বার্থে কল্যাণের উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়া বাসীর কাছে একটি উক্তি তুলে ধরেন—"ঠিক কর একদিকেই দৌড়ে যাবে না সর্বকালের জন্য।"

১৯৯৯ সালে বাচারউদ্দিন জোসেফের পরিবর্তে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং পার্টির হাত ধরে প্রথম নির্বাচনের মারফৎ আব্দুর রহমান ওয়াহিদ রাষ্টপতি পদে আসীন হয়ে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক শক্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা করেন। দুর্নীতি রোধ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি সচেষ্ট হন, কিন্তু বিচক্ষণতার অভাবে রাষ্ট্রপতি পদে দীর্ঘস্থায়ী হতে সক্ষম হননি।

আর্থিক উন্নয়নের জেরে সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় একত্রিত করতে এবং পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে ইন্দোনেশিয়া ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হাত ধরে সুকর্ণের কন্যা মেঘাবতি সুকর্ণপুত্রী ২০০১ সালের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হয়। রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হয়ে মেঘাবতি ইন্দোনেশয়াকে নব্য রূপে সংস্কার করতে ব্রতী হলেও ২০০২ সালে জামিয়া ইসলামিয়া দ্বারা বালি বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সামরিক ব্যবস্থাপনাকে সুহার্ত (Suharto) পরবর্তী সময়ে জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে পুনরায় বহাল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষ রাজনীতির প্রকাশ ঘটায়।

প্রতিশ্রুতি মারফৎ মেঘাবতি তার কার্যকারিতাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করতে অসমর্থ হলে ২০০৪

সালে সুশীলো বাম ব্যাং সরাসরি নির্বাচন মারফত ২০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি পদে বহাল হন। আর্থিক মন্দা, শাসনব্যবস্থার বিবর্তন ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার তাগিদে মুক্ত সরকার সহযোগিতা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে যোগ্যতার সাথে আসীন থেকে ইন্দোনেশিয়াকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পুনরায় তুলে ধরতে সক্ষম হন। সুশীলো বামব্যাং-এর পরিবর্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া মারফৎ রাজনৈতিক এলিট তথা সামরিক জেনারেল জকো উডোডো ২০১৪ সালে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছেন।

৪.৬ সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে সুকর্ণ যে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করেছিল তা নির্দেশক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের ঘুণাক্ষরে সুহার্তের শাসনকালে স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচীর হয়ে উঠলে ১৯৯০ সাল হতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমাগম ঘটিয়ে ১৯৯৮ সালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় যার ধারা বর্তমানেও বহাল রয়েছে। দ্বীপপুঞ্জময় রাষ্ট্র হওয়ার দরুণ জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্কের সহিত উদার মনভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। অর্থ-শক্তি-সামাজিকতার উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া মানবিকতার দিকটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে একটি অভিনব সমাজ ব্যবস্থার আয়োজন করেছে।

৪.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রপতি চালিত শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিন।

২। ইন্দোনেশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রভাব আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটি আলোকপাত করুন।

২। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী কি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী? — ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের জনস্বার্থমূলক পঞ্চশীল নীতির বিষয়বস্তুগুলি কি কি?

২। দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কের উল্লেখ করুন।

৪.৮ গ্রন্থসূচী

1. Marcus Mietzner, *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indinesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance.* Policy Studies 23, East-West Center, Washington.
2. Ikrar NUSA Bhakti, Sri Yanuarti and Mochamad Nurhasim: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia. CRISE,* University of Oxford.

পর্যায়-৩

তুলনামূলক রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত

একক-১ : বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার : এশিয়া ও আফ্রিকার নির্বাচিত রাষ্ট্রসমূহ

একক-২ : তুলনামূলক প্রেক্ষিতে নৃকুলগত (Ethnic) রাজনীতি : পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা

একক - ৩ : তুলনামূলক প্রেক্ষিতে ধর্ম এবং রাজনীতি : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

একক - ৪ : তুলনামূলক প্রেক্ষিতে নারীবাদী রাজনীতি : পশ্চিমী এবং অ-পশ্চিমী মতামত সমূহ

একক ১ □ বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার: এশিয়া এবং আফ্রিকার নির্বাচিত রাষ্ট্রসমূহ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ দক্ষিণ আফ্রিকা

১.৪ মিশর

১.৫ পূর্ব এশিয়া

১.৬ দক্ষিণ এশিয়া

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ—

- বিশ্বায়ন ও তার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সম্যক ধারণা দেওয়া।
- আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির উপর বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রভাব কিরূপ সে বিষয়ে জ্ঞানার্জন সহায়তা করা।

১.২ ভূমিকা

একটি ধারণা এবং প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহকে গুরুত্ব দেয়। এই বিশ্বায়ন শব্দটি "সমসাময়িক বিশ্বের আন্তঃসীমান্ত সংযোগের ক্রমবর্ধমান গভীরতা এবং বৈচিত্রকে" চিহ্নিত করে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বায়ন উৎপাদনের পুনর্গঠন,

বিশ্বজনীন কর্মীসংখ্যার নূতন বিভাজন ও তার পরিমাণ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, অর্থ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের তীব্রতা ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। এই সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের সাথে জড়িত রয়েছে স্থান পরিবর্তন বা migration, কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধার জন্য জনগণের নানান চাহিদা।

বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল উন্নয়ন, সীমানার মধ্যে সংযোগ এবং সংস্কৃতির রূপান্তরের ফলে বর্তমান বিশ্ব একটি বিশ্ব গ্রাম বা global village-এ পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই নিয়োগকর্তারা কর্পোরেট এবং বড় ব্যবসা শাখাগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বিশ্ব শ্রম বাজার ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে থাকছেন। ফলতঃ বিশ্বায়নের মূল নির্যাস নিহিত রয়েছে time-space compression-এর মধ্যে।

বিশ্বায়নের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে তিনটি মৌলিক মতামত রয়েছে। প্রথমতঃ কিছু পণ্ডিতদের মতে বিশ্বায়নের কারণে রাষ্ট্রের নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে এবং এর ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ম্লান হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়তঃ আরেক দল রাষ্ট্র কেন্দ্রিক প্রবক্তাগণ (state-centric scholars) বলেন যে, বিশ্বায়নের ভার এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত রাষ্ট্রের হাতে। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিশ্বায়নকে পরিচালনা করবে। পণ্ডিতদের তৃতীয়ঃ গোষ্ঠী একটি মধ্যবর্তী অবস্থানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্র কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি আবার কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলও হয়ে উঠছে। এর ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক শাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থা গঠন করার পাশাপাশি নানান সংগঠন গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে, যেমন—ইউরোপীয় ইউনিয়ন [European Union (EU)] এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা [World Trade Organization (WTO)] ইত্যাদি। এই সকল সংগঠনগুলি বিশ্বায়নের নানাবিধ প্রভাব ছড়িয়ে দিতেও সাহায্য করেছে। বিশ্বায়নের অবস্থাকে সামনে রেখে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেমন—United Nations Development Programme (UNDP), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), North American Free Trade Agreement (NAFTA) এবং Asia Pracific Economic Cooperation (APEC)।

বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি তাকে নানান চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। পূর্ববর্তী পূর্ব-পশ্চিমের আদর্শগত সংঘাতের পরিবর্তে উত্তর-দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে, উত্তরে ধনী 'have' জাতি-রাষ্ট্র এবং দক্ষিণে গরিব 'have not' জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে স্পষ্ট অর্থনৈতিক বিভাজন দেখা দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য, পরিবেশ এবং শ্রমিকদের অধিকারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল স্তরে নানান আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। আন্দোলনকারীরা বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্মেলনগুলিকে (যেমন WTO সম্মেলন) তাদের প্রতিবাদের প্রধান জায়গা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

বিশ্বায়নের নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে গিয়েছে যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কোনো দেশের পক্ষে বিশ্বায়ন থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে নাগরিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সাধারণ জনকল্যাণ প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। বর্তমানকালে ঐতিহ্যগত জাতীয় মডেলের অর্থনৈতিক শাসন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ একতরফা মেনে চলা সম্ভব নয়। বরং সরকার আজ AIDS, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সঙ্কট, এবং সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সকল বড় মাপের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছে। এই সকল সমস্যাগুলি কোনো না কোনো দিক থেকে বিশ্বায়নের সাথে জড়িত।

১.৩ দক্ষিণ অফ্রিকা

তিক্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হল বিশ্বের নবীনতম গণতন্ত্রের এক বিশেষ উদাহরণ। প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার—জাতি, ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ ও অর্থনীতির উত্তরাধিকারী ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে দেশের অর্থনীতি—সুবিশাল কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চাহিদা পূরণের দিকে তাকিয়ে তৈরি হয়নি। কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পরে মৌলিক শিক্ষা, বাসস্থান এবং চাকরির জন্য দাবি করতে থাকে।

কয়েক দশক ধরে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস সাক্ষী থাকলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা সবসময় প্রধানত একটি আফ্রিকান দেশ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৯৬ সালের জনগণনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় ৪০ মিলিয়ন জনসংখ্যার আনুমানিক ৭৭ শতাংশ আফ্রিকান, ১১ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ, ৯ শতাংশ রঙিন এবং ৩ শতাংশ এশিয়-র সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৯০ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পুনরায় প্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে জাতি ভিত্তিক বৈষম্য এবং জাতিবিদ্বেষ অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে দেখা দিয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে অত্যাধুনিক অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার অঞ্চলগুলিকে বিশেষ নজরে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি এবং স্টক মার্কেট), আধুনিক মহাসড়ক, দক্ষ রেলপথ, বন্দর, পাওয়ার গ্রিড, জল নেটওয়ার্ক, সুবিশাল সেচ খামার এবং চিত্তাকর্ষক পরিকাঠামোর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা কে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও অনেক জায়গায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন খুব প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু তবুও এই দেশ তার অবস্থা বজায় রাখার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে।

১৯৮০-র দশকে অর্থনীতি প্রায় স্থগিত হয়ে পড়লেও, ১৯৯৪ সালের পর তা পুনর্জাগরিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায় বদ্ধ প্রফিট মার্জিন থাকা সত্ত্বেও দেশীয় বাজারে বিনিয়োগ অর্থের পরিমাণ ছিল সুবিশাল। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বিশ্ব বাজারের সুযোগ সুবিধে তারা কাজে লাগিয়ে ব্যবসার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের তিনটি বছরের মধ্যেই,

কুড়ি বছরে এই প্রথমবার Gross National Product (GNP) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে গেছিল। আন্তর্জাতিক সহায়তার চেয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সংস্থানের জন্য সক্ষম ছিল, যার ফলে বিদেশী ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য দেশের মতো সংরক্ষণবাদ নীতি (policy of protectionism) বজায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা তার শিল্প এমনভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় যাতে তারা বৈদেশিক আমদানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যবসা দ্বারা পরিচালিত বিশ্বায়নের সাক্ষী ছিল এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment (FDI) এবং পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (portfolio investments) কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করেনি। ২০১১ সালের শুরুর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা বহুপাক্ষিক কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন—BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa)-এ যোগদান করে। এরপর ব্রিকস বিনিয়োগের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা আফ্রিকান মহাদেশের একটি প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে।

১.৪ মিশর

বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের আলোকে মিশরের অবস্থার বিশ্লেষণ করার জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়নের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯৫০-এর দশকের শুরুর দিকে মিশর একটি দুর্বল অর্থনীতি ছিল। বদ্ধ কৃষি ব্যবস্থা কেবল একক ফসলের (তুলো) উপর নির্ভরশীল ছিল; শিল্প বিকশিত হওয়ার কিছু সামান্য খনিজ সম্পদ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খুব সীমিত ভাগ এবং খুব অল্প মূলধন ছিল। এই সময়ে আধুনিক শিল্পগুলি বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে ব্যাপকহারে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা এক শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। অর্থনৈতিকভাবে বৈদেশিক নীতির চুক্তির কারণে মিশর নানানভাবে সমস্যাদীর্ণ ছিল। সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিমী দেশগুলির কাছে মিশরের অবস্থান ছিল 'black book'-এ কারণ আন্তর্জাতিক মহলে মিশর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর এক পেয়াদা রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬০-৬৫ সালের মাঝে নানান পরিকল্পিত উনয়নের প্রচেষ্টা করলেও কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি।

মিশর আরব বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের মধ্যে বিরোধী ইরাকি জোটে যোগদান করে এবং পশ্চিমী দেশগুলির তহবিলের একটি প্রধান সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে। বিদেশী বিশ বিলিয়ন ডলার ঋণ বন্ধ করা হলে, বিশ বিলিয়ন ঋণ পুনঃনির্ধারিত হয়। মিশর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে, যা বার্ষিক ২.১ বিলিয়ন ডলার থেকে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে মিশরের অর্থনীতি তেল রপ্তানি, প্রেরিত টাকা, খাল খাজনা এবং পর্যটন নির্ভর ছিল। দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ছিল ৫ শতাংশ, অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বল্প পরিমাণ বাজেট ঘাটতিও উপস্থিত ছিল। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

অপসারণ এবং বেসরকারিকরণের সাথে সাথে IMF-এর কাছে কিছু নির্দিষ্ট আপীল করা হয়। তবে একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ এবং দেশীয় সঞ্চয় বিক্ষিপ্ত ছিল। ভর্তুকি কমিয়ে আনার ফলে ধনী এবং গরিবের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকে, খাদ্যের দাম বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি সরকারি সেবা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে মিশরের অবস্থা স্থিতিশীল বলে মনে করা হত।

১.৫ পূর্ব এশিয়া

পূর্ব এশিয়া পুঁজিবাদী উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে উঠে এসেছে। চার টাইগার্স—হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাওয়ানের রপ্তানি চালিত অর্থনীতির শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে উদীয়মান বাজার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এই সকল দেশের বৃদ্ধির হার প্রতি বছর অধিক ৫ শতাংশ বজায় রাখা হয় এবং মাথাপিছু আয় পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের তুলনায় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬০-২০০০ সময়কালে দক্ষিণ কোরিয়ার GDP ভারত, ব্রাজিল এবং চীন থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পায়। এই পর্বে বসবাসকারী জনসংখ্যার দারিদ্র্যসীমার হার ৬০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০ শতাংশ হয়।

বিশ্লেষকরা যদিও এই বিষয়ে নানা মত দিয়ে থাকেন। যেমন—পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতাকে অন্য কোনো দেশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। নয়া-উদারবাদী অর্থনীতিবিদগণ পূর্ব এশিয়ার Newly Industrializing Countries (NIC)-এর খোলা পুঁজিবাদী অর্থনীতি, রপ্তানি ভিত্তিক পদ্ধতি এবং একটি শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী শ্রমশক্তি গ্রহণকে সমর্থন জানান। এই সকল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি NIC একটি অত্যন্ত উচ্চাবিলাষী উদ্যোক্তা বর্গ, উচ্চ সঞ্চয় হার, একটি ভাল উন্নত এবং কার্যকর অবকাঠামো থেকে উপকৃত ছিল।

একথা বলা প্রয়োজন যে, এই NIC-গুলি ঐতিহ্যগতভাবে অবাধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধীন ছিল না। এটা ১৯৫০ সালে শুরু হওয়া আদিবাসী এশিয়ান মডেল "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" ছিল। এই সরকার শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিরক্ষা এবং উৎসাহিত করেছে যতদিন না তা বিশ্ব প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত হয়েছে। একথা বলা হয় যে পূর্ব এশিয়ার NIC-সরকারগুলি রপ্তানি আক্রমণাত্মক একটি নীতি গ্রহণ এবং জাতীয় স্বার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করে। সুতরাং রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির চূড়ান্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ কোরিয়ার এবং তাইওয়ানীয় সরকার অগ্রাধিকার খাতে ঋণ বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। মূলতঃ এই সরকার কার্যকরভাবে বিনিয়োগ কৌশলের সহায়তার জন্য একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং বিশেষতঃ রপ্তানি শিল্পের অর্থনীতির প্রতি আহ্বান জানায়। ধীরে ধীরে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিতে অগ্রসরতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে পারে। এই সময় NIC গুলির সরকার বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ট্যাক্স প্রদান, ইউনিয়নগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ন্যূনতম মজুরি আইন সঙ্গে করে এক কঠিন লড়াই চালাতে থাকে। সুতরাং বহু বছর ধরে এই পূর্ব-এশিয়ার সরকার একনায়কতন্ত্রের ভূমিকা পালন করে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে চলে, যেখানে স্বৈরাচারী শাসন জাতীয়তাবাদী পরিচয় হিসেবে ব্যবহার করে মানবজাতির অনুরোধের জন্য কাজ ও উৎসর্গ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে সমাজকল্যাণ প্রক্রিয়া রোধ, পরিবেশের অবক্ষয়, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ত্যাগ করা হয় এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দমনমূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হতে থাকে।

সময়ের সাথে সাথে নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সম্মান জানিয়ে পূর্ব এশিয়ার NIC উন্নতি করেছে। আক্রমণাত্মক সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে উদীয়মান অর্থনীতি কিছু পণ্য বিশ্ব বাজার আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক পণ্য বিশ্বের বৃহত্তম উৎসে পরিণত হয়। এই অর্থনৈতিক সাফল্য আন্তর্জাতিক বাজারে একটি বড় ভাগ ধরে রাখায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যবসার সঙ্গে সরকারের অংশীদারিত্বকে দায়ী করা যেতে পারে।

১.৬ দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র্যতা, দুর্বল পরিকাঠামো, সুশাসনের অনুপস্থিতি, প্রসারণশীল দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সবকিছুর পাশাপাশি WTO পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থায় বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহ উদারনীতিকরণের সাথে অর্থনৈতিক সমস্যাও যুক্ত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অতিথি সাধারণভাবে বেসরকারিকরণের সেইরূপ কোন ইতিহাস ছিল না। কিছু পরিমাণে বেসরকারিকরণ উপস্থিত থাকলেও তা সব দেশের মধ্যে ছিল না। রাষ্ট্র পণ্য এবং পরিষেবার উৎপাদনের উপর জোর দেয়। এই সকল দেশে সরকার শক্তি, পরিবহণ, রেলপথ, ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একথা ঠিক যে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি অপেক্ষা দুর্বল। কিন্তু বিশ্বায়নের সাথে সাথে এই দেশগুলি তাদের অর্থনীতিকে জোরদার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার ঠিক পরে ১৯৪০ সাল নাগদ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি মুক্ত অর্থনীতি গ্রহণ করেছিল। শ্রীলঙ্কা ১৯৭৭ সালে উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করলে অন্যান্য দেশ শীঘ্রই এই পথ অনুসরণ করা শুরু করে। যদিও দেশ জুড়ে এই প্রক্রিয়া ছিল দ্বিধাগ্রস্ত এবং অসাম্য। ১৯৯০ সালে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে এই অঞ্চল উদারীকরণ গ্রহণ করে এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে লক্ষ্য ছিল বিরাট বাণিজ্যিক অগ্রগতি উদারীকরণের। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) গঠন করে। এটা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি আংশিক সফলতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষ এবং বিশ্বায়নের সূত্রপাতের সঙ্গে সার্ক তার

সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। উন্নত অর্থনৈতিক সহযোগিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্কভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার পণ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার-চুক্তি বা Sourth Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) স্বাক্ষরিত হয়। এই SAPTA প্রগতিশীল মুক্ত বাণিজ্যকে সহজতর করেছিল। ১৯৯৫ সালে ২২৬টি পণ্য দ্রব্যের উপর আলোচনা সূত্রে চুক্তিটি বলবৎ করা হয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে আরও ১,৯০০ টি পণ্য দ্রব্য এবং ১৯৯৬ সালে তা সম্পন্ন করা হয়। ভারত তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপাল দ্বারা অনুসরণ বিপুল পরিমাণ ছাড় দেয়, ২,৫০০ টি পণ্য দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত এবং ১৯৯৮ সালে সন্ধি পত্র লেখা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ ইন্ট্রা-সার্কভুক্ত দেশগুলোর দক্ষিণ এশিয়ায় অধিকাংশ অংশে বাণিজ্য ৩ শতাংশের কম হওয়ার জন্য দায়ী এবং ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে তা বেড়ে ৪ শতাংশ হয়। প্রাথমিকভাবে এই অঞ্চল জুড়ে একতরফা বাণিজ্য বৃদ্ধি উদারীকরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

সুরক্ষা নীতিকে সুদৃঢ় করতে ২০০৪ সালে South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০০৬ থেকে বলবৎ করা হয়। এই চুক্তি শুল্ক ও বাণিজ্যের ওপর বাধা অপসারণের জন্য এবং আঞ্চলিক সংহতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এর ফলে পারস্পরিক নিশ্চিত সুযোগসুবিধা ও পর্যাপ্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে যা ন্যায্য প্রতিযোগিতার এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। SAFTA-এর উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে Most Favoured Nation (MFN) -দের শনাক্ত করা। এই চুক্তি উন্নত এবং উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে শনাক্ত করে; যেখানে কম উন্নত দেশগুলিকে একটি অ-পারস্পরিক ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অঞ্চলগুলি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিরিখে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন দক্ষিণ এশিয়ার জাতি-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সহজতর হয়নি কিন্তু সাম্প্রতিক প্রবলতার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের খাতিরে তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত্যতা তৈরি হয়েছে। শিল্প বিকাশের প্রধান উৎস হিসেবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের বেসরকারি খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকে কার্যকর সংস্কারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ আর্থিক এবং পুঁজি বাজারের প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সকল অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি একটি বিশেষ নেতিবাচক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বায়নের যুগে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারের দৃঢ়তা এবং দুর্বলতা আলোচনা করুন।

২। একদিকে মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যদিকে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে এক তুলনামূলক আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বায়নের ধারণা এবং প্রক্রিয়ার ওপর একটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। টীকা লিখুন— (ক) SAPTA, (খ) SAFTA

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bratton, Michael (2000), 'South Africa'. In Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach (eds.), *Comparative Politics; Interests, Identities and Institutions in a changing Global Order,* Cambridge: Cambridge University Press.

২। Clavocoressi, Peter (2001), *World Politics: 195-2000,* New Delhi: Pearson.

৩। Caramani, Daniele (2008), *Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.*

৪। Green, December and Laura Luchrmann (2003), *Comparative Politics of the Third World: Linking concepts and Cases.* Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.

৫। Kesselman, Mark, Joel Kriger and Bill Joseph (2007), *Introduction to Comparative Politics.* Boston, MA: Houghton Miffin Company.

অনুবাদ সাহায্য: পূজা ভট্টাচার্য

একক ২ ❐ তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে নৃকুলগত (Ethnic) রাজনীতি : পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ পূর্ব ইউরোপ
২.৪ শ্রীলঙ্কা
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

- রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতিগত সংঘাত বা জাতিতত্ত্বমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার উপর আলোকপাত করা।
- পূর্ব-ইউরোপে রাষ্ট্রগঠনে জাতিতত্ত্ব ও জাতীয়তাবাদের ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করা।
- শ্রীলঙ্কার জাতি নির্মাণ ও জাতি বৈরীতার বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

২.২ ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি জাতিগত সংঘাত বা জাতিতত্ত্বমূলক আলোচনা করতে হয় তবে Donald Horowitz-এর লেখা *Ethnic Groups in Conflict* (১৯৮৫) গ্রন্থটি হল মৌলিক এবং প্রধান। ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৮০-র শেষ এবং ১৯৯০-র শুরুতে জাতিবিন্যাস (Ethnicity) এবং জাতিগত সংঘাতের (Ethnic Conflict) আলোচনা শুরু হয়। সনাতনী বাম-ডান

বিভাজন ব্যতিরেকে জাতিতত্ত্বমূলক ধারণা ক্রমশ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়মূলক, পদ্ধতিমূলকভাবে বিভিন্ন শৃঙ্খলায় এই জাতিগত রাজনীতি বৌদ্ধিক মহলকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে।

Horowitz-এর ধারণাকে মাথায় রেখে Ethnicity বা জাতিতত্ত্বকে এক ধরনের যৌথতা (collective belonging) বলা যেতে পারে। এই যৌথ চেতনা ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সাধারণ চেতনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যদিও একথা বলা প্রয়োজন যে কিছু তাত্ত্বিক ধর্মকে এই বিষয়টির বাইরে রাখতে চান। এবং তাদের মতে জাতিতত্ত্ব হল ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা নির্যাস। রাজনৈতিক সত্তা বা গোষ্ঠীগত বন্ধনের দিক থেকে দেখতে গেলে উক্ত সংজ্ঞা নিয়ে কোন আপত্তি থাকে না; কিন্তু পরিস্থিতি তখনই জটিল হয়ে ওঠে যখন জাতিতত্ত্বের সাথে ধর্মের সংঘাত শুরু হয়, উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১ সালের আগে পূর্ব-পশ্চিমে পাকিস্তান, কাশ্মিরি পণ্ডিতদের সাথে মুসলিমদের বিরোধের কথা বলা যায়।

এই আলোচনার তিনটি স্তর রয়েছে জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং জাতিতত্ত্ব। জাতি বলতে বোঝায় রাজনৈতিক ও ভূখণ্ডগত বাসস্থানকে। জাতীয়তাবাদ হল এক বিপুল জাতিগোষ্ঠী—যাদের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক বা ভূখণ্ডগত বাসস্তান নাও থাকতে পারে কিন্তু যারা কৃষ্টিগত, ভাষাগত এবং কখনও কখনও ধর্মগত দিক থেকে এক—Ethnic Group বা জাতিগোষ্ঠীও এই একই ধরনের Collectivity বা যৌথতাতে বিশ্বাস করে। কাজেই জাতিগোষ্ঠী জাতি অপেক্ষা পৃথক কিন্তু তাদের আবার জাতীয়তাবাদীও বলা যাবে না, উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৫ সালের পরে যুগোশ্লোভাকিয়ায় Croats, Macedonians, Serbs, Slovenes এবং Montenegrins কে জাতি বলা হত। অন্যদিকে ইউরোপে আলবেনিয়ান, বুলগেরিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ানরা ছিল জাতীয়তাবাদী এবং অষ্ট্রিয়ান, গ্রীক, জুস, জার্মান এবং পোলরা ছিল 'অন্যান্য জাতীয়তাবাদী এবং জাতিগোষ্ঠী'। তাছাড়া ১৯৭১ সালের সংবিধানে যুগোশ্লোভোকিয়ায় মুসলিমরা জাতীয়তাবাদী থেকে জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

জাতিগোষ্ঠী থেকে জাতিতে পরিণত হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হল ভূখণ্ডগত ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীরা কাজের সুযোগ, শিক্ষা বা নিছক রাজনীতির দিকে তাকিয়ে ভাষা, ধর্ম বা কৃষ্টির নিরাপত্তা দাবি করে। অন্যদিকে জাতিগোষ্ঠীগুলির আকাঙ্ক্ষা বা দাবিদাওয়াগুলিকে সার্বভৌমিকতা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েও মেটানো হয়, উদাহরণ স্বরূপ শিখদের দ্বারা খালিস্তানের দাবি, বাঙালি মুসলিমদের দ্বারা বাংলাদেশ গঠনের দাবি, শ্রীলঙ্কায় তামিলদের দাবি ইত্যাদির কথা বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে একটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যখনই ভূখণ্ডগত ব্যবস্থা এবং জাতিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে তখন তা বিশেষ গুরুত্ব পায় না।

যদিও একথা ঠিক যে বর্তমান বিশ্বে যতগুলি জাতিরাষ্ট্র আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জাতিগোষ্ঠী আছে—যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে। জাতিবিরোধ শুধুমাত্র জাতিতত্ত্ব বা বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তাবাদের

মধ্যে আটকে নেই; আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মূল চ্যালেঞ্জ হল ভূখণ্ডগত নির্দিষ্টতা (territoriality) নাগরিকত্ব এবং সার্বভৌমিকতা—যা তার চারিত্রিক বিশিষ্টতা বজায় রাখে।

২.৩ পূর্ব ইউরোপ

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের ঠিক আগে পূর্ব ইউরোপ তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতিগত টেনশনের মতো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছিল। এই সময় নানান জাতিগোষ্ঠী যারা দীর্ঘদিন একদলীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল তারা নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে। গোটা পূর্ব ইউরোপ জুড়ে জাতিগত জাতীয়তাবাদ (ethnic nationalism) শুরু হয়—যা চলতে থাকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত। এই জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের (ethno-nationalism) ঢেউ মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের মানচিত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সোভিয়েত প্রভাবে ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) স্বাক্ষর করে। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সদস্যের মতই চেকোশ্লোভাকিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক মডেল মেনে নেয়। ১৯৬৮ সালে গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে এবং একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল, যা সোভিয়েত সামরিক বাহিনী দ্বারা চাপা পড়ে যায়। ১৯৮০-এর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোয়িকার প্রভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

চেকোশ্লোভাকিয়া দুটি প্রধান জাতিগোষ্ঠী ছিল Czechs এবং Slovaks, এদের মধ্যে Czechs রা চেকোশ্লোভাকিয়ার উত্তরাংশে এবং Slovaks রা দক্ষিণাংশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সমগ্র জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ হল এই দুই জাতিগোষ্ঠী। যদিও এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে Czechs রা ৫১ শতাংশ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যদিকে Slovaks রা ছিল ১৬ শতাংশ। বাকি ৩৩ শতাংশের মধ্যে অন্যান্য জাতিসমূহ যেমন—ইউক্রেনিয়, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান এবং বোহেমিয়ানরা ছিল।

১৯৮৯-এর শুরুর দিক থেকেই ঐ দুই প্রধান জাতিগোষ্ঠী দুটি চেকোশ্লোভাকিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এই প্রতিবাদের রেশ তীব্রতর হতে থাকে এবং কমিউনিস্ট সরকার বাধ্য হয়ে অ-কমিউনিস্ট সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে। ইতিমধ্যে উত্তরাংশের আধিপত্য বিস্তারকারী Czechs-রা লেখক এবং রাজনীতিবিদ ভাক্লাভ হাভেল-এর নেতৃত্বে একটি সিভিক ফোরাম গড়ে তোলে। একই সময়ে দক্ষিণাংশে Public Against Violence (PAV) নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্লামেন্ট হাভেলকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে। তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সর্বপ্রথম অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপতি। এই ব্যবস্থার রূপান্তরটি ছিল যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ এবং সহজতর। এই রূপান্তরই পরবর্তীকালে Velvet Revolution নামে পরিচিত হয়।

১৯৯০ সালের জুন মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সাধারণ নির্বাচন হয়। উত্তরাংশের সিভিক ফোরাম এবং দক্ষিণাংশের PAV; উভয়ই জয়লাভ করে এবং এই একই বছর পার্লামেন্ট হাভেলকে রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত করেন। হাভেল পূর্বের কমিউনিস্ট নেতা মারিয়ান কালফা-কে প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত করেন। এই

নয়া সরকার নতুন নানান অর্থনীতিক সংস্কার গড়ে তোলে, যার মধ্যে প্রধান ছিল রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনীতি থেকে বেসরকারিকরণে রূপান্তরিত হওয়া। যদিও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই বৃহৎ চটজলদি পরিবর্তন নানান অর্থনীতিক এবং সামাজিক সংকট ডেকে আনে, যেমন—বেকারত্ব, দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক অসাম্যতা, মুদ্রাস্ফীতি। Slovaks জাতিগোষ্ঠী এই অর্থনীতিক সংকটের জন্য Czechs-এর নেতৃত্ব এবং তাদের আধিপত্যকে দায়ি মনে করে।

এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নানান ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট শাসনের ছত্রছায়ায় এক ধরনের ভারসাম্যমূলক পরিস্থিতির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া এগিয়ে চলেছিল। ১৯৯০-এর নির্বাচনের পরে বেকারত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, বিশেষ করে Slovak অঞ্চলে ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে Czechs অঞ্চলে যা ছিল মাত্র ২.৭ শতাংশ। এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে Slovak রা Czechs-এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে এবং অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে আলাদা রাজ্যের দাবি জানায়। এইরূপ দাবি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় ওঠে যে Slovak দের জাতিগত জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক বিষয়কে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছিল। পরে রাষ্ট্রপতি হাভেল Slovak-দের দাবিদাওয়াগুলি সাংবিধানিকভাবে মিটিয়ে নিতে চাইলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার সংসদ বাধ্য হয় পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নিতে।

১৯৯২ সালের জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনটির প্রধান বিষয় ছিল Slovak এবং Czechs এর জন্য পৃথক রাজ্যের দাবি। Czechs অঞ্চলের রক্ষণশীল দল CDP-র (Civil Democratic Party) Vaclav Klaus এবং অন্যদিকে Slovak অঞ্চলের Vladimir Meciar-এর MDS (Movement for Democratic Slovakia) জয় লাভ করে। রাষ্ট্রপতি হাভেল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে আগ্রহী হন। যদিও Meciar নিজে Slovak-এর পৃথক রাজ্যের দাবিতে অটুট থাকেন। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে Slovak National Assembly (Regional Legislature of Slovaks)-এই অঞ্চলের সার্বভৌমতা ঘোষণা করে। এই একই সময় জাতীয় পার্লামেন্টে Slovak সাংসদরা রাষ্ট্রপতি হাভেলের নয়া কার্যকালের প্রতি অনাস্থা প্রদান করেন। Klaus এবং Meciar-এর মধ্যে নানান আলোচনা হওয়ার পরে স্থির হয়ে যে চেকোশ্লোভাকিয়া বিভক্ত হবে। ১৯৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দুই নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে—Czech প্রজাতন্ত্র এবং Slovakia। চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে জাতিগত জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক অসাম্যতা। এই পৃথক রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠার পর্যায়টি ছিল যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ যা আলাপআলোচনাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে।

পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয়তাবাদ চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পরে নানান জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী গৃহ যুদ্ধ হতে থাকে। Josip Broz Tito-এর মৃত্যুর পর জাতিগত সংঘাত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে Federal Republic of Yugoslavia (FRY) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মোট ছয়টি প্রজাতন্ত্র যথা—Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia এবং Slovenia নিয়ে গড়ে ওঠে।

এদের মধ্যে সার্বিয়ার অধীনে দুই স্বাতন্ত্র্য অঞ্চল—কসবো এবং ভজভডিনা (Kosovo and Vojvodina) উপস্থিত ছিল। ১৯১৮-৪১ সময়কালে যুগোশ্লাভিয়ায় রাজতন্ত্রের শাসন, ১৯৪১-৪২ নাৎসি শাসনের অধীনে ছিল। ১৯৪৩ সালে রয়াল গভর্ণমেন্ট তৈরি হয়। টিটো'র দ্বারা Democratic Federal Yugoslavia সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ১৯৪৩ সালের মধ্যকাল পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে টিটো আধিপত্য গড়ে তোলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে FRY প্রতিষ্ঠিত হয়। টিটো দীর্ঘ ৩৫ বছর (১৯৪৫-১৯৮০) যুগোশ্লাভিয়ায় তার শাসন কায়েম রাখেন; তার শাসনকালে নগরায়ণ এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নানা উন্নতি ঘটে। যুগোশ্লাভিয়া non-aligned আন্দোলনের সপক্ষে থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ইমেজটি বজায় রেখেছিল।

যুগোশ্লাভিয়া নানান জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করত। যেমন ১৯৯১ সালের জনগণনাকে সামনে রেখে দেখা গেযে যে ২০ শতাংশ ক্রোয়টরা (Croats) ক্রোয়েশিয়ার বাইরে বিশেষ করে বসনিয়া এবং ভজভডিনায় বসবাস করছে। ঐ একই জনগণনায় দেখা গেছে যে—৪৪ শতাংশ বসনিয়ানরা নিজেদের মুসলিম, ৩১ শতাংশ সার্বস (Serbs), ১৭ শতাংশ ক্রোয়াটস (croats) এবং মাত্র ৫ শতাংশ নিজেদের যুগোশ্লাভিয়ান বলে পরিচয় দেয়।

জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মূলতঃ ভাষা এবং ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ দেখা যায়। FRY-এর প্রতিষ্ঠা হওয়ার কাল থেকে বিকেন্দ্রীকরণ কাল পর্যন্ত মোট তিনটি প্রধান আনুষ্ঠানিক ভাষা ছিল—Serbo-Croation, Slovenian এবং Macedonian। এই সকল ভাষার মধ্যেও আবার নানান অক্ষর ও বর্ণ বিশেষে ভেদাভেদ দেখা যেত। ধর্ম ছিল আরেক বিশেষ দিক। Serbs, Macedonian Slavs এবং Montenegrins ছিলেন গোঁড়া খ্রিস্টান, অন্যদিকে Croats এবং Clovenians ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। মুসলিমদের মধ্যেও বিভাজন দেখা যেত—Albanian Muslims এবং Muslim Slavs-রা নিজেদের সুন্নি, বাকিরা নিজেদের শিয়া বলে দাবি করত।

টিটোর শাসনকালে একদলীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পৃথকীকরণের (separatism) বিষয়টি দমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে তার মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশ্ন ওঠে। যারা নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ছিলেন তারা তাদের নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ নিয়ে উৎসাহী ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই নেতৃত্বের অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও নানান উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে বাধা দেখা যায়। ছয়টি প্রজাতন্ত্রের প্রধানরা একে অপরকে দোষারোপ করতে লিপ্ত হয়। উন্নত অঞ্চল যেমন ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়া অন্যান্য অঞ্চলগুলির ওপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেয়।

১৯৮৮ সালে সার্বের জাতীয়তাবাদী নেতা Slobodan Milosevic স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় সার্বদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। যারা সার্ব ছিল না তাদের মধ্যে তিনি এক ভীতির সৃষ্টি করেন। তিনি কসবোর স্বাতন্ত্র্যতা বাতিল করে দেন। কসবো, বসনিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় জাতিগত সংঘাত। ইতিমধ্যে ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়া মনে করত যে মিলোসেভিকের অত্যধিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব তাদের স্বার্থের ক্ষেত্রে

বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই ১৯৯১ সালের ২৫শে জুন গণভোটের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা অর্জন করে। পরে বসনিয়া এবং ম্যাকসেদনিয়াও এই বছর শেষের দিকে স্বাধীনতা অর্জন করে, যা ১৯৯২ সালে European Community (EC) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তবে এই স্বীকৃতি লাভের পরে জাতিগত সংঘাত দেখা যায় এবং উভয় সার্ব, ক্রোয়াটস এবং মুসলিমদের মধ্যে একটি ভয়ানক গৃহযুদ্ধ ঘটে। রিপোর্ট করা হয়েছিল যে জাতিগত নির্মূল এবং গণহত্যা ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে। শত্রুতার তিন বছর পর ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং বসনিয়ার নেতাদের দ্বারা DAYTON শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে মিলোসেভিচ পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়ার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো, এবং আইনত যুগোশ্লাভিয়া বিভেদ গ্রহণের একটি প্রয়াসে FRY হিসেবে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো ঘোষণা করেন। তবে জাতিসংঘ, EC এবং একাধিক অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার "উত্তরাধিকারী" হিসাবে সার্বিয়াকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে ২০০৩ সালে FRY সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো—উভয়ের নতুন নামকরণ করা হয়। সবশেষে স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো—এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া বিভক্ত হয়। কসোবোর স্বাধীনতা বিভিন্ন দেশ দ্বারা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সার্বিয়া থেকে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কসোভো, সার্বিয়া এবং রাশিয়া তার অবস্থান নিয়ে অত্যন্ত বিতর্কিত হয়ে ওঠে।

২.৪ শ্রীলঙ্কা

সিংহল (১৯৭২ সালে সিংহলের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কা নামকরণ করা হয়) ভারত ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে ১৯৪৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। তার প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় একটি উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল যথেষ্ট মসৃণ। সিংহল প্রধান জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ছিল সিংহলি এবং তামিলরা। এছাড়া ছিল মুসলিম এবং বুরগাররা। ২০০১ সালের সরকার জনগণনা অনুযায়ী দেশের ৮২ শতাংশ বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী হল সিংহলিরা এবং ৯.৪ শতাংশ হল তামিলরা।

সিংহলি ও তামিলদের মধ্যে উত্তেজনার কারণ ঔপনিবেশিক আমলে তামিলদের প্রতি ব্রিটিশদের পক্ষপাতিত্ব চর্চা বলে অভিহিত। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সিংহলি তামিল বাগানের শ্রমিকদের নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে সিংহলা কে রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা ঘোষণা করে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রচলিত বিশ্বাস সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি সম্প্রদায় থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী D. S. Senanayake হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংখ্যালঘুদের সমর্থনও অর্জন করেছিলেন। সিংহলি-তামিল জাতিগত সংঘাতের প্রক্রিয়াটি স্বাধীনোত্তর রাজনীতির মাধ্যমে সূচনা হয়। এইভাবে প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যতীত সিংহলি নেতাদের বৌদ্ধ ধর্ম এবং সিংহলী ভাষার ভিত্তিতে একটি জাতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এইসব মিলিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী সিংহলি এবং তামিল নেতাদের জন্ম দিয়েছিল যারা জাতিগত সংহতির রাজনীতিতে যোগ দেয়।

শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ এসেছিল সিংহলিদের থেকে। ১৯৭১

সালের এপ্রিল মাসে Janatha Vimukhthi Peramuna (JVP) হতাশ শিক্ষিত এবং সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত সিংহলি চাহিদাকে সামনে রেখে বিদ্রোহ উত্থাপিত করে। বিক্ষোভটি দমিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু এই প্রতিবাদ বদ্ধ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আলোকপাত করে। ১৯৭২ সালে সিংহলি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের অন্যতম সরকারি নাম পরিবর্তন করে শ্রীলঙ্কা করে এবং রাষ্ট্রের প্রাথমিক ধর্ম করা হয় বৌদ্ধধর্মকে। এই পরিবর্তন এশিয়ার ইতিহাসে এক দীর্ঘতম গৃহযুদ্ধ তৈরি করে।

তামিলরা সবসময় সিংহলি রাজনীতিকে এমনভাবেই দেখেছিল যে সিংহলি সরকার তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কখনই পূরণ করতে চায়নি। এই বিরোধ ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৭৬ সালে তামিলরা একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানায়। ১৯৪৮-৫৬ সময়কালে দেখা যায় যে তামিলরা প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতার এবং সুষম প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছে। ১৯৬৭-৭২-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি উঠে আসে এবং ১৯৭৩-৭৬-এর সময়কালে একধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব তৈরি হতে দেখা যায়। ভাষা, শিক্ষা, ভূমি উপনিবেশ স্থাপন, ধর্ম এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা, এলাকায় বৈষম্যমূলক আইনসমূহ এবং নীতি সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল এবং ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে শ্রীলঙ্কার তামিলরা নিজেদের একটি পৃথক জাতি হিসেবে একটি পৃথক রাষ্ট্র সংজ্ঞায়িত করা শুরু করে Bandaranaike-Chelvanayakam চুক্তি (১৯৫৭) এবং Senanayake-Chelvanayakam চুক্তি (১৯৬৫) দ্বারা তামিল এলাকাগুলিতে সীমিত স্বায়ত্তশাসন আনা হয়। ১৯৭৬ সালে ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের নেতৃত্বে Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) গড়ে ওঠে। এই শক্তিশালী LTTE তামিলদের জন্য উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কায় পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকে। একথা বলা হয় যে এই LTTE প্রোগ্রামটি তামিল অভিবাসীদের দ্বারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয়। এটি একটি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে; আত্মঘাতী বোমা, শিশু সৈন্যদের নিয়োগ, এবং শ্রীলঙ্কার দ্বীপ পূর্ব পাশ দিয়ে নিচে উত্তর জাফনা উপদ্বীপের থেকে শ্রীলঙ্কার বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে।

২০০২ সালে টাইগার্সরা Katunayake বিমান ঘাঁটিতে বেশ কিছু সংখ্যক বিমানকে বিনষ্ট করে তাদের সামরিক ক্ষমতা প্রকাশ করে। এই সময় এও মনে হয় যে এইভাবে সামরিক শক্তি প্রদান করে টাইগার্স বা শ্রীলঙ্কার সরকার উভয়েই তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে না। এর ফল হিসেবে ২০০২ সালে মধ্যস্থতা নীতি মেনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। LTTE-কে রাজীব গান্ধীর হত্যার জন্য দায়ী করা হয়। মুসলমানদের জাফনা উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিশুর ব্রিগেডে নিয়োগ করার ফলে LTTE এবং তার নেতা প্রভাকরণ প্রতি বিকর্ষণমূলক ধারণা তৈরি হতে থাকে।

২০০৫ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে Sri Lanka Freedom Party-র মাহিন্দা রাজাপাকসে (SLFP) একটি বিরাট মার্কসবাদী Janatha Vimukthi Peramuna দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদী Jathika Hela Urumaya (JHU, National Heritage Party) সঙ্গে মিত্রতা করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি জোট প্রতিষ্ঠা করেন।

২০০৬ সালে LTTE নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়; ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রকে দেওয়া মূল্যবান সহায়তা ইত্যাদি চতুর্থ ইলম যুদ্ধ ডেকে আনে। ২০০৭ সাল থেকে শ্রীলঙ্কা সরকার

LTTE বিরোধী প্রচার শুরু করে এবং দেশের পূর্ব প্রান্তের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছিল। শাসক জোট সরকারপন্থী Tamil Organization Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP)-এর সঙ্গে একটি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে এবং ২০০৮ সালের মে মাসে নির্বাচনের পর নব নির্মিত পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই দলের নেতাকে নিযুক্ত করে।

২০০৯ সালের প্রথমদিকে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে LTTE-এর প্রচলিত সামরিক ক্ষমতা মূলত বিচূর্ণ হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের সমাপ্তি ঘটেছে।

শ্রীলঙ্কায় জাতিগত উত্তেজনার কারণে তৈরি শত্রুতার পরিস্থিতি মানবাধিকার সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা খারাপ মানবিক সংকট বলে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ফিরে আসলেও বিধ্বংস প্রভাব রয়ে যায়। আস্থার সংকট অপসারণ করে জাতিগত পুনর্মিলন সম্পর্কে প্রত্যাশী বর্তমানে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ণ এবং ন্যায় বিচারের উপর দৃষ্টিপাত করেছে।

২.৫ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট থেকে শ্রীলঙ্কায় জাতিগত বিবাদকে বিশ্লেষণ করুন।

২। পূর্ব ইউরোপে রাষ্ট্রগঠনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। পূর্ব ইউরোপে জাতিগত রাজনীতির সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

২। শ্রীলঙ্কার জাতি বিবাদের কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। টীকা লিখুন— (ক) জাতি (খ) জাতীয়তাবাদ

২। "Velvet Revolution" বলতে কি বোঝেন ?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। Clavocoressi, Peter (2001), *World Politics: 1945-2000*, New Delhi: Pearson.

২। Chatterjee, Aneck (2010), *International Relations Today: Concepts and Applications*. New Delhi: Pearson.

৩। Varshney, Ashutosh (2007). 'Ethnicity and Ethnic Conflict'. In Carles Boix and Susan C. Stokes (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. Oxford University Press.

অনুবাদ সাহায্য : পূজা ভট্টাচার্য

একক ৩ ☐ তুলনামূলক প্রেক্ষিতে ধর্ম এবং রাজনীতি ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ পশ্চিমের অভিজ্ঞতা

৩.৪ পূর্ব এশিয়া

৩.৫ মধ্যপ্রাচ্য

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল :—

- তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।
- পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মের প্রভাব বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।
- পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মের প্রকৃতি ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

৩.২ ভূমিকা

ধর্ম সবসময় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধর্মকে সভ্যতার একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে ধরা হয়। ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, এইগুলি হল—

- প্রথাগত খ্রিস্টান, ইসলামী এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার বৈধ উৎস হিসাবে ধর্মকে দেখা হয়েছে।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়ে থাকে; যেমন—পোল্যান্ড বা ইরানের ক্ষেত্রে এরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।
- বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি বহুত্ববাদী ধর্মীয় সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।
- বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশ্ব সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা দেখা যায়।

বিশ শতাব্দীতে একটি সাধারণ বিশ্বাস তৈরি হয় যে, নয়া শতাব্দীর সূচনার ফলে ধর্ম লোপ পেয়েছে এবং তার পরিবর্তে উন্নত দেশ জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবেশ ঘটেছে। মনে করা হয়েছিল যে সরকার এবং রাজনীতি ধর্মের প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠবে। যদিও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ১৯৯০-এর দশকে একটি ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা যায়। তাত্ত্বিক হান্টিংটন বলেন যে, ধর্ম মানুষকে পরিচালিত এবং প্রেরণা প্রদান করতে সক্ষম হয়। তিনি ধর্মীয় পুনরভ্যদয়কে "নিয়োগ" (recruitment) এবং আংশিকভাবে ধর্মীয় ঐতিহ্যের "পুনরুজ্জীবন" (re-invigoration)-এর উপর ভিত্তি করে দেখেছিলেন। পুনরুজ্জীবন ধারণা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ধর্ম সম্ভবত রাজনৈতিক সংহতি একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। ইরানের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়—যেখানে ইসলামী কর্মীদের নেতৃত্বে শক্তিশালী বিপ্লব গড়ে উঠেছিল; রাজা শাহ-র পরিবর্তে আয়াতুল্লাহ খোমেনী (একজন ধর্মীয় নেতা)-কে নিয়োগ করা হয়। যদিও বর্তমান ইরান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে কিন্তু কিছু কিছু ইসলামিক দেশ এখনও সেই ইরানী বিপ্লবের প্রতিলিপি নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে। ভারতে ১৯৯০-এর শুরু থেকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ব্র্যান্ডের সূচনা হয়, একজন হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা হিন্দু পুরাতত্ত্ব অনুযায়ী একটি মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য অনুগামীদের সঙ্গে একটি দশ হাজার কিলোমিটার যাত্রা করেন। এই ধরনের পদক্ষেপ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিতর্কের এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। অবশেষে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ষোড়শ শতকের মসজিদটি গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী কর্মী দ্বারা ধ্বংস করা হয় এবং দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হান্টিংটন তার Clash of Civilizations-এর ধারণায় প্রাথমিকভাবে ধর্মকে একটি কেন্দ্রীয় স্থান দেন এবং এর পাশাপাশি বিশ্বের প্রথমসারির সভ্যতার মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের পূর্বাভাস অনুভব করেন। এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে ধর্ম বিশ্ব রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে এবং এই প্রভাবকে কোনভাবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

তুলনামূলক রাজনীতির গবেষণায় ধর্ম-রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমতঃ তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ঐতিহ্য একটি বিকল্প পরিচয় তৈরি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইসলামের ক্ষেত্রে বলা যায় এক মুসলিম নাগরিকদের এবং মুসলিম সংখ্যালঘু জাতির একটি বড় অংশ গঠন করে জাতির রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে

কিভাবে গোঁড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চাহিদা মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে রাজনৈতিক শাসক মহলে আলোচনা চলছে। ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক শাসন ও তাদের বৈচিত্র্যের বিষয়ে হিন্দু থেকে একেশ্বরবাদী খ্রিস্টান, ইহুদি, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম এবং অ-ঈশ্বরবাদ বা আস্তিকতা ধর্মের ছোটো উপাস্য এমনকি সংখ্যা সংক্রান্ত পৃথক ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ—গোঁড়া, প্রোটেস্ট্যান্ট ও মুসলিম মুমিনদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি, খ্রিস্টান রোমান ক্যাথলিক), তাদের অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিত মহলে একটি চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। অন্যদিকে রাজনৈতিক শাসন রাষ্ট্র প্রকৃতি ও সমাজের অন্যান্য দিককে সামনে রেখে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, রাজতান্ত্রিক শাসন প্রভাবশালী এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় দলের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে বলে মনে করা হয়। সুতরাং ধর্ম ও রাজনীতি তুলনামূলক গবেষণার একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে একটি দৃষ্টিভঙ্গির উপর দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনের চেয়ে স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়কে বিশেষ উৎস হিসেবে ধরা হয়। ধর্ম ভিত্তিক শাসন ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ—উভয় দিক থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ও সম্পূর্ণতা নিয়ে নানান জটিলতা উঠে আসে। সুতরাং ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের একটি সম্ভাবনা তৈরি করে দেয় যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৩.৩ পশ্চিমের অভিজ্ঞতা

বিশেষজ্ঞরা এমনভাবে 'পশ্চিম' শব্দটিকে একক রূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন যেন তা সমসময় ঐক্যবদ্ধভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু 'পশ্চিম' এর মধ্যে মেরুকরণ দৃষ্টান্ত এবং পার্থক্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে সামাজিক স্তরবিন্যাস; রাজনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হয়ে জনসংখ্যার নিরিখে নীল এবং লাল যুক্তরাষ্ট্রে ভাগ করা হয়। গীর্জা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও যোগাযোগ বাহিনী ব্যবহার করত। তবে ২০০৪ সালে রাষ্ট্রপতি প্রচার দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাটস উভয় ক্যাথলিক মান প্রতিনিধিত্বতার দাবি করে। প্রথাগতভাবে রিপাবলিকানরা সংকীর্ণ ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত ছিল—গর্ভপাত এবং সমকামী বিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে তারা কথা বলেন। অন্যদিকে ক্যাথলিক সামাজিক শ্রম থেকে উপকৃত ডেমোক্রাটসরা হিস্পানিক ও এশিয়ান ক্যাথলিক অভিবাসন প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং বরাবর আন্তর্জাতিকতাবাদী পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী, ক্যাথলিক, মার্কিন পদ্ধতিবাদী (United Methodists), প্রেসবাইটেরিয়ানসরা (Presbyterians), এপিস্কপালিয়ান্স (Episcopalians), ইউনাইটেড চার্চ অফ ক্রাইস্ট (United Church of Christ), আমেরিকান ধর্মে দীক্ষিত (American Baptists), এবং এককেন্দ্রিকতাবাদিরা (Unitarians) প্রগতিশীল সামাজিক অবস্থান ভোগ করত। এই গোষ্ঠীগুলি সামাজিক ধর্মীয় বাম নীতি গঠন করে। এছাড়া নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সময় ঐতিহ্যগতভাবে ব্ল্যাক চার্চ যেমন— African Methodist Episcopal Church সঙ্গে জোট গঠন করা

হয়। আফ্রিকান আমেরিকানদের ডেমোক্রেটিক পার্টি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখে। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সময় ব্ল্যাক চার্চ সামাজিকভাবে প্রগতিশীল অবস্থান গ্রহণ করে এবং Congress of National Black Churches (CNBC) গঠন করা হয়। CNBC সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্র হিসেবে কালো গির্জা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। ইউরোপে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা মহাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। একটি সাধারণ ঐক্যমত্যতা গড়ে ওঠে। তবে, রাজনৈতিক ঐক্যমত্যতায় কিভাবে পৌঁছানো যাবে তা নিয়ে সকলে একমত হতে পারেনি। একদিকে Europcan Union (EU) অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ঐক্যমত্যতার পক্ষপাতীত্ব এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে তার প্রসার দেখা যায়। গণতান্ত্রিক খ্রীস্টানদের সাথে সাংস্কৃতিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট জাতির এক বিভাজন গড়ে ওঠে। একটি আমলাতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে EU-এর অধীনে ইউরোপ একীকরণ করার চেষ্টা করা হয়। ইউরোপে ধর্মীয় একমেরুপ্রবণতা বেশ কিছু সময় পর্যন্ত উপস্থিত ছিল, উদাহরণস্বরূপ, ক্রোয়াটিস এবং বসনিয়ার উপর মিলোসেভিচের আক্রমণ EU সদস্যদের খণ্ডিত প্রতিক্রিয়া উঠে আসে। ক্যাথলিক স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে জার্মানির প্রথাগত সংযোগ থাকায় প্রাথমিকভাবে তাদের স্বাধীনতা সমর্থন করা হয় কিন্তু পরে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জার্মানির একীকরণের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের থেকে সার্বিয়া সমর্থন লাভ করে। পশ্চিমের রাষ্ট্রে ধর্ম ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় যা দেখে রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। EU ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আইনি অবস্থা দৃঢ় করেছে। EU-এর মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিভাজন তৈরি হয়েছে কিন্তু EU-এর ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষতার রেশ বজায় থাকে। এই উত্তেজনা গোঁড়া ক্যাথলিক ও গোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এবং ইহুদী, খ্রীস্টান, মুসলমান এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে চলতে থাকে। EU-এর মধ্যে ইউক্রেন, রাশিয়া এবং তুরস্কের সংযোজনের জন্য সমস্যাটির একটি ধর্মীয় ছাপ তৈরি হয়। এমনকি অভিবাসনের (immigration) মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় উঠে এলেও সমর্থন বিভক্ত রয়ে যায়। জাতীয় পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অভিবাসন এবং জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে সমর্থন করে। কিন্তু ''Un-churched'' ক্যাথলিক, ফ্রান্স, গোঁড়া রাশিয়ানরা এবং জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্টরা একটি নিছক স্বজাতীয় অবস্থান গ্রহণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা আইনগতভাবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড কম ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ইউরোপ অপেক্ষা ধর্মীয়ভাবে সক্রিয় ছিল। কানাডায় ধর্ম নির্বাচনী দলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক (variable) এবং সাংগঠনিক ও আর্থ-সামাজিক নির্ণায়ক অপেক্ষা ধর্ম অনেক ভালো রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন নির্দেশ করে থাকে। নিউজিল্যান্ডে চার্চ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে ''unequal codependency'' পরিলক্ষিত করা যায়। এই দেশে মূলতঃ দুটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—Christian Heritage Party এবং The Christian Democratic Party। ধর্মীয় দলগুলোর উপস্থিতি সত্ত্বেও শ্রম বা

জাতীয় দলসমূহের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। তাই আমেরিকান ও ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মধ্যে অ্যাংলো দেশের ঐতিহ্যকে একটি মধ্যম পথ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

৩.৪ পূর্ব এশিয়া

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর চীন, জাপান, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অর্থে বিশ্বের সবচেয়ে দ্বিতীয় শক্তিশালী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলিকে যেখানে স্বায়ত্তশাসিত ও রাজনৈতিকভাবে জড়িত ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, অন্যদিকে পূর্ব এশিয়ায় কনফুশিয়ান, মাওবাদী ফোরাম ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃথক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক বৈধতা দেখা যায়। এছাড়া কোরিয়া ও তাইওয়ান স্থানীয় বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। বৌদ্ধধর্ম ও কনফুশিয়বাদ (Confucianism) এই অঞ্চলে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেললে, চীনা জনগণের একটি বড় অংশ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত লক্ষ্যপূরণ এবং বিশ্বাসের জন্যে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নেটওয়ার্কে পরিণত হয়। কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি দ্বারা বংশ এবং গ্রামের সামাজিক সম্পর্ক চাঙ্গা করতে এবং যারা দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভুগছেন তাদের জন্য একটি আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ফলে ভুগছেন তাদের জন্য একটি আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব চীনা লোকধর্মে পড়েছিল, এবং হান চীনবাসিদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম অনুমোদন করা হয়। চীনে হান বৌদ্ধ এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পর্কে রাষ্ট্র নেতৃত্বের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ গঠন করে। বিশ্বের ধর্মের সঙ্গে PRC-এর সম্পর্ক Religious Affairs Bureau (RAB)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিব্বত এবং জিনজিয়াং প্রদেশে পার্টি কর্মকর্তারা জাতিগত ও জাতীয়তার হুমকি হিসেবে বৌদ্ধ এবং ইসলাম বোঝা চাপায়। এছাড়াও বেইজিং সামাজিক নীতিতে অ-হান জাতীয়তার কিছু ছাড় দেওয়ার জন্য পরিচিত হয়। রাশিয়া এবং অন্যান্য মধ্য এশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তবর্তী এলাকায় জাতিগত গোষ্ঠীর একই ধরনের স্বার্থ সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। চীনের লোক ধর্মের মতো চীনের মধ্যে ক্যাথলিক মূলতঃ গ্রামীণ যা সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটি প্রদর্শন করে। এই উপদলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্র নির্যাতনের হাত থেকে ক্যাথলিকদের রক্ষা করতে সাহায্য করে। কিন্তু তারা ক্যাথলিকদের মুক্ত নাগরিক সমাজে যোগদানে উৎসাহিত করে না। চীনে দশ থেকে বারো মিলিয়ন ক্যাথলিকদের মধ্যে চার মিলিয়ন ক্যাথলিকদের একটি স্বদেশবাদী প্রতিষ্ঠানের (Catholic Patriotic Association) সাথে সংযুক্ত করা হয়। ক্যাথলিকদের পোপ আনুগত্য পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে রোম এবং বেইজিং বিশপ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছিল।

সরকারের অবস্থান ছিল এই যে, সব প্রোটেস্ট্যান্টদের তিনটি স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তার লাভ করে যা চীন শহরে প্রোটেস্ট্যান্ট

সংস্কৃতি, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সমাজের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে ''rural house churches'' চীনা লোক ধর্ম এবং ক্যাথলিক কৃষক সাম্প্রদায়িকতার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বিকশিত করতে চায়।

চীনা সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে ধর্মীয় বিষয়ের সংযোগ স্থাপনের জন্য পরিচিত। চীনা পার্টির নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে একটি বড় চাপ উঠে আসে একটি অস্পষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় (ফালুন গং) থেকে যা ১৯৮০ সালের আর্থ-সামাজিক সংস্কারের সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল। ধর্মপ্রদেষ্টারা অনুসারীদের নৈতিক নীতির প্রচারের মাধ্যমে উৎসাহিত করত। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি গোষ্ঠী দ্বারা আয়োজিত বিক্ষোভের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। অন্যদিকে সরকার বিরোধী দলকে অখ্যাতি করতে মিডিয়ার উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ২০০১ সালে বিরোধী দল একটি ধাপ এগিয়ে চীনা সরকারের সমালচেনায় হংকং শহরে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এর ফলে সরকার বলে যে পুলিশরা বিরোধীদলের উপর নজর রাখছে যাতে মূল ভূখণ্ডের ওপর শান্তি বজায় থাকে।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপান তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংবেদনশীলতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধারালো বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধিকাংশ ধর্মীয় জাপানি নিজেদের বৌদ্ধ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে থাকে। কিন্তু তাদের অনুশীলনে কিছু খ্রীস্টান প্রভাবের সাথে সাথে বৌদ্ধ এবং শিন্তো উপাদানের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। জাপান প্রধানতঃ ধর্মনিরপেক্ষ একটি সংস্কৃতি যা জাতীয় ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে গ্রামাঞ্চল থেকে অভিবাসী তাদের গ্রামীণ ধর্ম বন্ধন হারিয়ে ছিল। এই পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে নতুন ধর্মের উত্থান দেখা যায়। নতুন ধর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি সাধারণত শক্তিশালী শিন্তো প্রভাবের সঙ্গে এশিয়ান ঐতিহ্যের একটি সংমিশ্রণ হয়। যুদ্ধের পরবর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সক্রিয় ধর্ম ছিল Soka Gakkai। সরকারি দল Komeito-এর সদস্যদের নিয়ে Buddhist Nichiren Shoshu-এর একটি শাখা তৈরি হয়। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত Komeito দেশের তৃতীয় শক্তিশালী দল ছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালে parent organization, Soka Gakkai এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যে New Komeito সরকারি জোটভুক্ত হয়। জাপানের সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসে সম্ভবত ঐ প্রথম রাজনীতিতে ধর্ম জড়িত থাকার বিরল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

কোরিয়া সম্ভবত উপদ্বীপের রাজনীতি প্রভাবিত খ্রীস্টান-বৌদ্ধ সম্পর্কের পারমাণবিক বিস্তার থেকে শুরু করে নানারকম বিষয় নিয়ে আকর্ষণীয় একটি দেশে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া Republic of Korea (ROK) এবং উত্তর কোরিয়া Democratic People's Republic of Korea (DPRK) ঐতিহাসিক সংস্কৃতি থেকে নির্গত হলেও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দিকে অবস্থিত। এক দিকে দক্ষিণ কোরিয়া গ্লোবাল সিস্টেমের সাথে ভাল সংহতিপূর্ণ, অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার পক্ষপাতি। উত্তর কোরিয়ার আত্মনির্ভরশীলতা মতাদর্শের প্রচার, শক্তিশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্নতার পাশাপাশি উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল—যার প্রভাব

পড়ল মার্কসবাদের পাশাপাশি আরও চারটি প্রধান ক্ষেত্রে; সেইগুলি হল নয়া কনফুশিয়বাদ (neo-confucianism) বৌদ্ধধর্ম, প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestantism) এবং ক্যাথলিকবাদ (Catholicism)। দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকান কর্তৃত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিশ্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপ ধারণ করে। ১৯৫০-৭০-এর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করে। যদিও কোরিয় খ্রীস্টানধর্ম পশ্চিমী উপনিবেশবাদ দ্বারা খুব একটা ভোগান্তির সম্মুখীন হয়নি। কোরিয় যুদ্ধের পরে অধিকাংশ খ্রিস্টান; বিশেষ করে উত্তর থেকে পলাতকরা মেথডিস্ট রি (Methodist Rhee) কমিউনিস্ট বিরোধী সরকারকে সমর্থন করে। তবে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকরা শীঘ্রই সরকারের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। এই প্রতিবাদ আধুনিক এবং ঐতিহ্যগত উভয় উপাদান বিকশিত করে। যুদ্ধ পরবর্তী কোরিয়া খ্রীস্টানধর্মের বিস্তারের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের পুনরায় উদ্ভবও পরিলক্ষিত হয়েছিল। এইভাবে এক নতুন কোরিয়ান ধর্ম তৈরি হয়েছিল যা গড়ে উঠেছিল খ্রীস্টবাদ, কনফুশিয়বাদ এবং কোরিয় সামনবাদের (Korean Shamanism) নানান উপাদানকে সামনে রেখে। ১৯৮০ সালে প্রগতিশীল খ্রীস্টানবাদের সংস্পর্শে এসে চিরাচরিত রক্ষণশীল কোরিয় বৌদ্ধধর্ম গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

৩.৫ মধ্যপ্রাচ্য

আরব ইসলামের মূল সূত্র নিহিত রয়েছে সৌদি আরব, মিশর, সিরিয়া ও ইরাক দেশগুলির মৌলিকতার মধ্যে। এদের মধ্যে সৌদি আরবের জটিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ওয়াহাবী ধর্মবিশ্বাসী আরব প্রধান Abd al-'Aziz' সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিকভাবে Sa'ud বাড়িতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার আগে, তার গোত্রের আধিপত্য উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় তাৎপর্য হল এখানে রাজা দুই পবিত্র স্থান মক্কা ও মদীনার অভিভাবক। পশ্চিমের দেশগুলি সৌদি আরবের তেলের প্রয়োজনে তার শক্তিশালী প্রতিবেশী ইরাক ও ইরান থেকে রাজত্ব রক্ষা করে। ওয়াহাবি মতবাদ একটি গোঁড়া জীবনযাপনের উপর জোর দেয় এবং এই মতবাদ সৌদির রাজাদের আনুগত্য মদ্যপান, থিয়েটার, মহিলা ড্রাইভার, সিনেমা এবং কনসার্ট হল উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে সৌদি নেতৃত্ব একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং সৌদি রাজ্যের ধর্মীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে আসে। রাষ্ট্র ধর্মীয় পথ অনুসরণ করে একটি ফতোয়া জারি করে। তারপর বাষট্টিজন নেতাদের ফাঁসি দিয়ে বিদ্রোহটি স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়। সৌদি আরবের জনগণ খোলাখুলিভাবে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্তাইনের জন্য সমর্থন প্রদর্শন করে।

সিরিয়ার বাশার আল-আসাদ এবং ইরাকে সাদ্দাম হুসেন তাদের নিজ নিজ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ দলের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, কিন্তু ধর্মীয় সংঘাত থেকে নানান বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সিরিয়ায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দ্বারা তার সরকারের কয়েক সদস্যদের হত্যার একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৮২ সালে হাফিজ আল-আসাদ হামা গ্রামটি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক সংস্কারের দিক থেকে সিরিয়ার অত্যন্ত নিম্ন বৈশি,ট্যগুলি তুলে ধরেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক ভাঙনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব ছিল লেবাননের গৃহযুদ্ধ (১৯৭৫-৯১) লেবানন সংকট মধ্যপ্রাচ্যে সংখ্যালঘু ধর্মের গোঁড়া, Persian Bahais,

Egyptian Copts, ইহুদী এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়।

পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ মিশরের মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং মৌলবাদী ইসলামী গোষ্ঠীদের জন্য সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হুমকি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সাদাতের সময় থেকে মিশরের রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করে যা ইসলামী centrists দের জন্য একটি আধ্যাত্মিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করতে চেয়েছিল।

অর্থনীতি এবং যোগাযোগের বিশ্বায়নের ফলে ধর্ম রাজনৈতিক ভূমিকা উন্নত করা হয়েছে এবং ধর্ম একটি আংশিক পুনর্গঠন নেতৃত্বাধীন হয়েছে। ত্বরিত অভিবাসন (Accelerated Immigration) বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তি বৃহত্তর নেতৃত্বাধীন হয়েছে। ধর্ম ঐক্যবদ্ধ এবং বিভক্ত—উভয়ই হতে পারে। কখনও কখনও আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ধর্ম অন্য ধর্মের প্রভাব থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করেছে। একই সময়ে ধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাবকেও উপেক্ষা করা যাবে না। ধর্মনৈতিক মান প্রচারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং সমাজিক পরিচয় প্রদান করে থাকে।

৩.৬ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। পূর্ব এশিয়া এবং আরব বিশ্বে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্যে এক তুলনামূলক মূল্যায়ন করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। পাশ্চাত্যে ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। হান্টিংটনের 'Clash of Civilization'-এর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২। 'ওয়াহাবিবাদ' কাকে বলে?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Hanson, Eric. O. (2006), *Religion and Politics in International System Today,* Cambridge: Cambridge University Press.

২। Jelen, Ted Gerard and Clyde Wilcox (2002), *Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few and the Many,* Cambridge: Cambridge University Press.

অনুবাদ সাহায্য: পূজা ভট্টাচার্য

একক ৪ ☐ তুলনামূলক প্রেক্ষিতে নারীবাদী রাজনীতি ঃ পশ্চিমী এবং অ-পশ্চিমী মতামত সমূহ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ নারীবাদী ধারা: তারতম্য এবং পার্থক্য

৪.৪ পশ্চিমে নারীবাদ এবং নারীবাদী রাজনীতি

৪.৫ নারীবাদ এবং নারীবাদী রাজনীতি: অ-পশ্চিমী মতামত

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল :—

- তুলনামূলক প্রেক্ষিতে নারীবাদী রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করা।
- নারীবাদী চিন্তার উৎস ও তার বিভিন্ন ধারা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।
- পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে নারীবাদ ও নারীবাদী রাজনীতি বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে নারীবাদী রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

৪.২ ভূমিকা

নারীবাদ একটি আদর্শ যা গবেষণার একটি বিষয়বস্তু যাকে রাজনৈতিক বীক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নারীবাদ কোন একক সুসঙ্গত তত্ত্ব নয়। উদারনীতিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মতো নারীবাদেরও নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। নারীবাদ এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে লিঙ্গ বা gender এবং যৌন বা sex-এর মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। 'যৌন' শব্দটি পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে জৈব পার্থক্যকে বোঝায়, অন্যদিকে 'লিঙ্গ' হল একটি সামাজিক গঠন যা একটি সাংস্কৃতিক অর্থ বহন করে। লিঙ্গ—যৌন পার্থক্য

নারীবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমাজে মহিলাদের অবদমন পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে জৈব পার্থক্যের ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য হয়ে এসেছে। নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষালী ও নারীত্বের ধারণা এবং কিভাবে তাদের ধারণা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা বোঝা প্রয়োজন। বিভিন্ন সমাজে পুরুষালী ও নারীত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে থাকে। যদিও নারীবাদীরা বলেন যে নারী-পুরুষ ও পুরুষালী-নারীত্বের মধ্যে সেরূপ জীববিজ্ঞানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। দার্শনিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং অনিবার্য হিসাবে নিপীড়নের বৈধতা প্রদান করে থাকে। দেখা যায় যে নিপীড়ন প্রাকৃতিক কারণ থেকেও উঠে আসে। এই বিষয়টি জৈব সংকল্পবাদ (biological determinism) হিসাবে পরিচিত।

৪.৩ নারীবাদী ধারা : তারতম্য এবং পার্থক্য

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পুরুষালী এবং নরীত্বের দ্বিমেরু মডেল হল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আধুনিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে দুই সেক্স মডেল আইন এবং রাষ্ট্র দ্বারা প্রোথিত ছিল। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে লিঙ্গের ভূমিকার জন্য biological hermaphrodites প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করা হয় এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি ছিল মৃত্যু।

অন্যদিকে প্রাক-আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন যৌন পরিচয়ের জন্য অধিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ নপুংশকরা (eunuchs) ভারতীয় সমাজে একটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থা ভোগ করত যা সমসাময়িক সময়ে হারিয়ে গেছে। এছাড়াও সুফি ও ভক্তি ঐতিহ্য প্রায়ই দুই সেক্স মডেলকে বাতিল করেছে এবং androgyny ধারণার সৃষ্টি করে থাকে। বিখ্যাত তাত্ত্বিক আশিস নন্দীর মতে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীত্বের জন্য বিশেষ মান বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে পশ্চিমে শুধুমাত্র পুরুষালী ধারণা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উপনিবেশ শাসনের প্রভাবে ভারতীয়ত্ব দুর্বল হতে শুরু করেছিল।

নারীবাদী চিন্তার বিভিন্ন ধারার তিনটি মৌলিক ধারণা রয়েছে—লিঙ্গ পরিখা, পিতৃতন্ত্র অস্তিত্ব এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। নারীবাদী পণ্ডিতদের মতে সমাজ গভীরভাবে লিঙ্গভিত্তিক এবং সমাজ বিভক্ত হওয়ার জন্য তা একটি বিশেষ ফ্যাক্টর। সমসাময়িক বিশ্বে লিঙ্গকে সামাজিক সংগঠনের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। বিশ্বজুড়ে বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক শর্ত একটি বিশেষ লিঙ্গ বা যৌন গোষ্ঠীর একাত্মতার শনাক্তকারী দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়। লিঙ্গ একজন ব্যক্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। নারীবাদীরা লিঙ্গ নির্দিষ্টতার ধারণার বিরোধিতা করেন। কারুর জন্য এটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আবার অনেকের কাছে জাতি, বর্ণ ইত্যাদির মতো এটিও একটি সাধারণ বিষয়।

নারীবাদীদের দ্বিতীয় দাবি হল—এমনিতে লিঙ্গের ধারণা পক্ষপাতহীন অথচ পুরুষতন্ত্রে নারীকে নিম্নস্তরে রাখা হয়। সর্বজনীন দিক থেকে নারীবাদীদের মতে সামাজিক কাঠামো পরিষ্কারভাবে নারীকে একটি অনগ্রসর অবস্থানে রেখেছে। 'পিতৃতন্ত্র' বলতে পিতার বিধিকে (rule of the father) বোঝানো হয় কিন্তু নারীবাদী কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ব্যাখ্যা হল এই পিতৃতন্ত্রে এমন এক সমাজের কথা বলা হয় যা পুরুষদের জন্য সুবিধে এবং নারীদের জন্য অসুবিধে তৈরি করে। নারীবাদী চিন্তা পিতৃতন্ত্রের অস্তিত্বের পরিসীমা এবং ক্ষিপ্ততার প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে পিতৃতন্ত্র সামাজিক নিয়ম এবং পরিবারে সচেতনতার সাথে ধারাবাহিকভাবে পুরুষদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে। পিতৃতন্ত্র সেখানেই চরম আধিপত্যবাদী হয়ে উঠেছে যেখানে সমাজের একটি বড় অংশের মহিলারা একে সমর্থন করেছে; উদাহরণস্বরূপ বয়স্ক মহিলারা সতিদাহ প্রথা, পর্দা প্রথা, মহিলা শিক্ষার বিরোধিতা ইত্যাদিকেই সমর্থন করত। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী বিদ্রোহের অভাব সমাজে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্য তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

অবশেষে নারীবাদীরা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অতএব নারীবাদকে সংস্কারমূলক এবং বিপ্লবী উভয়ই বলা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কম বা বেশি—সকল মহিলাদের সমতার জন্য সংগ্রামই হল নারীবাদের লক্ষ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি লিঙ্গভিত্তিক বলে ধরা হয় যা যৌন এবং যৌনতার সামাজিক নিয়ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এই বিষয়টি তার ক্ষেত্রটি প্রাসরিত করেছে। লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রশ্ন, পুরুষালী এবং নারীত্বের নতুন ধারণা সামনে এনেছে। লিঙ্গ এবং রাজনীতি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রথাগত মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে:

- **প্রথমতঃ** প্রচলিত ধারণা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।
- **দ্বিতীয়তঃ** লিঙ্গ এবং রাজনীতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ ও সহজাত বৈচিত্র্য সামনে এনে এর আন্তঃবিষয়ক প্রকৃতি তুলে ধরেছে।
- **অবশেষে,** লিঙ্গ এবং রাজনীতির সাথে নারীবাদ এবং রাজনীতির একটি নিবিড় সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছে।

নারীবাদী তাত্ত্বিক এবং কর্মীরা প্রাকৃতিক কিংবা আকাঙ্খিত পুরুষ আধিপত্যের ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাজনীতিতে পুরুষের আধিপত্য জটিল এবং গভীর একটি বিষয়। কর্মক্ষেত্রে কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে (public sphere) অধিক সংখ্যায় নারীদের নিয়োগ করে এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে না। লিঙ্গের সমতার জন্য রাজনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। রাজনীতির চিরাচরিত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সরকারি শাসনযন্ত্র, নির্বাচনী রাজনীতি, রাজনৈতিক এলিট এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠান। ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্যে বা আর্থ-সামাজিক অবদান সত্ত্বেও নারীরা

অদৃশ্য ছিল। রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় নারীবাদের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র থাকলেও, তাত্ত্বিক Cynthia Enloe এবং Kate Millet ব্যক্তিগত স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের মধ্যে পার্থক্য (public-private distinction) যুক্ত করে তা বিস্তারিত করেছেন। Kate Millet তার *Sexual Politics* (1968) বইতে রাজনীতিকে "power structured relationships, arrangements, whereby one group of persons is controlled by abother." বলেছেন। সুতরাং নারীবাদী রাজনৈতিক গবেষণার মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের মধ্যেকার বিভাজনটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। তারা ব্যক্তিগত স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের মধ্যে ঐতিহ্যগত পার্থক্যের পাশাপাশি জ্ঞান উৎপাদন, অর্থ এবং পরিচয় রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এই বিষয়ের মধ্যে কিছু তাত্ত্বিকরা নিজেদের 'ইতিবাচক' বা 'positivists' বলে বিবেচনা করেছেন। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা এই positivists ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং এই বিষয়টির জ্ঞাততত্ত্বগত (Epistemological) ভিত্তি প্রসারিত করতে ক্রিটিক্যাল তাত্ত্বিক ও উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকদের সাহায্য নেন। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা প্রয়োগবাদ, আধুনিকতাবাদ, দৃষ্টিকোণ জ্ঞানতত্ত্ব (standpoint epistemology) এবং hermeneutics ইত্যাদি ব্যবহারে যথেষ্ট উদ্যোগী। পন্থা ও পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য নারীবাদীর একটি বিশেষ দিক।

৪.৪ পশ্চিমে নারীবাদ এবং নারীবাদী রাজনীতি

রাজনৈতিক তাত্ত্বিক জন লক-এর লেখায় অ্যাংলো আমেরিকান ঐতিহ্যের রাজনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি ব্যক্তিগত স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের মধ্যে বিভাজন করেছিলেন। অ্যাংলো-আমেরিকা 'trans-cultural, trans-historical universality' এবং ব্যক্তিগত স্তরের সাথে সামাজিক স্তরের মধ্যে বিভাজনের বিষয়টি গ্রহণ করেছিল। এই বিভাজন পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান বেছে রেখেছিল। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেখান থেকে নারীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েঝিল সেখানে বলা হত রাজনীতি হল একটি পুরুষালী বিষয়। যদিও গর্ভপাত, যৌনতা, নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ সহিংসতা এবং লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ বৈধ বলে ধরা হয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিদের মধ্যে বিবাহ, গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক যুদ্ধ চলছে, যা পুরুষদের এবং মহিলাদের ঘনিষ্ঠ আচরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ২০১৫ সালের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমলিঙ্গের বিবাহটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সময়ের সাথে সাথে পাশ্চাত্যের নারীবাদী রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে বিশ শতাব্দীতে নারীদের ভোট দেওয়ার অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে। ভোটাধিকারের পরে ১৯৬৭ সালে আমেরিকান কংগ্রেস Equal Pay Act পাশ করেন যা নিয়োগকর্তারা একই কাজের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের সমান মজুরি দিতে বাধ্য হয়। একই সময়ে সপ্তম জাতিভুক্ত নাগরিক অধিকার আইনে জাতি বা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থানে ভেদাভেদ নিষিদ্ধ করা

হয়। মহিলাদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিল স্কুলে যৌন বৈষম্য নিষিদ্ধ করা। ১৯৭৩ সালে এই বিশেষ সংশোধনীতে মহিলা শিক্ষকদের তালিকাভুক্তি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের জন্য একটি বিশাল পদক্ষেপ ছিল সমান শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদ্যালয় যাওয়ার অধিকার। এটা তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমতা, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা পেতে সাহায্য করে। আমেরিকান মহিলারা প্রায় সব অবস্থানের কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের মতই সমান মর্যাদা উপভোগ করছে এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাটি সামান্য অনুরূপ ছিল। ১৯৬০ সাল থেকে গ্রেট ব্রিটেনে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন (Women's Liberation Movement) বা দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ নারীদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও রাজনৈতিক কর্মীরা প্রায়ই বলেন যে অতীতে নির্দিষ্ট মানের গ্রন্থে নারীদের বিশেষ উল্লেখ ছিল না। নারীবাদী তাত্ত্বিক Sheila Rowbotham নারীবাদের মার্কসবাদী বৈপ্লবিক ধারণা দ্বারা প্রবাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে পরিবারের মধ্যে নারীর ভূমিকা আসলে মানবিক সম্পর্কের দ্বারা পুঁজিবাদ রক্ষণাবেক্ষণ করে যা পুরুষদের কাজ প্রদান করতে পারেন না। তিনি তাঁর *Hidden from History* (1973) গ্রন্থে কর্মসংস্থান, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন পারিবারিক জীবন এবং যৌনতা সহ নারী জীবনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করেন। আমেরিকান এবং ইউরোপ কেন্দ্রিক নারীবাদ যথেষ্ট সময় ধরে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু নারীবাদী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সীমানা মধ্যে গড়ে উঠেছে। এই বিশেষ ধরনের নারীবাদ একাধিক উপায়ে সীমিত কারণ এটা মহিলাদের বিশ্বব্যাপী প্রসারণে বাধা দেয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো নারীবাদী রাজনীতিকে, বিশেষ করে তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদ যা উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে একটি সার্বজনীন আন্তর্জাতিক বক্তৃতা স্থাপন করার চেষ্টাকে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হয়। তারা পশ্চিমের নারীবাদের মতো সমান পরিচয় ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ভাগ করতে নারাজ।

প্রাশ্চাত্য নারীবাদ একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যা সকল নারীদের সাধারণ 'coloured' জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেনি। সমালোচকরা সমাজের নানান বৈপরীত্য এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের নির্বাচনকে সমালোচনা করেছিলেন। নারীবাদী তরঙ্গের কারণে শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত নারী সামাজিক পরিবর্তন থেকে লাভবান হতে এবং তাদের অধিকার উন্নত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমাজে একটি মাত্র স্তরের সুযোগসুবিধা গোটা সমাজের ক্ষেত্রে সাম্যতা ডেকে আনে না। পাশ্চাত্য নারীবাদী সংস্কৃতি মধ্যে দিয়ে বরং সমাজে সহজাত বর্ণবাদ উঠে আসতে থাকে।

অ-পশ্চিমী সমাজের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পশ্চিমী নারীবাদ অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমী নারীবাদী তাত্ত্বিকরা জটিল homogenize প্রয়াস এবং তাত্ত্বিক মডেলের মধ্যে মাপসই সামাজিক বাস্তবতা আনতে চেষ্টা করেছেন।

৪.৫ নারীবাদ এবং নারীবাদী রাজনীতি: অ-পশ্চিমী মতামত

পশ্চিমী নারীবাদীদের সার্বজনীন দাবির সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী উত্থান হতে থাকে। তারা মনে করেন যে সমাজে পিতৃতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি মহিলাদের দমন এবং পুরুষদের অর্থনৈতিক আধিপত্যের মতো কিছু নির্দিষ্ট সার্বজনীন ক্ষেত্র রয়েছে। তবে পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও দমনের সঙ্গে অর্থনৈতিক মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে জটিল মিথস্ক্রিয়ার তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, মহিলাদের প্রতিরোধকের মাত্রা সবক্ষেত্রে সমান হয় না। বর্তমানের নারীবাদ অকার্যকর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সাংস্কৃতিক মাত্রা থেকে সৃষ্টি হয়। উপনিবেশবাদের প্রভাব ও পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ লিঙ্গ বিভাজনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া সারা বিশ্ব জুড়ে শিল্পায়ন বিভিন্ন সমাজের নারীদের জন্য খুবই বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিম এবং উন্নয়নশীল—উভয় দেশগুলিতে তৃতীয় বিশ্বের নারী সংগ্রাম স্বীকৃতির জন্য প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়েছে। উপনিবেশিক দেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের অপববহার করে বর্ণবাদী প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদ উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশের নারীদের কথা তুলে ধরে। পাশ্চাত্য নারীদের ইউরোকেন্দ্রিকতা প্রায়ই তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের বাকি আদর্শ হিসেবে দেখতে পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজের নির্দিষ্টতার সঙ্গে সক্রিয় আদিবাসী নারীদের আন্দোলনকে যুক্ত করতে দেখা যায়। তৃতীয় বিশ্বের নারীদের নারীবাদী তত্ত্ব, বৃত্তি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পশ্চিমের দেশগুলির কাছে অপ্রকাশিত থেকে যায়। কিন্তু পশ্চিমে বসবাসকারী তৃতীয় বিশ্বের নারীদের প্রতিবাদের আওয়াজ শোনা যায়। তারা পশ্চিমের নারীবাদের ইউরোকেন্দ্রিকতাকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদীরা এই ইউরোকেন্দ্রিকতার রেশ কাটানোর জন্য সোচ্চার হয়েছেন যা প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের শিকারের তালিকায় তৃতীয় বিশ্বের নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ বা Black Feminism নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ণ। এই নয়া ধারার নারীবাদ পশ্চিমী নারীবাদের জাতিগত প্রকৃতির সমালোচনা করে থাকে। তাদের মতে বর্ণবাদে এত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ পাশ্চাত্য সমাজ এক অ-সচেতন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। তাদের মতে, বিরোধী বর্ণবাদী কৌশলের দ্বারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। তারা আবার অস্বীকৃত কিছু বিষয় এবং কুসংস্কার নিয়ে চর্চা করে থাকেন।

এই সকল নারীবাদের পাশাপাশি ইসলামী নারীবাদের উত্থানও পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী নারীবাদ কোরানের আদর্শের সব মানুষের সমতার অংশ হিসেবে নারী-পুরুষের সমতার একটি ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই নারীবাদ লিঙ্গের ক্ষেত্রে সমতা, নাগরিক প্রতিষ্ঠান এবং দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। ইসলামী নারীবাদ নিছক মুসলিম নারীদের একটি বৈকল্পিক নয়, বরং সাবেকি চিরাচরিত

ইসলাম ধারণার একটি নয়া রূপ যা নারীদের সমতার কথা তুলে ধরে। ইসলামী নারীবাদ নিজেই ইসলাম সাংস্কৃতির উপযুক্ত বলে মনে করে, যা নৈতিকতাকে লঙ্ঘন না করে নমনীয়তা আনতে চায়। ইসলাম নারীবাদী ওয়েস্টার্ণ নারীবাদী ঐতিহ্য উপর নির্ভর করে না, এর পরিবর্তে কোরানের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে থাকে। ইসলামী নারীবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সংস্কৃতি এবং ধর্মকে পৃথক করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে হিংস্র বিরোধিতা রোধ করা। প্রায় সব ইসলামী যুক্তরাষ্ট্র শরিয়া শাসন (ইসলামী ধর্মশাস্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ইসলামী আইন) বাস্তবায়ন করতে চায় যা মহিলাদের জন্য সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ অস্বীকার করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় যেখানে মহিলারা পশ্চিম নির্ধারিত আদর্শের ভিত্তিতে নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য মধ্যে থেকে কিছু শক্তি আহরিত হয়ে থাকছে। ইসলামী নারীবাদের কঠোর সমালোচনা করা হয়ে থাকে। উদারনীতিবাদী, মার্কসবাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি নারীবাদকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, ধর্মীয় কঠোরতা থেকে মুক্তির জন্য কিছু স্বেচ্ছাধীন অধিকারের প্রয়োজন রয়েছে। এই কারণে শরিয়তের পুনরায় ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আসলে প্রকৃত শরিয়ত নারীমুক্তিকেই স্বাগত জানায়—এটি হল উত্তরাধুনিক নারীবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। ভারতে নারীবাদী রাজনৈতিক কার্যক্রম নারীবাদী এবং নারীবাদকে জাতীয় রাজনীতির একটি বিশেষ অংশ করে তুলেছে। ভারতীয় অভিজ্ঞতা অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নারীবাদী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। ১৯২০-এর দশক ছিল ভারতে নারী আন্দোলনের সূচনাকাল এবং পরে উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। দেশে নারী আন্দোলন জাতীয়তাবাদ ও তার পৃথক ক্ষেত্র গঠন করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আন্দোলনের অনেক সাফল্যের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বাধীন ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং নারীর অধিকারের জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান। যদিও এই নিশ্চয়তা ভারতীয় নারীদের জীবনে সামাজিক ও বস্তুগত পরিবর্তনের জন্য কোন সাহায্যে প্রদান করেনি। ঔপনিবেশিক কাল থেকে দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলন চলা সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্র ভারতে গবীরভাবে জড়িত থাকে, এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ নির্ণয় করা থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পিতৃতন্ত্র এবং নারী আন্দোলনের মধ্যে আপস এবং দ্বন্দ্ব জাতি-রাষ্ট্রের সংবিধানে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

ঔপনিবেশিক কালে নারীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দাবিদাওয়া সামনের সারিতেই ছিল। কারণ মানব সভ্যতা, আধুনিকতা এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত ছিল নারীমুক্তি। তবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে উদার এবং সভ্য আদিবাসীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শ্রম ব্যবস্থা পরিবার, লিঙ্গ এবং বয়স দ্বারা সংগঠিত এবং পরিবারের ভূমিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

১৮৭০-এর দশকে 'নতুন নারী আন্দোলন' বা 'New Women's Movement'—এর উত্থান হয়েছে। আন্দোলন বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই আন্দোলনটি কিছু দেশের অভ্যন্তরে এবং কিছু বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল যা একটি বৈপ্লবিক মোড় নেয়। পরাধীন ভারতের নারী আন্দোলনের সঙ্গে যা চরিত্রগতভাবে

পৃথক ছিল। সর্বভারতীয় সংগঠন গঠন করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। নতুন সংগঠনগুলি কিছু নির্দিষ্ট দাবিদাওয়া নিয়ে স্থানীয় হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে, মাওবাদীরা নারী লিঙ্গ নিপীড়ন এবং বৈপ্লবিক বাম রাজনীতির একটি আত্মসচেতন নারীবাদী সমালোচনা শুরু করার প্রয়াসে নারী প্রগতিশীল সংগঠন গঠন করে। বিতর্কিত শাহ বানু মামলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে একটি Uniform Civil Code চাহিদার মধ্যে দিয়ে ১৯৮০ সালের নতুন নারী আন্দোলন গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। যদিও যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা ইত্যাদি স্থানীয় সরকার মহিলাদের জন্য আসন, আইন সংরক্ষণের দ্বারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। নারীবাদী গোষ্ঠী এবং আইনের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারী অধিকার তৈরি করা হয়েছে। ইতিবাচক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও সম্মান হত্যা (honour killing) খাপ পঞ্চায়েত, বৈবাহিক ধর্ষণের মতো বিষয় দেশের নারী স্বাধীনতার উপর ক্ষমতাশালী প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

সারা বিশ্ব জুড়ে নারীবাদী আন্দোলন নানান সাফল্যতা অর্জন করেছে। আসলে নারীবাদী চিন্তা কিছু মৌলিক তাত্ত্বিক ধারণা সম্মত। অন্যদিকে ব্যবহারিক প্রযোজ্যতা পৃথক এবং বড় পরিমাণে বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল।

৪.৬ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১। পশ্চিমী ও অ-পশ্চিমী প্রেক্ষিতে নারীবাদী রাজনীতির অভিজ্ঞতার এক তুলনামূলক আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১। তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদের মূল বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করুন।

২। পশ্চিমে নারীবাদ ও নারীবাদী রাজনীতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। পাশ্চাত্য নারীবাদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২। ইসলামী নারীবাদ বলতে কি বোঝেন?

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Baylis, John, Smith Steve and Patricia Owens (2008). *The Globalization of World Politics,* 4th edn. Oxford: Oxford University Press.

২। Celis, Karen, Johanna Kantola, Georgina Waylen, and S. Laurel Weldon (2013), 'Introduction: Gender and Politics: A Gendered World, a Gendered Discipline', In Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola and S. Laurel Weldon (eds.), *The Oxford Handbook of Gender and Politics.* Oxford: Oxford University Press.

৩। Menon, Nivedita (2008). 'Gender'. In Rajeev Bhargava and Ashok Acharya (eds.), *Political Theory: An Introduction.* New Delhi : Pearson.

৪। Moghissi, Haideh (1999P. *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis.* London: Zed Books.

৫। Yamani, Mai (ed.) (1996). *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives.* New York: New York University Press.

পর্যায় : ৪
কর্তৃত্ববাদ ও গণতন্ত্র

একক - ১ : বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ

একক - ২ : নেপালের গণতান্ত্রিক উত্তরণ

একক - ৩ : মিশরে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সমূহ

একক - ৪ : লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক রূপান্তর

একক ১ ❐ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১.৪ গণতান্ত্রিক সংস্কারের পর্ব

১.৫ নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা

১.৬ অংশগ্রহণ ও সরকারি দায়বদ্ধতার অভাব

১.৭ ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থা

১.৮ দুর্বল নাগরিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

১.৮.১ দল রাজনীতির প্রকৃতি

১.৮.২ ধর্মীয় ও জাতিসত্তার রাজনীতি

১.৯ নাগরিক সমাজের ভূমিকা

১.১০ গণমাধ্যমের ভূমিকা

১.১১ পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক

১.১২ সারসংক্ষেপ

১.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট ও সংস্কারের পর্যায়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।
- বাংলাদেশের গণতন্ত্রের দৃঢ়করণের পথে বাধাগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

- বাংলাদেশের গণতন্ত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিষয়ে অবহিত করা।
- বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণালাভে সাহায্য করা।

১.২ ভূমিকা

একটি সাম্প্রতিক আলোচনায় ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বলেছেন যে, "গণতন্ত্র হল একটি জটিল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা দায়বদ্ধতা, আইনের শাসন এবং একটি উপযুক্ত রাষ্ট্রকে বোঝায়; এই বিষয়গুলিকে একসাথে কাজ করতে হয় এবং সফল গণতন্ত্র তখনই ঘটে যখন এইসব উপাদানগুলিকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়।" [সূত্র: ফুকুয়ামা ফ্রান্সিস এন্ড আদারস (২০১৪) "রিকন্সিডারিং দ্য 'ট্র্যানজিসন প্যারাডাইম"', *জার্নাল অফ ডেমোক্র্যাসি*, ভলিউম ২৫ নং ১, জানুয়ারি, পৃ. ৬] এই পর্যবেক্ষণ ১৯৮০-র দশক থেকে ঘটে চলা গণতন্ত্রের প্রবাহের প্রেক্ষাপটে উত্তরণশীল দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ও সংহতকরণের প্রক্রিয়াগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঊর্ধ্বে উঠে দেখতে আমাদের সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে গণতন্ত্রের উৎকর্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। গত দুই দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে মজবুত করার কাজটি নানা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে যা সেইদেশে গণতন্ত্রীকরণের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

১.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এক দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতে দেশভাগের ফল হিসাবে বাংলার পূর্ব অঞ্চলটি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার আন্দোলনে। পরবর্তী দশকে স্বাধীনতার আন্দোলন পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত আকার নেয় যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০-এর দশকে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামি লীগ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মধ্যে তার সমর্থন বাড়াতে সফল হয়েছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং গেরিলা জনযুদ্ধের সাহায্যে সেই শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে। এই সংবিধান বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সংসদীয় গণতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছিল, যা একটি

বহুদলীয় ব্যবস্থার ওপর নির্মিত হবে। প্রস্তাবনা অনুসারে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র চারটি নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে—'জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা'। ১৯৭৩ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথটি বাংলাদেশে নিরন্তর সংকটের সামনে পড়তে থাকে ১৯৭৫ সাল থেকেই। ঐ বছর অগাস্ট মাসে একদল সেনা অফিসারের অভিযানে শেখ মুজিবর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিহত হন। সেই থেকেই রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অবিরত বাধা আসতে থাকে কারণ নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে প্রায়ই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান বা হোসেন মহম্মদ এরশাদ-এর মতো সামরিক শাসকরা বাংলাদেশকে শাসন করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশের বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির ঐতিহ্য প্রতিপালন করেছেন। জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয় দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দলটি সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র বা ইসলাম-সমর্থক অভিজাত মানুষদের মধ্যে তাদের সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ১৯৮১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পরের বছর জেনারেল এরশাদ সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯০ সালে এক গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতিতে জেনারেল এরশাদকে পদত্যাগ করতে হয়। বাংলাদেশে পুনরায় নিয়মিত নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুসারে, সংসদ দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন ও প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ তদারকী সরকারের অধীনে বাংলাদেশে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ওই সময় থেকেই বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতি দুটি প্রধান দলের বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়ে যায়—একটি শেখ হাসিনা নিয়ন্ত্রিত আওয়ামী লীগ ও অন্যটি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। বাংলাদেশের বহুদলীয় রাজনীতিতে অবশ্য অন্যান্য দলগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে—যেমন, ইসলাম-সমর্থিত দলগুলি, বামপন্থীরা বা কিছু আঞ্চলিক ও জাতিসত্তা ভিত্তিক দল।

১.৪ গণতান্ত্রিক সংস্কারের পর্ব

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষা অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রধান দুই বিরোধী দলের দীর্ঘ লালিত দ্বন্দ্ব দেশে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল। অবিরত সন্ত্রাস, নির্বাচনী জালিয়াতি বা অস্থায়ী সরকার বাংলাদেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় ও তার ফলে একটি দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধীরা সংসদীয় উপনির্বাচনে বিএনপি-র দুর্নীতির বিরোধিতা করে অনির্দিষ্ট কাল সংসদ বয়কটের ও দেশব্যাপী প্রতিবাদের ডাক দেন। তাঁরা খালেদা জিয়া সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন এবং একটি নির্দলীয় তদারকি

সরকারের অধীনে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন করার দাবী জানান। বিএনপি এই দাবী মানতে রাজী না হয়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনা করে। বেশিরভাগ বিরোধী দলই এই নির্বাচন বয়কট করেছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিএনপি নির্বাচনে সংসদের সব আসন দখল করে। মার্চ মাসে অবশ্য প্রবল জনমতের চাপে সংসদ ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনের কথা ঘোষণা করে। একটি নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নতুন সাধারণ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মহম্মদ হাবিবুর রহমান তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই বছর জুন মাসে নতুন সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

এই একই রকম রাজনৈতিক সংকট ও অচলাবস্থা পুনরায় তৈরি হয়েছিল ২০০৬ সালের শেষের দিকে যখন বিএনপি পরিচালিত সরকার ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের নির্বাচনের জন্য একটি তদারকি সরকার গঠন করতে সহমত আদায়ে ব্যর্থ হয়। অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনবিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী সরকারের নিয়ন্ত্রণ দখল করে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং জানুয়ারি মাসের নির্ধারিত নির্বাচন বাতিল করে দেন। ক্ষমতায় এসে তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের কিছু জরুরী সংস্কারের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যাতে দেশে স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। সেই অনুসারে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনেক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর বাংলাদেশে প্রথম স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

নতুন নির্বাচন সত্ত্বেও একবিংশ শতকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিভিন্ন দিক থেকে প্রবল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সাবেকী রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামো ও নীতিগুলি এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছিল। ২০১৩ সাল জুড়ে বিএনপি ও আরও ১৮টি দল হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাদের দাবি ছিল ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সংসদের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হলে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে এবং একটি নির্দলীয় তদারকি সরকারের হাতে নতুন সরকার গঠনের জন্য নির্বাচনের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। কিন্তু, বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ দেখিয়ে নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন জোরদার করে তোলে বনধ্, অবরোধ বা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে। এই ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক পরিস্থিতি বা নৈরাজ্যের মধ্যে দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী নামানো হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন জামাত-ই-ইসলামি নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে যুদ্ধ অপরাধের জন্য ফাঁসী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তখন এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। বিরোধী দলের নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে জয়ী বলে ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তে প্রবল আপত্তি জানায়। এমনকি আন্তর্জাতিক

পর্যবেক্ষকরাও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবে তাঁদের আপত্তি জানান। নির্বাচনে ভোটদানের হার খুব নিম্ন থাকায় এই রায়ের যথার্থতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। ২০১৪ সালের ৯ই জানুয়ারি নতুন সরকার শপথ নেয়। নির্বাচন পরবর্তী বাংলাদেশে হিংসাত্মক ঘটনা বাড়তে থাকে এবং সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। ইসলামি দল জামাত-ই-ইসলামিকে বেআইনি ঘোষণা করা বা জামাত নেতাদের যুদ্ধ অপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করার আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিরোধিতাও চরমে ওঠে। এই তীব্র রাজনৈতিক অচলাবস্থা শুধুমাত্র অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল তাই নয়, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকেও সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১.৫ নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ১৯৯১ সাল থেকে সাধারণত তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা হয়ে আসছে। কিন্তু, প্রতিবার এই অভিযোগ ওঠে যে শাসক দল কমিশনের রাজনীতিকরণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী জালিয়াতি করে থাকে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি, যে যখন ক্ষমতায় থাকে, নির্বাচন কমিশনকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে—কখনও কমিশনের পদাধিকারীদের নিয়োগের মধ্যে দিয়ে বা কমিশনের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচক তালিকা তৈরিতে যথোপযুক্ত দক্ষতা দেখাতে না পারায় ভোটের সময় নাগরিকদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না এবং তার ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ সব সময়ই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। শাসক দলের নির্বাচনী দুর্নীতিকে মোকাবিলা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে বিরোধীরা প্রায়ই বয়কটের পথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই এই কৌশল গ্রহণ করেছে ও তার ফলে প্রায়ই অচলাবস্থা কাটাতে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ২০০৭ সালে এমনই ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছিল।

২০০৭ সালে ফকরুদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন তদারকি সরকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে নির্বাচন কমিশনের কতকগুলি সংস্কার শুরু করেন। এই সরকার নির্বাচনী প্রচারের ব্যয় বা প্রার্থীদের যোগ্যতা বিষয়ে কিছু কঠোর নিয়মাবলী তৈরি করে এবং একটি নতুন নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করে। তদারকি সরকার দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিকদের বা ঋণ খেলাপীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অর্ডিন্যান্স (২০০৮) সংশোধন করেন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নাগরিকদের প্রথম সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। নির্বাচনে সন্ত্রাস রুখতে ব্যাপক নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের ইউএনডিপি (UNDP)-র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির আর্থিক ও প্রায়োগিক সাহায্যে কমিশন এই কাজগুলি সম্পন্ন করেছিল। তাছাড়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ওপর নজরদারি করতে

অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ নিয়োগ করা হয়েছিল। এঁরা বিশেষত নির্বাচনের দিনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রবল চাপে নির্বাচন কমিশন এই নিয়মগুলি সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠিত দলগুলি যথেচ্ছভাবে নির্বাচনী নীতি ও আইনকে লঙ্ঘন করেছিল। এর ফলে নির্বাচনের সময় ব্যাপক সন্ত্রাস, জালিয়াতি, বুথ দখল ও আর্থিক দুর্নীতি হতে দেখা গেল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থা, কিন্তু আসলে এটি অধিকাংশ সময়েই শাসক দলের ইচ্ছা মতো পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং, ২০০৮ সালের নির্বাচনে কমিশন যদিও মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনায় সফল হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনী বিধিভঙ্গের ঘটনা একেবারে সম্পূর্ণ এড়ানো যায়নি।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং তার ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি নির্বাচিত নতুন সরকারের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। ২০১১ সালে শাসক আওয়ামী দল আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে ত্রয়োদশ সাংবিধানিক সংশোধনী রদ করে দেয়। এই সংশোধনীতেই নির্বাচন পরিচালনায় নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপের কারণে ২০১৪ সালে বিএনপি-র নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনার বিরোধিতা করে নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়। তারা নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। পাশাপাশি জনমত সমীক্ষাতেও বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তের পক্ষে নয় ও তাঁরাও একটি নিরপেক্ষ সংগঠনের পক্ষেই রায় দিলেন। তাঁদের এই অসন্তোষ আরও বোঝা গেল নির্বাচনে ভোটদানের খুব কম হার থেকে। বস্তুত, আগের দুটি সংসদীয় নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে ২০১৪ সালের ভোটদানের হার ছিল খুবই কম। যেখানে ২০০১ সালে ভোটদানের হার ছিল ৭৪.৩ শতাংশ ও ২০০৮ সালে ছিল ৮৫.৯৩ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা এসে দাঁড়ায় কেবলমাত্র ৩০.১ শতাংশে। কমিশন এই নির্বাচনে নজরদারির জন্য এমনকি আন্তর্জাতিক নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করতে পারেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, আমেরিকা এবং বেশিরভাগ কমনওয়েলথ দেশগুলি নির্বাচনে তাদের পর্যবেক্ষক পাঠাতে রাজী হয়নি। ভারত ও ভূটান কেবলমাত্র তাদের পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। নির্বাচনী ফল প্রত্যাশিতভাবেই আওয়ামী লীগের পক্ষে যায়। কিন্তু, তা বাংলাদেশের মানুষের বা আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ হল। বিরোধীরা নির্বাচনী ফল সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করেছিল। এই নির্বাচন উত্তর-পর্বে বাংলাদেশ ও তার গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া আবার অনিশ্চয়তার আঁধারে ডুবে গেল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী সংস্কৃতি রক্ষার প্রাথমিক শর্ত। স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সতর্ক গণমাধ্যম ও জনগণের সচেতনতাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৬ অংশগ্রহণ ও সরকারি দায়বদ্ধতার অভাব

সরকার ও সরকারি কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার অভাব বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। গণতন্ত্রের

গুণাগুণ নির্ভর করে অনুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের ওপর। একাধিকবার সাময়িক শাসন বা ক্ষণস্থায়ী সরকার ও তার সাথে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। জাত, অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগত যোগ্যতার মতো বিদ্যমান সত্ত্বাগুলি ক্ষমতা বা সরকারি চাকরি পেতে, বিশেষতঃ নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। আইনসভার মতো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিতেও এই ধরনের সত্ত্বাগুলির প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রবণতাকে বাংলাদেশের সমাজের সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিকতা একরকমের সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করে। যদিও নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে বা তাদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ হয়েছে, তবুও প্রকৃত অংশগ্রহণের পথে তাদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ২০০৮ সালে সরকার অর্থনৈতিক সমতা, নারীদের স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে জাতীয় নারী উন্নয়ণ নীতি (National Women's Development Policy) গ্রহণ করেছে। কিন্তু শিকড় গেড়ে বসা পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি সাম্প্রতিক বাংলাদেশেও লিঙ্গ বৈষম্যের একটি বড় কারণ হিসাবে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে নারীদের নির্যাতন ও অধীনতার বিষয়টি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে এবং এর ফলে নারীদের অবস্থান সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ৭০ ধারাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সাংবিধানিক ধারাটিতে মহিলা সাংসদদের নারী-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে দল নির্বিশেষে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নারীদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে এ এক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। বাংলাদেশের এক বিশাল সংখ্যক মহিলা গণতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন নন। ফলে তাঁদের অংশগ্রহণ নিতান্ত নামসর্বস্ব থেকে যায়। তাছাড়া, তাঁদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রধানত তাঁদের সিদ্ধান্ত ও ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র ২০ শতাংশ মহিলারা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন, যেখানে ৫০ শতাংশ পুরুষ এই ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম [সূত্র: মেইসবার্জার, টি (২০১২) "ট্রেন্দেনিং ডেমোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ", দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, অকেশনাল পেপার, নং ১৩, জুন পৃ. ১৪]। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নারীদের ওপর ক্রমাগত বেড়ে চলা হিংসা ও লিঙ্গ বৈষম্য বাংলাদেশের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার পথে একটি বিরাট বাধা।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রও প্রায়শই তার 'দলীয়' ঝোঁক প্রকাশ করে থাকে ও সেই কারণে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার অভাব দেখা দেয়। আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও রাজনৈতিক প্রভুদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নিজেদের জন্য প্রশাসনে ভাল পদ পেতে বা কর্মজীবনে আরও উন্নতি করতে তাঁরা প্রায়ই শাসক দলের নেতৃত্বকে আনুগত্য দেখিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকরণের প্রবণতার ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বেড়ে চলা দুর্নীতির বিষয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবণতার

কারণে আমলারা নিরপেক্ষতা, সততা ও দক্ষতার মতো আবশ্যিক গুণগুলির প্রশ্নে প্রায়ই আপস করে থাকেন। এর ফলে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল-এর অফিস সরকারি অর্থভান্ড তছরূপের অভিযোগে কোনো সরকারি কর্মচারীকে দায়ী করার প্রশ্নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে না। অবশ্য সাম্প্রতিককালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা বাড়াতে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার সম্প্রতি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে যাতে তথ্য, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার পরিধি আরও বাড়ানো যায়।

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে অসামরিক সরকারের ওপর সেনাবাহিনীর আধিপত্যের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু, সামরিক বাহিনীকে তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় সেনাবাহিনীর স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার অবসান ঘটেনি। নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন বা নিরাপত্তা বাহিনীর স্বেচ্ছাচারী বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা তাই ক্রমশ সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী শক্তিকে দমন করতে শাসন দল অনেক সময়ই পুলিশ বা সেনার দমনমূলক শক্তির ওপর নির্ভর করে। সেনা অফিসাররা এখনও রাজনৈতিক মদত ভোগ করে থাকেন যার বলে তাঁরা আইন বলবৎ করতে গিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক পথ নিতে পিছপা হন না। একটি শক্তিশালী নাগরিক সমাজের অনুপস্থিতি বা সদাজাগ্রত গণমাধ্যমের অভাবও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনার অত্যধিক প্রভাবের পিছনে অন্যতম কারণ।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে অস্থায়ী সরকারের প্রধান, ফকরুদ্দিন আহমেদ 'ফ্রেমওয়ার্ক অফ ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজিঃ এ্যান ইনক্লুসিভ এ্যাপ্রোচ টু ফাইট করাপশান' ঘোষণা করেন। এই সনদ সংসদ ও জনগণর কাছে দায়বদ্ধ একটি 'স্বচ্ছ দায়িত্বশীল' প্রশাসন গড়ে তোলার কথা বলেছিল। তাছাড়া, একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথাও এতে বলা হয়েছিল। তদারকি সরকার দুর্নীতি-বিরোধী কমিশনকে শক্তিশালী করার ওপরও জোর দিয়েছিল যেখানে দুর্নীতিগ্রস্থ সংগঠন ও ব্যক্তিদের বিচার করা যাবে। অবশ্য আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্ত প্রয়াস বিশেষ কিছু সাফল্য পায়নি। সরকার এমনকি আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে থাকা কিছু মামলা তুলেও নিয়েছিল। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতি-বিরোধী কমিশনকে সরকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে আইন সংশোধন করেছিল। সংশোধনীতে স্থির হল এই কমিশনকে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে হলে সরকারের আগাম অনুমোদন নিতে হবে। কমিশনের নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হল। নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলি কমিশনের রাজনীতিকরণের চেষ্টা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে দুর্বল করার সরকারি প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা করেছিল। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক তার অভিমত প্রকাশ করেছে এইভাবে: "বাংলাদেশ সরকারের দুর্নীতি-বিরোধী কমিশন আইনকে সংশোধন করার প্রয়াস

নিরপেক্ষ ঘুষ-বিরোধী নজরদার শক্তিকে ও তার দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেবে।" [সূত্র: খান, এস. (২০১০) "মুভ টু এ্যামেন্ড এ্যান্টি-গ্র্যাফ্‌ট ল এন্ড রেলেভেন্ট ইস্যুস", *ফিনান্সিয়াল টাইমস্*, অগাস্ট ২২. http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news id=109706. Accessed 25 September, 2014]

১.৭ ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থা

গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সরকারের বিভিন্ন শাখার সঠিক বিভাজন ও স্বতন্ত্র কর্মধারার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাংলাদেশে বিচারবিভাগ নিয়োগের প্রশ্নে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অধীন থাকে। বিচারবিভাগের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব তাই বিশেষ প্রভাব ফেলে। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারককে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন।

২০০৭ সালে অনেক বিতর্কের পর তদারকি সরকার বিচারবিভাগকে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে সফল হয়েছিল। ওই বছর নভেম্বর মাসে ফৌজদারী প্রক্রিয়া আইন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স লাগু করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স আগের ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে এস্টাব্লিশমেন্ট মন্ত্রক দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের নতুন ব্যবস্থা চালু করে। রাজনৈতিক প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচারবিভাগকে মুক্ত রাখার পথে এই সংশোধনী ছিল একটি অগ্রবর্তী ধাপ। কিন্তু, ২০০৭ সালের সংস্কারের পরও স্বাধীন বিচারবিভাগ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। সংবিধানের ৯৫ ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা অপরিবর্তিত রাখা হয়। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে খইরুল হককে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগে বিচারকের যোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। অভিযোগ ওঠে যে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে দু'জন বরিষ্ঠ বিচারককে ডিঙিয়ে খইরুল হককে নিয়োগ করেছেন। বিরোধী দলগুলি ও সরকারবিরোধী উকিলরা এই সিদ্ধান্তের প্রবল সমালোচনা করেন। এছাড়াও দলের প্রতি অনুগতদের সরকারি উকিল হিসাবে নিয়োগ করার প্রথা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা হরণে বড় ভূমিকা নেয়। এই প্রথা বিচারবিভাগের সংস্কারের পরও চলতে থাকে। জুন ২০০৯ থেকে মে ২০১০ পর্যন্ত নেওয়া একটি জাতীয় পরিবার সমীক্ষার দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের জনগণ বিচারবিভাগকে দেশের সবথেকে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা হিসাবে দেখেন। এই সমীক্ষা অনুসারে, বিচার বিভাগের দুর্নীতির কারণে ৮৮ শতাংশ বিচারপ্রার্থী মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিবিদ্‌দের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করেছিল। সরকার মনে করেছিল এই মামলাগুলির অধিকাংশই 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত'। বিরোধীরা অভিযোগ তোলে যে সরকার-নিয়োজিত কমিটি কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলি বিবেচনা করেছে এবং তাঁদের বা সরকারের সমালোচক মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে করা ফৌজদারী মামলাগুলি প্রত্যাহার

করতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিচারবিভাগের বি-রাজনীতিকরণ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১.৮ দুর্বল নাগরিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে বড় বাধা হল নাগরিক সচেতনতার অভাব ও দুর্বল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গণতন্ত্রিকরণের পথে বাংলাদেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু, দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি বা যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের পিছনে একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। দলব্যবস্থায় অনৈক্য, দুর্নীতি, প্রাচীন বিদ্যমান সত্তাগুলি এখনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এর ফলে সমাজে অনৈক্য আরও বাড়তে থাকে। নাগরিক সংস্কৃতি বিকাশের পথে গেড়ে বসা দুর্নীতিও বড় বাধা। সরকারও কর্মচারীদের দুর্নীতি ঠেকাতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়না। গণমাধ্যম এই অপরাধগুলি প্রায়ই তুলে ধরে।

১.৮.১ দল রাজনীতির প্রকৃতি

বাংলাদেশের দল রাজনীতি ব্যবস্থা প্রধানত সংঘর্ষমূলক রাজনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত মেরুকরণ ঘটেছে এবং বাংলাদেশে এক অস্থিরতার ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি প্রধানত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যে বিভাজিত হয়ে আছে। দল ব্যবস্থা সাধারণতঃ এলিট-অধ্যুষিত ও বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশি রাজনীতির ভরকেন্দ্র আবর্তিত হয় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। শেখ হাসিনা প্রয়াত মুজিবর রহমান-এর কন্যা ও খালেদা জিয়া প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমান-এর স্ত্রী। স্ট্যানলি কোচানেক-এর মতেঃ "...দেশের মূল রাজনৈতিক শক্তিগুলি বাংলাদেশী সত্তা, জাতীয় নায়ক ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে মতান্তরে জড়িয়ে পড়েছে।" [সূত্রঃ কোচানেক, এস এ (২০০০) "গভন্যান্স, প্যাট্রনেজ পলিটিকস্ এন্ড ডেমোক্রেটিক ট্র্যাঞ্জিসন ইন বাংলাদেশ", এশিয়ান সার্ভে, ভলিউম ৪০ নং ৩, মে-জুন পৃ. ৫৩১] প্রধান দলগুলির আভ্যন্তরীণ কাঠামোও খুব গণতান্ত্রিক নয়, বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। দল রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক নীতি বা কাঠামোর অভাবে তাই দলগুলির মধ্যে এবং সংসদের পরিধিতে সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা পায়।

১.৮.২ ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বার রাজনীতি

স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে বাংলাদেশ ধর্মীয় মৌলবাদের আঁচ প্রবলভাবে অনুভব করেছে। বাংলাদেশী সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণে একদিকে বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও অন্যদিকে ইসলামপন্থী জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশকে বিভাজিত করে রেখেছে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোসেইন মহম্মদ এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী অনুসারে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সংবিধান ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। এর ফলে বাংলাদেশী সমাজে জামাত-ই-ইসলামির মতো রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বাড়তে থাকে। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরের বছর যুদ্ধ অপরাধের জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পাকিস্তানপন্থী গণহত্যাকারীদের বিচার করা। জামাত-ই-ইসলামির মতো ইসলামপন্থী দলগুলি এবং বিএনপিও এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকার ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন আটকাতে সংবিধান সংশোধন করেন। যদিও, ইসলামপন্থী শক্তিগুলির প্রবল বিরোধিতায় ২০১১ সালে তাঁর সরকারকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হয়েছিল। ধর্মীয় মৌলবাদের প্রাধান্য বাংলাদেশের সমাজে গভীর সামাজিক বিভাজন ও শত্রুতার জন্ম দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি, যেমন—হিন্দু, খ্রীস্টান এবং বৌদ্ধরা দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ এবং তারা সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে ভোট দিয়ে থাকে। জামাত-ই-ইসলামি বা 'হেফাজত-ই-ইসলাম বাংলাদেশ'-এর মতো কট্টর ইসলামপন্থী শক্তিগুলি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যের পক্ষে এক বিশাল বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই দশকে বাংলাদেশে জাতিদাঙ্গার ঘটনা ক্রমশঃ বাড়ছে ও তার সাথে সাথে জাতিভিত্তিক ক্ষুদ্র জাতিয়তাবাদী আন্দোলনও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় স্ব-নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জঙ্গি-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৯৭ সালে সরকার ও চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু, সরকার ও বিভিন্ন ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। সত্তার রাজনীতি বাংলাদেশী সমাজের মেরুকরণকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এই দ্বন্দ্বের সংস্কৃতিতে সমতা, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের মতো মৌলিক গণতান্ত্রিক গুণগুলি সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।

১.৯ নাগরিক সমাজের ভূমিকা

সমসাময়িক বিশ্বে রাষ্ট্র ও বাজারের বিপরীতে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি উন্নয়ণ ও গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যম হিসাবে একটি 'তৃতীয় ক্ষেত্র' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের মতাদর্শ ও আপেক্ষিক ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটা বলা যায় যে তৃণমূলস্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। নাগরিক সমাজকে ঐতিহাসিকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটি পাল্টা শক্তি হিসাবে এবং নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে দেখা হয়েছে। সমাজতন্ত্র-উত্তর বিশ্বে 'তৃতীয় ক্ষেত্র' হিসাবে নাগরিক সমাজের পুনরুত্থান

গণতন্ত্রীকরণের প্রবাহকে আরও শক্তিশালী করেছে। উন্নয়ণশীল সমাজে অ-সরকারি সংগঠন ও প্রবক্তা গোষ্ঠীগুলি (advocacy groups) প্রান্তিক জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে ও এই কাজের মাধ্যমে সমতা ও ন্যায়ের আদর্শকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে উন্নয়ণের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সমন্বয় ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। পশ্চিমী দাতা রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে এই সব সংস্থার মাধ্যমে অনেক অর্থ সহায়তা করে থাকে। এই রকম একটি জনপ্রিয় সংগঠন হল 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' যার নেতৃত্বে আছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মহম্মদ ইউনুস। 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' প্রান্তিক স্তরের মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্ব-ক্ষমতায়নের কাজে সহায়তা করে। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'-এর আন্দোলন নারীর ক্ষমতায়ণের পথে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অবশ্য, সমসাময়িক বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশই দ্বন্দ্বদীর্ণ হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক সহনশীলতার অভাবে এই সংগঠনগুলির পক্ষে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কাজ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। শাসক দল প্রায়ই নাগরিক সমাজ বা প্রবক্তা গোষ্ঠীগুলির মধ্যের বিদ্রোহী স্বরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকার উন্নয়নে অ-সরকারি সংগঠনগুলির কাজকর্ম ও তাদের আয়ের বিদেশী উৎসের ওপর নজরদারি করতে জাতীয় সামাজিক কমিশন (National Social Commission) গঠন করেছিল। কমিশনকে প্রয়োজনে এই সংগঠনগুলির অনুমোদন বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ২০০১ সালের মার্চ মাসে সরকার মহম্মদ ইউনুসকে দুর্নীতির দায়ে 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'-এর পরিচালন পর্ষদের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করে ও এই খবরকে কেন্দ্র বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শিরোনামে চলে আসে। এছাড়াও, এই ধরনের অনেক সংগঠন, বিশেষত অ-সরকারি সংগঠনগুলি দাতা রাষ্ট্র বা সংগঠনের স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেয় ও এইভাবে পশ্চিমী উন্নয়ন সাম্রাজ্যের এক সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

২০০৭ সালে তদারকি সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ (National Human Rights Commission Ordinance) জারি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির তদন্ত করা ও প্রয়োজনীয় বিবাদ নিষ্পত্তি করার কাজ করতে পারে। কিন্তু, কমিশন এই কাজ স্বাধীনভাবে এখনও করে উঠতে পারেনি। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও মানবাধিকার কর্মীদের প্রায়ই পুলিশী দমনপীড়ন, বিরোধী দলের নেতা, সাংবাদিক বা নাগরিক আন্দোলনের কর্মীদের সরকারের হাতে বেআইনি আটক ও হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে দেখা যায়। সামরিক শাসনের দিনগুলিতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গণ-আন্দোলনের নৃশংস দমনের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৯১ সাল থেকে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় রাশ টানার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, এখনও বাংলাদেশের সেনা বা সীমা নিরাপত্তা বাহিনী (BDR বা Bangladesh Rifles নামে পরিচিত)-র বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের প্রচুর অভিযোগ ওঠে। নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীগুলি সবসময়ই ক্ষমতার এই অপব্যবহার রুখতে সেনার ওপর গণতান্ত্রিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। বাংলাদেশের শ্রম আইন নিয়েও অনেক অসন্তোষ আছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির

কাজের ওপর সরকার নানাভাবে দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্পক্ষেত্র—বস্ত্র শিল্পে এই ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দল, সেনা বা আমলাতন্ত্রের মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বেড়ে চলা কার্যাবলী। ২০০৫ থেকে বাংলাদেশে কট্টর ইসলামী গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে ও সরকারের বিরুদ্ধে তাদের উগ্র সমর্থকদের সংগঠিত করে তুলছে। ২০০৫-এ দেশে একাধিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরে সরকার এই রকম দুটি উগ্রবাদী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে ব্যবহার করে বিদ্রোহী কাজকর্মে লাগাম টানতে সন্ত্রাসবিরোধী আইন (Anti-Terrorism Act) ও অবৈধ অর্থনৈতিক কাজ-প্রতিরোধী আইন (Laundering Prevention Act) অনুমোদন করেছে। এছাড়া, দেশের সীমা লঙ্ঘন করে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগে কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলির জাল বিস্তার, মাদক ও মানুষ পাচারের অন্যতম প্রধান চলাচলের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

১.১০ গণমাধ্যমের ভূমিকা

গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হল স্বাধীন ও সতর্ক গণমাধ্যম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ যখন সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হল, তখন সরকার ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক জনপরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি অন্যতম শর্ত ও তা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই অর্জন করা সম্ভব। ১৯৯০ সালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একটি যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে ক্রমশ বেড়ে চলা রাজনৈতিক অসহনশীলতা গণমাধ্যমের স্বাধীন ভূমিকাকে সীমিত করে দেয়। ১৯৯১ পরবর্তী পর্বে নানা সরকারি বাধানিষেধও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল লাইসেন্স ব্যবস্থা। বাংলাদেশের প্রায় সব সরকারই বিরোধী মিডিয়াকে দমন করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলি গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করার অভিযোগে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। ২০১০ সালে সরকার কিছু সংবাদমাধ্যম ও চ্যানেল বন্ধ করে তাদের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এগুলি মূলত সরকারের নীতির বিরোধিতা করছিল। এই সিদ্ধান্ত দেশে প্রবল সমালোচনা তৈরি করে। ২০০৯ সালে হাসিনা সরকার 'আমার দেশ' কাগজের সম্পাদক, মম্বুবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেন। রহমান সরকারের একজন বিরোধী হিসাবে ও 'আমার দেশ' বি এন পি-পন্থি সংবাদপত্র হিসাবে বাংলাদেশে পরিচিত। তাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই ধরনের ঘটনাকে ফৌজদারী মানহানি-সংক্রান্ত

আইন ব্যবহার করে বিরোধী স্বর নিশ্চুপ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখিয়েছেন। সংবাদ-মাধ্যমের রাজনীতিকরণের আরও একটি উদাহরণ হল রাজনৈতিক সংবাদপত্র, যা গণমাধ্যমের গণতান্ত্রিক ও প্রহরী ভূমিকাকে বিনষ্ট করে দেয়। মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলি প্রধানত দুটি বৃহৎ দলের কোনো একটির পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। বাংলাদেশে মূলধারার মিডিয়া ব্যবসার ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। এর ফলে গণমাধ্যমের গণতান্ত্রিক ভিত্তি সংকটের সামনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কোনও সরকারই গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি এখনও বাস্তবায়িত করেনি।

১.১১ পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক

বাংলাদেশে সাবেকী নীতি, প্রথা ইত্যাদি সামাজিক সম্পর্কের চরিত্রকে নির্ধারণ করে থাকে। এই প্রবণতা গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে অসমাপ্ত রেখে দেয়। স্ট্যানলি কোচানেক-এর মতে: "...বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পিছনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে যা জটিল পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক, সেকেলে নিয়মকানুন ও একটি মিশ্র আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তা সংস্কারের প্রক্রিয়াকে দুরূহ করে তোলে।" (সূত্র: কোচানেক, এস এ (২০০০) "গভর্ন্যান্স, প্যাট্রিনেজ পলিটিকস্ এন্ড ডেমোক্রেটিক ট্র্যাঞ্জিসন ইন বাংলাদেশ", *এশিয়ান সার্ভে*, ভলিউম ৪০ নং ৩, মে-জুন, পৃ. ৫৩৯) বাংলাদেশে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা ঐতিহাসিকভাবে এলিট শ্রেণীর হাতে, বিশেষত ভূস্বামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। স্তরবিন্যস্ত সমাজ কাঠামো বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাহায্যে পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি আনুগত্য যা সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসে আনুভূমিক গণতান্ত্রিক বন্ধন গড়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তির সম্পদের ওপর বেশি অধিকার আছে, অর্থাৎ যিনি পৃষ্ঠপোষক, তিনি মক্কেল বা গলগ্রহদের থেকে আনুগত্য লাভ করেন। এর ফলে কর্তৃত্ববাদী সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি জন্মের পথ প্রশস্ত হয়। পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক নির্বাচনী রাজনীতির আঙিনায়, সরকারি পরিষেবায় বা অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়। সমালোচকদের মতে এই ধরনের সম্পর্ক একটি শক্তপোক্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে বাংলাদেশের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। যদিও বাংলাদেশ গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করে ফেলেছে। পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক বাংলাদেশের দল ব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও বিদ্যমান ও তার ফলে রাজনীতিতে ক্যারিশমা-ভিত্তিক নেতৃত্ব সেই দেশে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বংশানুক্রমিক সমাজের স্তরবিন্যস্ত কাঠামো বর্ণ, জাতিসত্তা, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভাজনের কারণে আরও সংহত হয়। সমাজের প্রকট বিভাজন বাংলাদেশে চরম অনৈক্য ও গোষ্ঠী বিবাদের জন্ম দিয়েছে।

১.১২ সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণই সাফল্যের মাপকাঠি নয়। যেটা জরুরি সেটা হল গণতান্ত্রিক শাসনের সংহতকরণ বা গণতন্ত্রকে গভীরতর স্তরে নিয়ে যাওয়া। এই কাজে অন্যতম প্রধান উপায় হল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচরণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। আইনসভা, রাজনৈতিক দল বা নাগরিক সমাজের মতো প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা এই ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক শর্ত। গণতান্ত্রিক উত্তরণের স্থায়ীত্ব বজায় রাখতে বিচারবিভাগ, সংবাদমাধ্যম বা আমলাতন্ত্রের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। কোনও সমাজের গণতন্ত্রীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সুস্থিতির মাত্রা। ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ সফলভাবে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। কিন্তু, দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি এখনও বাস্তবায়িত করা যায় নি। গণতান্ত্রিক শাসন সংহতকরণের পথে নাগরিক সচেতনতার অনুপস্থিতি ও সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব বড় বাধা হিসাবে কাজ করে। কোচানেক-এর মত অনুসরণ করে উপসংহারে বলা যায়: "বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কার শুধুমাত্র নিয়ম, নীতি বা কাঠামোর পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে আরও কিছু দাবি করে। সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয় হল প্রচলিত আচার-আচরণের পরিবর্তন, ঐক্যমতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি স্বপ্ন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।" (সূত্র: কোচানেক, এস এ (২০০০) "গভর্ন্যান্স, প্যাট্রনেজ পলিটিকস্ এন্ড ডেমোক্রেটিক ট্র্যাঞ্জিসন ইন বাংলাদেশ", *এশিয়ান সার্ভে*, ভলিউম ৪০ নং ৩, মে-জুন, পৃ. ৫৪৯)

১.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. ১৯৯১ সাল থেকে সাংবিধানিক গণতন্ত্র শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সমস্যাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভঙ্গুর অবস্থার পিছনে গণ দায়বদ্ধতার অভাব একটি বড় কারণ? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. সাম্প্রতিক বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের ভূমিকার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. ২০০৭ সালের পর থেকে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত করেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক বিষয়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. বাংলাদেশের দল ব্যবস্থার প্রকৃতি গণতন্ত্রের কার্যাবলীতে কি ধরনের প্রভাব ফেলে?

১.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kochanek.S.A (2000) "Governance, Patronage Politics and Democratic Transition in Bangladesh", Asian Survey, Vol. 40, No.3, May-June.

2. Meisburger, T(2012) Strengthening Democracy in Bangladesh", The Asia Foundation, Occasional Paper, No. 13, June.

একক ২ ☐ নেপালের গণতান্ত্রিক উত্তরণ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

২.৪ সাংবিধানিক সংস্কারের সূত্রপাত

২.৪.১ মাওবাদী রাজনীতির উত্থান

২.৫ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান

২.৬ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বসমূহ

২.৬.১ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা: ২০০৭

২.৬.২ সংবিধান পরিষদ নির্বাচন: ২০০৮

২.৬.৩ সরকার গঠনে দ্বন্দ্ব

২.৭ গণতান্ত্রিক উত্তরণের শেষপর্ব

২.৮ সারসংক্ষেপ

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- নেপালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বসমূহ সুস্পষ্ট করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা
- নেপালের মাওবাদী রাজনীতির বিহষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- নেপালের সাংবিধানিক সংস্কারের পর্বগুলি বষয়ে সম্যক ধারণা লাভে সহায়তা করা।

- নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের মাওবাদী ও সংসদীয় রাজনৈতক দলগুলর মধ্যে বতর্ক, টানাপোড়েনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

বহুদলীয় গণতন্ত্রের দাবীতে গড়ে ওঠা এক দীর্ঘ আন্দোলনের পরিণতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক নেপালের জন্ম হয় ২০০৭ সালে। নেপালের সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক উত্তরণের ইতিহাস খুঁজে পেতে ফিরে যেতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, বিশেষত ১৯৯০-এর দশক থেকে নেপালের রাজনীতিতে ঘটে চলা সাংবিধানিক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে। এই পর্বে নেপালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধরণগুলি তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল রাজতান্ত্রিক ও রাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব। ২০০১ সালে রাজা বীরেন্দ্র ও তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের হত্যাকাণ্ডের পরে এই দ্বন্দ্ব একটি চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। র‍্যাডিকাল বামপন্থী ও সংসদীয় দলগুলির নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের জোয়ার নেপালি জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জারিত করেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল চাপে নেপালে দীর্ঘদিনের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে ২০০৭ সালে। ২০০৪ সাল পরবর্তী পর্বে নেপালের রাজনীতির মূল বিষয় ছিল শান্তি ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবী, রাজতন্ত্রবাদী বনাম গণতান্ত্রিক শক্তির লড়াই অথবা মাওবাদী শক্তির বিদ্রোহ নেপালে প্রবল অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল। ২০০৮ সালে একটি প্রজাতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের মাধ্যমে ও বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার ভিত্তিতে তৈরি সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এই দীর্ঘকালীন অরাজকতার অবসান ঘটে।

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অধীনে নেপালে একটি ঐতিহ্যশালী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বৃহত্তর বিশ্ব থেকে আপাত দূরত্বে গড়ে ওঠা বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসন নেপালে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত হিন্দুধর্ম নেপাল রাষ্ট্রের সরকারি ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোর্খাশাসক পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্ ও তার পরবর্তী বংশধরগণ সামরিক শাসনের সহায়তায় নেপালকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেন। শাহ্ রাজবংশের শাসন উৎখাত করেছিল রানা-রাজবংশ (১৮৪৬-১৯৫০)। রানা-রাজবংশের অধীনে একটি বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীত্বের ব্যবস্থা স্থাপিত হয় এবং রাজা একজন নামমাত্র শাসকে পরিণত হন। ১৯৪০-এর দশকের শেষপর্ব থেকে রানা রাজবংশ-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে নেপালে গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালে রাজা ত্রিভুবন ভারতে তাঁর স্ব-আরোপিত নির্বাসন থেকে ফিরে এসে নেপালি

কংগ্রেস (Nepali Congress) দলের সাহায্যে সরকারের ক্ষমতা দখল করেন। এর ফলে নেপালে রানা-রাজবংশের অবসান ঘটে। যদিও রাজা ত্রিভুবন সেই সময় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে চরম রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রসার ঘটান। তাঁর পরে রাজা মহেন্দ্র ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর আমলে একটি গণতান্ত্রিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে জনগণের দাবী মেনে নিতে রাজতান্ত্রিক শাসকগণ বাধ্য হন।

১৯৫৯ সালে নেপালে প্রথম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নয়টি রাজনৈতিক দল তাতে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস দল বিপুলভোটে জয়ী হয়। নেপালী কংগ্রেস দল ৩৭.২ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৪টি আসনে জয়ী হয়; গোর্খাপরিষদ ১৯টি আসনে জয়লাভ করে দ্বিতীয় স্থান পায়। কমিউনিস্ট পার্টি (নেপাল) ৭.২ শতাংশ ভোট পেয়ে কেবলমাত্র ৪টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৯৬০ সালে রাজা মহেন্দ্র অবশ্য আচমকা নির্বাচিত সংসদ ভেঙ্গে দেন ও দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি করেন। একইসাথে তিনি দেশে সব ধরনের রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফলে নেপালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনরায় সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা বীরেন্দ্র গণতন্ত্রের দাবীতে জনআন্দোলনের চাপে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নেপালি কংগ্রেস দল, ইউনাইটেড বামফ্রন্ট (United Left Fornt) ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দলগুলি এই জনআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। জনআন্দোলন নেপালে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কারের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর ফলে নেপালে একটি বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে নবনির্বাচিত সংসদ নেপালের পঞ্চম সংবিধান গ্রহণ করে।

২.৪ সাংবিধানিক সংস্কারের সূত্রপাত

১৯৯০ সালে গৃহীত নেপালের পঞ্চম সংবিধানকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সংবিধানের মূল নীতি ছিল জনগণের সার্বভৌমিকতা এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। সুতরাং সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা জনগণের হাতে অর্পিত হল ও রাজা দেশের প্রধান হিসাবে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারলেন। পঞ্চম সংবিধান আইনের শাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সাথে মৌলিক মানবিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, বিশ্বাস ও সমাবেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আইন নিশ্চয়তা দিয়েছিল। সংবিধানে নেপালি সমাজের ধর্মীয় ও জাতিগত বৈচিত্র্যের ধারণা স্বীকৃতি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে বহুদলীয় ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে নেপালে নির্বাচন সংগঠিত হয় যেখানে গড়ে ৬০ শতাংশের ঊর্ধ্বে অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনাপ্রবাহ মানুষের একটি গণতান্ত্রিক সরকারের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে ধরা যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসাবে ৩৬.০৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (উমালে) [CPN(UML)] ৩০.০৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে তার জনভিত্তি ও

জনসমর্থন সংহত করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে ও সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই রাজনৈতিক দলগুলি অনেকাংশে আঞ্চলিক বা জাতিগত সত্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।

১৯৯০ সালের প্রথম দিক থেকে গড়ে ওঠা এই নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা নানাভাবে দুর্বল ছিল। জনপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও এই শাসনব্যবস্থায় কিছু অভিজাত ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া সরকারের স্থায়িত্ব সর্বদা সুনিশ্চিত ছিল না। এই সময় থেকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আন্দোলনগুলিও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যদিও নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সরকারিভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সামাজিক অসাম্যের দীর্ঘ ইতিহাস নেপালে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতি তৈরিতে বাধার সৃষ্টি করেছিল। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি গ্রামাঞ্চলে খুব মজবুত ছিল না। ফলে আঞ্চলিক ও জাতিসত্তা-ভিত্তিক শক্তিগুলি তাদের পরিচিতির আন্দোলনকে বিস্তার করতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছিল। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আন্দোলনগুলি নেপালে প্রায়শই সহিংস রাজনৈতিক বিদ্রোহের আকার নিতে থাকে ও দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ প্রকৃত অর্থে ছিল খুবই সীমিত। নেপালি সমাজের ধনী অংশের দ্বারা সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিকভাবেও শোষিত হত। নেপালের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতির ব্যক্তিত্বকরণের প্রবণতা। এর অর্থ হল, রাজনৈতিক নীতিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় কয়েকজন নেতার আধিপত্য বিস্তার। রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির মধ্যে বিভাজনের কারণে রাজনৈতিক ঐক্যেরও প্রবল অভাব ছিল। এর ফলে জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও আলোচনার পরিধি ছিল খুবই সীমিত। ১৯৯০-এর দশক থেকে নেপালে অবশ্য ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজের, বিশেষত গণমাধ্যমের উত্থান দেখা যেতে থাকে। নাগরিক সমাজ রাজতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ও একটি দায়বদ্ধ ও সংবেদনশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পরিসর গড়ে তুলেছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি অবশ্য রাজতন্ত্র-বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল এবং সেই অর্থে কোন শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক কর্মপ্রক্রিয়া গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২.৪.১ মাওবাদী রাজনীতির উত্থান

১৯৯০-এর দশকে, দ্বন্দ্ব-দীর্ণ নেপালের রাজনীতি র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী আন্দোলন বা মাওবাদী আন্দোলনের প্রভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) পরিচালিত 'জনযুদ্ধ' (people's war)-এর ডাকে নেপালে বিদ্রোহী রাজনীতির সূচনা হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন পুষ্পকুমার দহল, যিনি প্রচণ্ড নামে নেপালে জনপ্রিয়। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) অন্যান্য বামপন্থী দল, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (উমালে)-গৃহীত সংসদীয় পথ বর্জন করার ডাক দেয়। তারা স্বৈরতান্ত্রিক

রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসানের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানায়। মাওবাদী রাজনৈতিক নেতারা ১৯৭০-এর দশক থেকে নেপালে জনসমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে তাঁদের জনভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁরা মূলত গুপ্ত অবস্থায় তাঁদের রাজনৈতিক কাজ চালাতেন। ১৯৯১ সালে তাঁরা তাঁদের প্রকাশ্য গণসংগঠনের, যেমন সংযুক্ত জন মোর্চার (United People's Front) সাহায্য নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন এবং নয়টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। সংযুক্ত জন মোর্চা ছিল কমিউনিস্ট গোষ্ঠী একতা কেন্দ্র (Unity Centre)-র প্রকাশ্য সংগঠন। এই সংগঠনটি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে ও ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দেয় ও গেরিলাযুদ্ধের কৌশলগ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে মাওবাদীরা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (উমালে)-পরিচালিত সরকারের কাছে 'জাতীয়তাবাদ, জনগণতন্ত্র ও জনজীবিকার অধিকার' এর ওপর একটি ৩৮ দফা দাবী সনদ পেশ করেছিল। তাঁরা ১৯৯৪ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচন বয়কটেরও ডাক দেয়। জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে তাঁরা সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলে ও প্রবল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন দেউবা সরকারের কাছে তাঁরা আবার ৪০-দফা দাবী পেশ করেছিলেন এবং সরকারকে সেই দাবী পূরণের জন্য চরম সময়সীমা বেঁধে দেন। কিন্তু সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই মাওবাদীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করেন। মাওবাদীরা সমস্তরকমের রাজতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা ও সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বাতিলের দাবী তোলেন। তাঁদের দাবী ছিল নেপালে অর্থনৈতিক সম্পদের জাতীয়করণ ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা একটি সংবিধান পরিষদের দাবী পেশ করেন যা এইসব দাবিদাওয়া পূরণের জন্য একটি নতুন সংবিধান তৈরিতে সাহায্য করবে। মাওবাদীরা এই সব দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ জনগণের মধ্যে ভাল সমর্থন তৈরি করতে পেরেছিল ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁদের সামরিক শক্তিতে সংহত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁরা তাঁদের সামরিক সংগঠন, জনমুক্তি ফৌজ (People's Liberation Army)-এর সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে সমান্তরাল সরকার গড়ে তুলতে থাকে। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে নেপালে মাওবাদী বিদ্রোহ একটি চরম সশস্ত্র সংগ্রামের আকার নিলে সরকার জরুরী অবস্থা জারি করে। এই আন্দোলন দমনে সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করায় অজস্র সাধারণ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দীর্ঘ সংঘাতের পর অবশেষে ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে উভয়পক্ষ অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে শান্তি আলোচনায় রাজী হয়। কিন্তু এই শান্তিপ্রক্রিয়াও ছিল ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই সেনাবাহিনী ও মাওবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় ও নেপালের গণতন্ত্রের ভাগ্যাকাশে আবার অনিশ্চয়তার মেঘ জমতে থাকে। পরবর্তীকালে মাওবাদী আন্দোলনের মূলস্রোতে ফিরে আসা নিয়ে টানাপোড়েনের ওপর নেপালের গণতান্ত্রিক উত্তরণের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করেছে।

২.৫ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান

২০০১ সালের জুন মাসে রাজা বীরেন্দ্র ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবারকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে রহস্যজনকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতালাভ করেন। রাজা বীরেন্দ্র ও তাঁর পরিবারের রহস্যজনক মৃত্যুতে তাঁর ভাই জ্ঞানেন্দ্রর বিরুদ্ধে নেপালে প্রবল জনরোষ দেখা দেয়

ও রাজতন্ত্রের বিরোধিতা তুঙ্গে ওঠে। এর ফলে প্রথম থেকেই রাজা জ্ঞানেন্দ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হন ও দেশে শান্তিস্থাপনে ব্যর্থ হন। রাজা হওয়ার পরই তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন ও জনগণের নাগরিক অধিকারগুলি সঙ্কোচন করতে সামরিকবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করতে থাকেন। এমনকি যে দলগুলি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিল তাদেরও তিনি দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। ২০০২ সালে জ্ঞানেন্দ্র নেপালে জরুরী অবস্থা জারি করে সমস্ত স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দেন ও তৎকালীন দেউবা সরকারকে খারিজ করে দেন। এর ফলে নেপালে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার নেয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মাওবাদীরা যদিও নীতিগত ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ বর্জন করেছিল, তাঁরা কিন্তু রাজতন্ত্র-উত্তর নেপালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় কৌশলগত অংশগ্রহণ করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাওবাদী নেতৃত্ব ও সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সরকার মাওবাদীদের এই দাবী মেনে নেয়নি যে রাজতন্ত্রের ভাগ্য নির্ধারণে সংসদের নির্বাচন ডাকতে হবে। ফলে শান্তি আলোচনার পথ অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলে ও রাজতন্ত্রের সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সূর্যবাহাদুর থাপাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এই পরিস্থিতিতে রাজা জ্ঞানেন্দ্র জরুরী অবস্থা জারি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে নেন। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে সব রাজনৈতিক দল, এমনকি মাওবাদীরাও রাজনৈতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে একটি ১২ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করে। মাওবাদীদের সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব দলই শান্তিপূর্ণ পথে দেশে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠনে সম্মত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) ঘোষণা করে যে, যদি সরকার তাদের নির্বাচিত সংবিধান পরিষদের দাবী মেনে নেয় তবে তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারে অংশ নেবে। রাজা জ্ঞানেন্দ্রর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভেঙ্গে দেওয়া সংসদের সাতটি দল একজোট হয়ে সাতদলের জোট (Seven Party Alliance) তৈরি করে ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মাওবাদীদের সাথে হাত মেলাতে রাজী হয়। সব দলগুলির মিলিত সভায় স্থির হয় যে রাজতন্ত্রের ভাগ্যনির্ধারণে একটি গণভোটের আয়োজন করা হবে। ২০০৬ সালে 'জনযুদ্ধ' সব দলের সম্মিলিত আন্দোলনে একটি উত্তুঙ্গ চেহারা নেয় ও রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের জন্ম হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে এপ্রিল মাসে রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসানের সাথে সাথে নেপালে গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। নেপালি কংগ্রেসের নেতা গিরিজা প্রসাদ কৈরালা ২০০৬ সালের ৩০ এপ্রিল নতুন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাজার বিপক্ষে মামলা না করতে পারার যে ছাড় নেপালে প্রচলিত ছিল তা নতুন সরকার বাতিল করে দেয় এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর নতুন নামকরণ হয় নেপাল সেনাবাহিনী (Nepal Army)। ২০০৬ সালের মে মাসে সাতদল ও মাওবাদীদের জোট সংসদের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ঘোষণা করেছিল, যাকে নেপালের *ম্যাগনাকার্টা* (Magna Carta) বলা যায়। জুন মাসে তারা একটি ৮

দফা চুক্তি করে যেখানে সব দলগুলি বহুদলীয় গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। সেই বছরে নভেম্বর মাসে মাওবাদীরা অস্ত্রবিরতিতে রাজী হয় ও দশ বছরের বিদ্রোহ পর্ব শেষ করে একটি সর্বাঙ্গীণ শান্তিচুক্তি (Comprehensive Peace Agreement) স্বাক্ষর করে। সাতদল ও মাওবাদীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সংবিধান রচনার লক্ষ্যে একটি অন্তর্বর্তী সংসদ গঠন করা হয়।

২.৬ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বসমূহ

শান্তিপূর্ণ পথে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য। নেপালে পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গণঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি একটি সাংবিধানিক শাসনকাঠামো ও বহুদলীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবর্তিত হয়েছিল। এই পর্বে সংবিধান ও সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য ও সহমতের এক অভূতপূর্ব সহাবস্থান দেখা যায়। বিশেষত সরকার ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হবে তাই নিয়ে প্রবল আলোচনা চলতে থাকে। এই শান্তি আলোচনা পর্বে মাওবাদীরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে গেছে ও তার ফলে অনেক সময়ই আলোচনা ভেস্তে যেতে থাকে। সংবিধান পরিষদের মতো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের গণতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে বা ভোটাধিকারের মতো বিষয়ে নেপালি জনগণের নাগরিক সচেতনতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব কম ছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে সহমত স্থাপনে নেপালে একটি বড় বাধা ছিল সত্তা-ভিত্তিক রাজনীতির প্রাধান্য। রাজনীতিতে এলিট প্রাধান্যের ফলে পিছিয়ে পড়া বা দেশীয় সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে নি। সাধারণভাবে, নেপালে রাজতন্ত্র-পরবর্তী পর্বে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া তাই অনিশ্চয়তা ও দোলাচলের মধ্যে পড়েছিল।

২.৬.১ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা: ২০০৭

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী সংবিধান তৈরি হওয়ার পরেও প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া একটি দিশাহারা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। অনেক আলাপ-আলোচনার পর এপ্রিল মাসে মাওবাদীরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করতে রাজী হয়। গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নেপালে একটি মিশন (UNMIN) প্রেরণ করেছিল। এই মিশন নির্বাচন ও অস্ত্র বিরতি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে দায়বদ্ধ ছিল। অন্তর্বর্তী সংসদ রাজনৈতিক ফয়সালার প্রশ্নে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে ও মাওবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তীব্র বিভাজন তৈরি হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) একটি ২২ দফা সংবিধান সংশোধনী গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে থাকে যেখানে সংসদ দ্বারা অবিলম্বে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবী এবং গণমুক্তি ফৌজ ও নেপালের সামরিক বাহিনীকে সংযুক্তিকরণের কথা বলা হয়েছিল। মাওবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ একটি চরম

জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় ও মাওবাদীরা সরকার থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি দেয়। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত নভেম্বর মাসের নির্বাচন শেষ পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। নির্বাচনী অনিশ্চয়তা ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়ায় টালমাটাল নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় ও তার ফলে অন্তর্বর্তী সংস্কারের বৈধতাই সংকটের মুখে পড়ে যায়। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতিভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের দাবীতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবী তোলে। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের দলও গড়ে তোলে, যেমন—তরাই মাধেশ লোকতান্ত্রিক দল (Terai Madhes Loktantrik Party), নেপাল সদ্‌ভাবনা দল (Nepal Sadbhabna Party), মাধেশি জনঅধিকার ফোরাম (Madhesi Jana Adhikar Forum)। এদের আন্দোলন মাঝে মাঝেই হিংসাত্মক হয়ে ওঠায় সরকারকে বিরোধ দমনে বলপ্রয়োগ করতে হয়। এই দ্বন্দ্বের মাঝে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদের সদস্যরা মাওবাদীদের আনা একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন যাতে নেপালকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছিল। এই সংসদীয় প্রস্তাবটিতে অবশ্য সংবিধান পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। অন্তর্বর্তী সংসদ সংবিধান পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তির কাছে নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ এর মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া সংহত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার ছিল।

২.৬.২ সংবিধান পরিষদ নির্বাচন : ২০০৮

নেপালে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে ১০ই এপ্রিল, ২০০৮ সালের সংবিধান পরিষদের নির্বাচন আরও একটি বড় ধাপ ছিল। নির্বাচন প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব ও মনোনয়ন ব্যবস্থা দু'টির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছিল এবং ৫৪টি দল এতে অংশ নিয়েছিল। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ের আসনের জন্য সমস্ত দেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ২৪০টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ৩৩৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হল যেখানে রাজনৈতিক দলগুলি সমগ্র দেশে একটি মাত্র নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ২৬ জন সদস্যের তৃতীয় দলটিকে ক্যাবিনেট মনোনীত করেছিল দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে। নির্বাচনী প্রচারের সময় রাজনৈতিক বিবাদ তুঙ্গে ওঠে; সশস্ত্র সংগঠনগুলির হিংসাত্মক আন্দোলন নির্বাচনী রাজনীতিকে উত্তাল করে তুলেছিল। মাওবাদীরা, বিশেষত তাদের যুব শাখা, ইয়ুথ কমিউনিস্ট লীগ (YCL) উগ্র রাজনীতির অন্যতম সংগঠক হিসাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে নিজেদের সমর্থনে তাঁরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাওবাদী ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে এবং নেপালি রাজনীতিতে একটি মেরুকরণের চিহ্ন স্পষ্ট চেহারা নেয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও শান্তিস্থাপনের প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিশেষত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ একটি স্বাধীন নির্বাচনী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক দল (Independent Electral Expert Monitoring Team) তৈরি

করেছিল। তাছাড়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য নেপালে অসংখ্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকও নিয়োজিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছিল। এই নির্বাচনে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় মাওবাদী কমিউনিস্ট দল তাদের নির্বাচনী প্রচার ও কৌশলকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল ও তারা একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল বেশ ভাল; প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ের আসনের জন্য ৫৪টি দল ও নির্দল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট দলগুলির আভ্যন্তরীণ বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে কারণ দশটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। মাওবাদী কমিউনিস্ট দল ২৯.২৮ শতাংশ ভোট ও ২২০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে জয়ী হয়। নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে। নেপালি কংগ্রেস ১১৩টি আসন ও কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) ১০৩টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। তরাই-ভিত্তিক মাধেসি জন অধিকার ফোরাম ৫২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। জাতিসত্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অন্যান্য দলগুলিও নির্বাচনে ভাল ফল করতে পেরেছিল। গণতন্ত্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা রক্ষা করা। সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে ২৯জন মহিলা প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে, ৫৪৪জন পুরুষ প্রার্থী পরিষদে নির্বাচিত হন। সুতরাং, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নেপালে মহিলাদের অবস্থান ছিল প্রান্তিক। রাজতন্ত্রের সমর্থক দলগুলি এই নির্বাচনে খারাপ ফলের মুখোমুখি হয়। কমিউনিস্ট দলগুলির রাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে যে ব্যাপক জনসমর্থন বাড়ছিল, তা নির্বাচনের ফলেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষতঃ একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গঠনের দাবী জোরালো হয়ে উঠেছিল। নেপালের প্রান্তিক ও দেশীয় জনসমাজের মধ্যে মাওবাদীদের সাংগঠনিক ভিত্তি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট দলগুলি সাধারণ নির্বাচনে খারাপ ফল করেছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট দলগুলি মিলিত ভাবে ৩৪৩টি আসন লাভ করে ও মোট আসনের অর্ধেকের বেশি আসনে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে নেপালি কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠিত দলগুলির সাবেকি রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষ আর পছন্দ করছিল না। এর পিছনে একটি বড় কারণ হল এই দলগুলি নেপালের উচ্চ বর্ণের হিন্দু এলিটদের স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিত।

২.৬.৩ সরকার গঠনে টানাপড়েন

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর নেপালে গণতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল কারণ র‍্যাডিক্যাল বামপন্থীরা ও সংসদীয় দলগুলি একটি নতুন সরকার গঠনে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরিতে একটি সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে হাত মিলিয়েছিলেন। অন্তর্বর্তী সংবিধানের ৩৮

নং ধারা শাসনব্যবস্থায় সহমত তৈরির ওপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু সুস্থিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে রাজনৈতিক মতবিনিময়ের প্রক্রিয়ায় প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া, সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। এর ফলে নতুন সরকারের নেতৃত্বে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত দলগুলির পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের কারণে দূষিত হয়ে উঠেছিল। সহমত-ভিত্তিতে রাজনীতি নির্মাণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ২০০৮-পরবর্তী নেপালে গণতন্ত্র স্থাপনের বিষয়টি প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার সফল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর অনেকটা নির্ভর করেছিল। এটা বলা যায় যে, নেপালে রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে উত্তরণের পথটি সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হয়ে ছিল, যদিও মাঝেমধ্যে হিংসাত্মক আন্দোলন ঘটেছে। নির্বাচনের পরে অবশ্য গৃহযুদ্ধের সমস্যাগুলি মিটিয়ে এবং বিভিন্ন জাতি-ভিত্তিক জনসমাজের দাবিদাওয়া পূরণ করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সংহত করাই ছিল মূল কাজ। রাজতন্ত্রের অবসানের পর অর্ন্তবর্তী সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অনুসারে ২০০৮ সালের ১৪ই জুলাই নেপালে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হল।

সংবিধান পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৮ মে। এই সভা নেপালকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে। সংবিধান পরিষদ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও নতুন সরকার তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্তর্বর্তী সংবিধান নির্বাচিত দলগুলির মধ্যে থেকে সহমতের ভিত্তিতে সরকার গঠনের কথা বলেছিল। সংবিধান অনুসারে স্থির ছিল যে যদি সহমতের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা না যায় তবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে তাঁকে নির্বাচন করা হবে। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের এই ধারাগুলি পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কারণ সরকারের প্রকৃতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রবল বিতর্কের সূচনা হয়। মাওবাদীরা একটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে সরকার গঠন তিনমাস পিছিয়ে যায়। তাছাড়া, তাঁরা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন যেখানে প্রান্তিক জনসমাজগুলির দীর্ঘকালীন স্বার্থগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থা সত্ত্বর আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা এমনকি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন। মাওবাদীদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য তিনটি দল—নেপালি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) ও মাধেসি জন অধিকার ফোরাম একজোট হয়ে লড়াই করতে সম্মত হয়। অনেক টালবাহানার পর মাওবাদী নেতৃত্ব অবশ্য এই জোট ভাঙ্গতে এবং কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) ও মাধেসি জন অধিকার ফোরামকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র নেতা প্রচণ্ড নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হলেন ও তাঁর হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করা হল। নেপালি কংগ্রেস-এর নেতা রামবরণ যাদব নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা নির্বাচিত হন। এই পর্বে মাওবাদীরা ছোট ছোট কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করেন এবং তাদের দলের নতুন নামকরণ

হয়—সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী) [Unified Communist Party of Nepal (Maoist)]। তাঁরা মূলধারার সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রথম থেকেই মাওবাদীদের সাথে সরকারে তাঁদের প্রধান শরিকদলগুলির মতপার্থক্য ঘটতে থাকে। এই বিরোধের মূল বিষয় ছিল মাওবাদীদের সামরিক সংগঠন, জনমুক্তি মোর্চাকে নেপালের সরকারি সেনার সাথে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব। মাওবাদী যোদ্ধারা রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্রবিরতি মিশনের অধীনে তখন নেপালের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সামরিক ছাউনিগুলিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। এছাড়াও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদগুলির পুনর্গঠন, সরকারে দেশীয় জনজাতিগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব বা বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ-এর প্রশ্নগুলি নিয়েও বিরোধ দেখা দিয়েছিল। আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলিও নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে জনজাতিগোষ্ঠীগুলির জন্য স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তাদের উগ্রবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সরকার ২০০১ সালে রাজপ্রাসাদে ঘটা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ঘোষণা করলেন যাতে রাজা জ্ঞানেন্দ্র-র ওপর চাপ বাড়ানো যায়। যদিও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা থেকে তাঁকে আগেই বঞ্চিত করা হয়েছিল। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সরকার সেনাবাহিনীর আটজন প্রধানকে অবসরগ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিরোধ চরমে ওঠে। বিরোধী দলগুলি বা সুপ্রিমকোর্ট এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করেন। সমস্ত বিরোধী দল তাঁর এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেনাপ্রধানের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। দুটি দল এমনকি সরকার থেকে পদত্যাগও করে ও তার ফলে প্রচণ্ড সরকারকে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হতে হয়। রাষ্ট্রপতি রামবরণ যাদবও সেনাপ্রধানের পক্ষ নেন ও প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। প্রবল মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডকে ২০০৯ সালের ৪ মে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়।

সরকারের পতনের ফলে নেপালে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্থিরতা সমাজের নানাস্তরে নাগরিকদের মধ্যে অশান্তির জন্ম দেয়, বিশেষত জনজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান অচলাবস্থা দূর করতে কুড়িটি দল ৫ই মে কাঠমাণ্ডুতে মিলিত হয়ে একটি নতুন জোট সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। মাওবাদীদের সরকারে ফিরিয়ে আনার কাজটি অবশ্য ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি নতুন জোটকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান ও অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট নেতা মাধব কুমার নেপালকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। মাওবাদীদের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে ২২টি দলের নতুন জোটসরকার ২৩ মে শপথগ্রহণ করে। নতুন সরকার প্রথম থেকেই মাওবাদীদের চরম বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। মাওবাদীরা সেনাবাহিনীর ওপর নাগরিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন এবং অচিরেই তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এমনকি তাঁরা তেরোটি জনজাতি ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর স্বাধীন রাজ্য গঠনের একতরফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেন। এই ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের ফলে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১০ সালের ২৮ মে

নেপালের নতুন সংবিধান তৈরির যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল তা সংসদের পক্ষে এর ফলে রাখা সম্ভব হল না। বিভিন্ন দলের মধ্যে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা গিয়েছিল তা হল রাষ্ট্রপতি-শাসিত না সংসদীয় সরকার হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি কি হবে।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধান প্রধান দলগুলি একটি উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সম্মত হয়। প্রধানমন্ত্রী মাধবকুমার নেপাল, নেপালি কংগ্রেস নেতা জি.পি. কৈরালা ও মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড শান্তি ও সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাওবাদীরা তাদের ডাকা অনির্দিষ্টকালের 'জনযুদ্ধের' ডাক তুলে নিতে ও একটি জাতীয় সরকারের জন্য কাজ করতে সম্মত হন। অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করতে ও একটি নতুন সংবিধান তৈরি করতে আবার ২০১১ সালের ২৮ মে একটি নতুন সময়সীমা স্থির করা হয়। কিন্তু নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধিতা বাড়তে থাকে এবং রাজনৈতিক সমাধানও ক্রমশঃ অধরা হতে থাকে। মাওবাদীদের সাথে পার্থক্যের ফলে তৈরি অচলাবস্থা দূর করতে শেষপর্যন্ত ২০১০ সালের ৩০ জুন মাধবকুমার নেপাল পদত্যাগ করেন। তিনি অবশ্য শান্তিপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে তদারকি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হন। তাছাড়া, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করতেও সম্মত হয়। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাধান অধরা থেকে যায় ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলতে থাকে। মাওবাদীরা তাঁদের পুরনো দাবী, অর্থাৎ জনমুক্তি সেনাকে নেপালের সেনাবাহিনীর সাথে সংযুক্তিকরণের দাবীতে অনড় থেকে যান। ফলে তরাই ও দক্ষিণের অন্যান্য অংশে স্বাধীনতার দাবীতে তাঁদের নেতৃত্বে উগ্রবাদী কার্যকলাপ চলতে থাকে। ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলিও আশঙ্কা করেছিল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বড় বড় প্রতিষ্ঠিত দলগুলিই তাদের আধিপত্য বজায় রেখে দিতে সমর্থ হবে।

২.৭ গণতান্ত্রিক উত্তরণের অন্তিম পর্যায়

নতুন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হল ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে)-র নেতা ঝালানাথ খালান-এর পক্ষে তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে সরকার পরিচালনায় সাত মাসের অচলাবস্থার অবসান ঘটে। মার্চ মাসে মাওবাদীরা ১১টি মন্ত্রিত্বপদ নিয়ে সরকারে যোগদান করেন ও শান্তিপ্রক্রিয়ায় আবার গতিসঞ্চার হয়। সব দলগুলিই ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে শান্তিস্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করতে সম্মত হয়। কিন্তু একইসাথে মাওবাদীরা জোর করতে থাকেন যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঝালানাথকে পদত্যাগ করতে হবে ও একটি 'সহমতের সরকার' গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

এই সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলিকে কেন্দ্র করে নেপালের রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের বিভাজন প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রসংঘের মিশন শান্তিপ্রক্রিয়া পরিচালনায় ও মাওবাদী যোদ্ধাদের সাথে আপস-আলোচনায় তখনও নিয়োজিত ছিল। এই মিশনের অন্তিম সময়সীমা দেওয়া ছিল ২০১১

সালের জানুয়ারি মাস। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নির্বাচন পরবর্তী পর্বে মীমাংসা উদ্যোগ বজায় রাখার জন্য এর কার্যকাল আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হল। তদারকি সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মাওবাদী যোদ্ধাদের মূল স্রোতে ফেরানো ও পুনর্বাসনের জন্য একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হবে। শান্তিপ্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের মিশন-এর কার্যকাল বাড়ানো নিয়েও অবশ্য বিতর্ক ছিল। নাগরিক সমাজের একাংশের মত ছিল যে এই মিশন তুলে নিলে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অন্য অংশ মনে করেছিল, এই মিশন তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, আমেরিকার মতো আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি, যারা বিভিন্ন ভাবে শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তারা মূলধারার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মাওবাদীদের যোগদান নিয়ে কিছুটা সন্দিহান ছিল।

নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী খানাল ২০১১ সালের আগস্ট মাসে পদত্যাগ করলেন। সংবিধান পরিষদের সময়সীমা নভেম্বর মাস পর্যন্ত আবার বাড়িয়ে দেওয়া হল। বরিষ্ঠ মাওবাদী তাত্ত্বিক বাবুরাম ভট্টরাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন। মাওবাদীরা মাধেসি ও দেশীয় জনজাতি গোষ্ঠীগুলির একাংশের সমর্থন নিয়ে নতুন সরকার গঠন করল। নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে) বিরোধী ভূমিকা পালনে সম্মত হল। ক্ষমতায় এসে বাবুরাম ভট্টরাই সমস্ত দল ও নাগরিক সমাজকে শান্তি স্থাপনে আর একটি শেষ চেষ্টা করার আহ্বান জানালেন। মাওবাদী বাহিনীকে সরকারি সেনাবাহিনীর সাথে মিলিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটি চুক্তি করতে তিনি ৪৫ দিনের একটি সময়সীমা ঘোষণা করলেন। বিরোধিরাও একটি নির্দিষ্ট চুক্তির পক্ষে রাজী হলেন। সেই অনুসারে, শান্তি প্রক্রিয়ার প্রধান কাজ হিসাবে মাওবাদী বাহিনীকে অঙ্গীভূত করতে পয়লা নভেম্বর ২০১১ সালে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে অবশ্য মাওবাদীদের মধ্যেই বিভাজন দেখা দিয়েছিল। প্রচণ্ড এই চুক্তিকে সমর্থন করলেও কট্টরপন্থীরা একে মেনে নেন নি। তাঁরা এই চুক্তিকে 'আত্মসমর্পণ' বা 'বিশ্বাসভঙ্গ তা' হিসাবেই দেখেছিলেন। এই চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে সংবিধানের প্রথম খসড়া নভেম্বর-এর শেষ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। একই সাথে ঐ একই সময়ের মধ্যে মাওবাদীদের অন্তর্ভুক্তি ও অস্ত্র বিরতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারকে সত্য ও বিবাদ মেটানোর কমিটি (Truth and Reconciliation Committee) এবং অন্তর্ধান সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Disappearance) তৈরি করতে হবে। এই সময় মাওবাদীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সংবিধান প্রণীত হয়ে গেলে তাঁরা নেপালি কংগ্রেস-এর নেতা সুশীল কৈরালাকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেবেন। মাওবাদী বাহিনীর একীকরণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সরকার সম্পন্ন করতে পেরেছিল এবং নেপালে শান্তি ও স্থিতি স্থাপনে এটি ছিল একটি বিশাল পদক্ষেপ। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে সময়সীমা আবার বাড়ানো হল ২০১২ সালের ২৭ মে পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে এই সময়সীমা আর বাড়ানো যাবে না।

বাবুরাম ভট্টরাই-এর আমলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে পৌঁছায় ও সুস্থিত শান্তির পথে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়। তিনি ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন ও নেপালি সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সফল হন। কিন্তু তাঁর

দলের কট্টরপন্থীরা জাতিসত্তার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষেই প্রচার করতে থাকেন। তাঁরা সেনাবাহিনীতে মাওবাদী যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ানোর দাবী জানাতে থাকেন বা সেনাবাহিনীতে তাদের ভূমিকা কি হবে তাই নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের দলের মধ্যেও বিভাজন দেখা দিয়েছিল। প্রধান বিরোধী দলগুলিও মাওবাদীদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দাবী সমর্থন জানায়নি। এই সব দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে তাই প্রথম থেকেই মাওবাদীদের ও অন্যান্য দলগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সরকার সংবিধান প্রণয়নের সময়সীমা আরও তিন মাস বাড়ানোর প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। যদিও আলাপ আলোচনা চলছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধও ক্রমশ বাড়ছিল ও সহমত তৈরির আশা অধরাই থেকে যাচ্ছিল। মাওবাদী নেতৃত্ব এই পরিস্থিতিতে হুমকি দিতে থাকেন যে তাঁদের দাবী পূরণ করা না হলে তাঁরা আবার আন্দোলন শুরু করবেন। জনজাতি গোষ্ঠীগুলিও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাদের চাপ বাড়াতে থাকে ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই নিয়ে বিভাজন প্রকট হতে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গঠনে প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রীসভার ব্যর্থতার ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনগণের আস্থা ক্রমশ চলে যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নেপালে সংবিধান পরিষদ ২৭ মে ভেঙ্গে দেওয়া হয় ও গণতন্ত্রীকরণের পথে পুনরায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বাবুরাম ভট্টরাই তদারকি সরকারের প্রধান হিসাবে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে সংবিধান পরিষদের জন্য নতুন নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেন। নেপালের রাজনীতি সরকার গঠনে অচলাবস্থা ও নতুন সংবিধান তৈরিকে কেন্দ্র করে আবার গণ-আন্দোলন, ধর্মঘট ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থার কারণে নেপালে গণতান্ত্রিক বাতাবরণে যে সংকট দেখা দিল তাতে রাষ্ট্রসংঘও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নির্বাচন নিয়ে সহমত নির্মাণে ব্যর্থ হয়ে বাবুরাম ভট্টরাই পরের বছর মার্চ মাসে ইস্তফা দেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কে. রেগমি তদারকি সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেন। প্রধান চারটি দলের সমর্থন নিয়ে তিনি ১৯ নভেম্বর ২০১৩ নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করলেন। মাওবাদীদের একটি অংশ অবশ্য এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাঁর পদত্যাগ দাবী করতে থাকেন। তাঁরা এমনকি নির্বাচন বয়কটের ডাকও দেন। নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করতে সরকার সেনাবাহিনীকে কাজে লাগায়। রাজনৈতিক দলগুলিও উগ্র নির্বাচনী প্রচার চালাতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নেপালের সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নজরদারি করার জন্য নিয়োগ করেছিল।

নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়নি। নেপালি কংগ্রেস ১৯৬টি আসন নিয়ে প্রথম স্থান দখল করে। তার পরে ১৭৫টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি (উমালে)। মাওবাদী কমিউনিস্ট দল ৮০টি আসন নিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালি কংগ্রেসের নেতা সুশীল কৈরালা সংসদের সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হলেন।

২.৮ সারসংক্ষেপ

১৯৯০ সাল থেকে রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নেপালে ক্রমশ গতি পেতে থাকে। শাসনব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করতে নেপালকে দু'দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রথম পর্বে রাজতন্ত্রের সমর্থক ও রাজতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। ২০০৭ সালে এই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান ও একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে। উত্তরণের দ্বিতীয় পর্বে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সরকারের প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংহত করা নিয়ে টানাপড়েন দেখা গিয়েছিল। গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে বৈধতা দিতে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধায়ক ও রাজনৈতিক প্রশাসকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেপালের বহুদলীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সঠিকভাবে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। গণতন্ত্রীকরণের পথে একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ ছিল উগ্রবাদী শক্তিগুলিকে মূলস্রোতে ফেরানো। গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মাওবাদীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। নেপালে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের আন্দোলনে মাওবাদীদের কৌশলগত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রচণ্ড তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এইভাবে: "...সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী সাংবিধানিক কাঠামোয়, একমাত্র বহুদলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই...প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে প্রতিহত করা যায়।" [সূত্র: ভার্মা, ও এস এন্ড গৌতম নভলখা (২০০৭) "পিপলস্ ওয়ার ইন নেপাল: জেনেসিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট", *ইপিডব্লিউ*, মে ১৯, পৃ. ১৮৩৯-৪২] নেপালে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সাফল্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। নেপালের সাবেকি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি চড়া মূল্যবৃদ্ধি, দুর্বল বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতাদোষে দুষ্ট। এই কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার দরকার ছিল। দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নেপালে অর্থনৈতিক বিকাশ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শান্তিপ্রক্রিয়ায় নেপালের সেনাবাহিনীর ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজকীয় বাহিনী থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠা সেনাবাহিনীর কাছেও একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। রাজনৈতিক মধ্যস্থতার পর্বে বা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বজায় রাখতে আন্দোলনের উত্তাল সময়ে নেপালের সুপ্রিমকোর্টও একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। নেপালের গণতান্ত্রিক উত্তরণে বিবাদ মেটানোর পর্বগুলিতে আন্তর্জাতিক সমাজ, বিশেষতঃ রাষ্ট্রসংঘ ও ভারত, একটি বিশেষ দায়িত্বপালন করেছিল। নতুন সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে পারার অন্যতম দিক ছিল প্রতিবেশী ও পশ্চিমী দাতা রাষ্ট্রগুলির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা কারণ তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে। সবশেষে বলা যায়, বহুদলীয় গণতন্ত্রে নেপালের ভবিষ্যৎ এখনও একটি পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে আছে যা শান্তিপ্রক্রিয়াকে সংহত করা ও একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের কার্যকারিতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. ২০০৭ সালে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের পিছনে যুদ্ধ পরবর্তী যে ঘটনাবলি ভূমিকা পালন করেছিল তার বর্ণনা দিন।

২. ২০০৭ সাল থেকে নেপালে সাংবিধানিক সংস্কারের মূল পর্বগুলির বর্ণনা দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. ১৯৯০ সাল থেকে নেপালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উৎখাতে মাওবাদীদের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. ২০০৮ সালের সংবিধান পরিষদের নির্বাচন ও তার গুরুত্বের ওপর একটি ক্ষুদ্র টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. অন্তর্বর্তী সরকারে মাওবাদী ও সংসদীয় দলগুলির মধ্যে প্রধান বিতর্কের বিষয়গুলি কি ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Thapa, Ganga Bahadur (2007) "Is There a Transition to Democracy in Nepal?" *Indian Journal for Nepalies Studies,* Vol. 13, pp. 1-32

2. Thapa, Ganga Bahadur, Jan Sharma (2009) "From Insurgency to Democracy: The Challenges of Peace and Democracy-Building in Nepal". *International Political Science Review,* Vol. 30, No. 2, pp.205-219.

একক ৩ □ মিশরে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সমূহ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.৩.১ মুবারক জমানা

৩.৪ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বসমূহ

৩.৪.১ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা

৩.৪.২ নির্বাচিত সরকারের পথে যাত্রা

৩.৪.৩ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সংকট

৩.৫ গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- মিশরে কর্তৃত্ববাদের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- মিশরে কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণের পর্বসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সাহায্য করা।
- মিশরের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সংকটসমূহের বিষয়ে আলোকপাত করা।
- মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরক্রিয়ায় মিশরীয় বিপ্লবের ভূমিকার বিষয়ে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

৩.২ ভূমিকা

২০১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি মিশরের সেনাবাহিনী এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হোসনি মুবারকের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। মুবারককে ক্ষমতা থেকে সরানো ও মিশরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আঠারো দিন ব্যাপী এক গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনী এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। মিশরের সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেদনের ডাকে তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হয়ে হোসনি মুবারকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান দাবি করে। সেনাবাহিনীর পদক্ষেপে দশকব্যাপী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পতন ঘটে ও মিশরবাসী গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে এই জয়কে প্রবল উৎসাহে পালন করেন। এই আন্দোলন উত্তর আফ্রিকা ও আরব দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল যা আরব বসন্ত নামে (Arab Spring) জনপ্রিয় হয়েছে। মিশরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ধীর লয়ে আসেনি, বরং তা গণবিদ্রোহের সহিংস রূপে ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে এসেছে। আরব বসন্ত নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন চেহারা তৈরি করতে পেরেছিল। মিশরে রাজনৈতিক উত্তরণের পথে একটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। রাজনৈতিক বিদ্রোহকে উজ্জীবিত করতে বা গণ-আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সোশ্যাল মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মুবারক-উত্তর পর্বে রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মিশরবাসী একটি নতুন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে আস্থা প্রকাশ করেছিল। তাঁদের আশা ছিল এই শাসনব্যবস্থা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে ও মানবাধিকার এবং নাগরিক অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবে। মুবারকের বাধ্যতামূলক পদত্যাগের পর যদিও এই মতভেদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশেষতঃ নির্বাচন বা সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে তাই নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফলতঃ পরিবর্তন-পরবর্তি পর্বে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াটি মিশরে জোরদার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

৩.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৮৮২ সালে মিশর ব্রিটিশ শক্তির হাতে পরাধীন হয়েছিল। ১৯২২ সালে মিশরের রাজতন্ত্র গ্রেট ব্রিটেনের থেকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু মিশরে ব্রিটিশ প্রভাব ১৯৫৬ সালে সুয়েজ ক্যানাল-এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। ১৯৫২ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নাসের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান। নাসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির ও আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন (Arab Socialist Union) সরকার গঠন করে ও আরব-পন্থী দাবিদাওয়া শক্তিশালী করে নাসেরের অর্থনৈতিক নীতিগুলিই অনুসরণ করতে থাকে। আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন-এর নেতা আনোয়ার সাদাত গণতান্ত্রিক সংস্কারের কথা ঘোষণা

করেন এবং মিশরে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি প্রচার করেন। ১৯৭১ সালে মিশরে একটি সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতিকে মনোনীত করবে গণপরিষদ (People's Assembly) ও তিনি একটি জাতীয় গণভোটের মাধ্যমে ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ১৯৭৫ সালের পর আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন (এএসইউ) তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ হয়ে যায় ও ১৯৭৭ সালে দলটি ভেঙ্গে যায়। সেই বছর এএসইউ-র দক্ষিণপন্থী অংশটি লিব্যারাল সোশ্যালিস্ট দল (Liberal Socialist Party) তৈরি করে। এই দলটি বেসরকারি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি নেয় ও একটি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ায়। এএসইউ-র মধ্যপন্থী অংশটি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক দল (National Democratic Party) গঠন করে। এই দল ১৯৮১ সালে ইসলামি উগ্রপন্থীদের হাতে আনোয়ার সাদাতের হত্যার পর হোসনি মুবারকের নেতৃত্বে সরকারের ক্ষমতা দখল করে। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক দল (এনডিপি)ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দল প্রতাপশালী রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এনডিপি-র সমর্থনের মূল ভিত্তি ছিল মিশরের ব্যবসায়ী ও পেশাদারী শ্রেণী। এ এস ইউ-র বামপন্থী অংশটি শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, পুরনো কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতাদের নিয়ে ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ ইউনিয়ানিস্ট দল (National Progressive Unionist Party) তৈরি করেন। এই দল জাতীয়করণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। ১৯৭৭ সালে তৈরি হওয়া আর একটি দল হল সোশ্যালিস্ট লেবার দল (Socialist Labour Party) যারা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সাথে শক্তিশালী জনকল্যাণকর অর্থনৈতিক উন্নয়ণের নীতি প্রচার করেছিল। ১৯৮৭ সালের পর এই দলটি মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সাথে হাত মেলায় এবং মুবারকের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র প্রধানতম প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিল ও সাদাত বা মুবারকের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের উদ্দেশ্যে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল। সাদাত-এর আমলে অবশ্য ইসলামপন্থী দলগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। তারা মূলত মিশরে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের, শরিয়া আইন প্রণয়নের ও ইসলামি নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিল। ইসলামি বিরোধী দলগুলির মধ্যে শক্তিশালী ছিল হাসান আল-বান্না প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড ও ইসলামিক জিহাদ। এই সংগঠনগুলির অনেকেই উগ্রবাদী পন্থা অবলম্বন করেছিল ও মুবারক সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়ই নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে সঙঘর্ষের পথ নিয়েছিল। কট্টরপন্থী ইসলামি গোষ্ঠীগুলি মুবারকের বিদেশনীতির সমালোচক ছিল, বিশেষত তাঁর সরকারের সাথে আমেরিকা বা ইজরায়েল সরকারের সম্পর্কের প্রশ্নে।

৩.৩.১ মুবারক জমানা

হোসনি মুবারক আনোয়ার সাদাতের সরকারে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে সাদাতের হত্যার পর তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন। ২৯ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ চালান ও মিশরে প্রায় একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বিরোধীরা

তাঁর জমানায় তাঁদের সমর্থকদের নিপীড়নের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বা সংসদীয় নির্বাচনে এনডিএ-র সাফল্য নিশ্চিত করতে নির্বাচনী জালিয়াতির বিরোধিতা করেছে। রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পারেনি এবং এনডিএ প্রতিবার সংসদে বিপুলভাবে জিতে গেছে। মুসলিম ব্রাদারহুড যেহেতু আইনি পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি, তাই তারা নিউ ওয়াফদ দল বা লিব্যারাল সোশ্যালিস্ট দলকে সমর্থন করেছে। যদিও বিরোধীরা কোনও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ২০০৫ সালে মিশরবাসী ও আন্তর্জাতিক সমাজের চাপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু, বিরোধী প্রার্থী নির্বাচনে পরাস্ত হন ও নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মুবারক জরুরী অবস্থা আইনও বজায় রেখে দিয়েছিলেন যার বলে সরকার যথেচ্ছ গ্রেপ্তার, অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক, সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ বা সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করতে পারতো। নিজের দলের মধ্যে বা সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো বিরোধী স্বর মুবারক দমন করতেন ও এই সব দমনমূলক আইনের সাহায্যে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। ইসলামি উগ্রপন্থিদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিলেন। তাঁর আমলে ঊর্ধ্বগামী ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য বা তেলের নিম্নগামী মূল্যের কারণে মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব সুস্থিত ছিল না। ১৯৯১ সালে মিশর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক পরিচালিত কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচীর অধীনে আসে ও তার সূত্র ধরে অর্থনীতির উদারিকরণ করে। পতনশীল অর্থনৈতিক অবস্থা দেশে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল যা ইসলামি উগ্রবাদিরা মুবারক সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে ব্যবহার করেছিল। তারা রাজনৈতিক নেতাদের, এমনকি কখনও কখনও সাধারণ নাগরিকদের ওপরও হামলা করতে শুরু করে। মুবারক রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণের প্রশ্নে ইসলামি দলগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখে দেন। নাসেরের আমলে তৈরি হওয়া 'রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইন' ধর্মীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের আইনী বৈধতার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছিল। এই আইন ইসলামি গোষ্ঠীগুলিকে, বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুডকে মিশরে বৈধ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে দেয়নি।

প্রথম থেকেই মুবারক মধ্যপন্থী বিদেশ নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিশরের সাথে পশ্চিমী দেশগুলির, বিশেষত আমেরিকার সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মিশরের সাথে আমেরিকার নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ইসলামি গোষ্ঠীগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মিশরের সাথে ইজরায়েলের সম্পর্ক নির্ধারণে ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ঐ চুক্তির কারণে মিশর ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আরব লীগে যোগদান করতে পারেনি। ১৯৮০ সাল থেকে মুবারক দেশে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং সিনাই উপদ্বীপকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘর্ষের মধ্যেও ইজরায়েলের সাথে সম্পর্ক সহজ করার চেষ্টা করে গেছেন। অবশ্য আরব দেশগুলির সাথে মিশরের সম্পর্ক তাঁর আমলে উন্নত হয় এবং ১৯৮৯ সালে মিশর আরব লীগে তার সদস্যপদ ফিরে পায়।

৩.৪ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বসমূহ

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মিশরে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। মুবারক জমানার দুর্নীতি, দমনমূলক ব্যবস্থা, চরম দারিদ্র্য, বেকারি বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক কমিশনের প্রাক্তন মহানির্দেশক, মহম্মদ এল বরাদেই মিশরে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে একটি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার কর্মীদের নিয়ে ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জ (*National Association for Change*) প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১০ সালের নির্বাচনে মুবারক ও তাঁর দল এনডিপি ৮৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জেতে। কিন্তু নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে মিশরে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক সমাজেও উদ্বেগ দেখা যায়।

এই পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিবেশী দেশ তিউনিসিয়ায় রাষ্ট্রপতি বেন আলিকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়নের দাবিতে জেসমিন বিপ্লব শুরু হল। গণবিদ্রোহের প্রবল চাপে তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এই ঘটনা মিশর ও তার প্রতিবেশী দেশগুলিতেও গণতন্ত্রের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলে। ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মিশরীয় নাগরিক রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে ও অন্যান্য শহরে সরকারবিরোধী বিদ্রোহে জমায়েত হন এবং পুলিশের সাথে অভূতপূর্ব সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মুবারক-পন্থী সমর্থকদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের বিক্ষোভে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও যোগদান করে ও মুবারকের পদত্যাগ দাবি করতে থাকে। এই গণ-আন্দোলনে মুসলিম ব্রাদারহুড তার অত্যন্ত শক্তিশালী সমর্থনের ভিত্তিকে ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রবল বিক্ষোভ সত্ত্বেও মুবারক পদত্যাগ করতে রাজী হলেন না, বরং কয়েকটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়নি। সমগ্র সেনাবাহিনী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশরীয়দের এই গণবিক্ষোভকে 'যুক্তিসংগত দাবি' হিসাবে মেনে নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। বিক্ষোভ চলাকালীন ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কাউন্সিল [Supreme Council of the Armed Forces (SCAF)] এক অতর্কিত পদক্ষেপে ক্ষমতা দখল করে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মুবারকের পদত্যাগ ঘোষণা করে দেয়। ১৩ তারিখ কাউন্সিল সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সংবিধান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উত্তরণ প্রক্রিয়ার শেষে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কাউন্সিল। তারা জরুরী অবস্থা আইন প্রত্যাহারের কথাও বলেছিল। কাউন্সিল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত তদারকি কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবে ঠিক হয়। ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। মুবারকের মন্ত্রিসভাকে পরিবর্তনের এই পর্বে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

৩.৪.১ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা

সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া ও মুবারকের বাধ্যতামূলক পদত্যাগের পরও মিশরের বিভিন্ন অংশে হিংসাত্মক বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং মুবারক-পন্থী ও মুবারক বিরোধী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতা দখলের পর সেনা তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভরত বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। একই সাথে একটি প্রশাসনিক কাউন্সিল ও সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করতে তারা সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েছিল। এই সংবিধান সংশোধন কমিটিতে অবশ্য কোনও অসামরিক বা নির্বাচিত প্রতিনিধি রাখা হয়নি। ২০১১ সালের পর নীতি নির্ধারণ করতে বা রাজনৈতিক উত্তরণ প্রক্রিয়াকে একটা নির্দিষ্ট চেহারা দিতে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কাউন্সিল ১৫০টির ওপর সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। মার্চ মাসের তিন তারিখ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন এবং বিরোধী নেতাদের সুপারিশ অনুসারে কাউন্সিল নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ত্বরান্বিত করতে কাউন্সিল সংবিধান সংশোধনের জন্য কমিটিকে দশ দিনের সময়সীমা দিয়েছিল। সংবিধান সংশোধনে তৈরি কমিটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান প্রস্তাবগুলি হল— রাষ্ট্রপতি পদের সময়সীমা চার বছর করে সর্বোচ্চ দুইবার নির্দিষ্ট করা বা সংসদীয় নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্নে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের ক্ষমতা আরও বাড়ানো। কমিটি পূর্বতন সংবিধানের ৫নং ধারা অর্থাৎ ধর্মীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা অথবা রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে শরিয়া আইনকে মূল ভিত্তি হিসাবে ধরা বহাল রেখেছিল। একটি নতুন সংবিধান তৈরি করতে নির্বাচন করার জন্য নির্ঘণ্ট স্থির করার কথাও সংশোধনীতে রাখা হয়েছিল। মার্চ মাসের ২০ তারিখে একটি গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনীগুলি অনুমোদন করানো হল।

কিন্তু, মার্চের ৩০ তারিখ সর্বোচ্চ কাউন্সিল একটি সাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল যেখানে ১৯৭১ সালের সংবিধানটিকে সরিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সংবিধান চালু করার কথা বলা হল। এই প্রস্তাবিত সংবিধানের ৬৬টি বিধান ছিল যার অনেকগুলিই গণভোটের তালিকায় ছিল না এবং সেনাবাহিনী তার নিজের মতো করে সেগুলি তৈরি করেছিল। সাংবিধানিক ঘোষণার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কাউন্সিলকে একটি সাংবিধানিক শক্তি হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হল এবং নতুন সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আইন প্রণয়নে, রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে, মন্ত্রীদের নির্বাচন বা পদচ্যুতি করাতে কাউন্সিলের কর্তৃত্ব স্বীকার হল। গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও সেনা-নির্দেশিত অন্তর্বর্তী সরকারের এই একতরফা ভূমিকা এবং বিদ্রোহ দমনে পুলিশের অত্যাচারের ফলে মিশরে হিংসাত্মক প্রতিবাদ আন্দোলন চলতেই থাকল। সামরিক কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত সরকারে অসামরিক প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। সারা এপ্রিল ও মে মাস জুড়ে সেনা মিশরের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ দমনে বলপ্রয়োগ নামিয়ে আনে; যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ও আটক করে গণবিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকে। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা মার্চ মাসের শেষের দিকে এমনকি বনধ্

বা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ১৬ই এপ্রিল আদালতের একটি রায়ের বলে পূর্বতন শাসক দল, মুবারকের ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার কর্মীরা অভিযোগ করতে থাকেন যে সেনাবাহিনী মুবারক জমানার সেই একই দমনমূলক কৌশল নিচ্ছে এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিদ্রোহীরা মুবারক ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার এবং তাঁর জমানায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্ত করার দাবি জানিয়েছিল। ক্রমাগত বেড়ে চলা জনবিক্ষোভের চাপে শেষ পর্যন্ত মে মাসে মুবারক ও তাঁর পুত্রদের গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁদের বিচার শুরু হয়।

সংশোধিত নতুন সংবিধানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচলিত মানদণ্ডটি শিথিল করার সিদ্ধান্ত। এই লক্ষ্যে নতুন সাংবিধানিক ঘোষণাতে আগের সংবিধানের ৫নং ধারাটি, যা এই প্রশ্নে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল তাকে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর ফলশ্রুতিতে মুসলিম ব্রাদারহুড জুন মাসে তাদের নিজস্ব জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করতে সমর্থ হল। এই নতুন দলটি ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি (The FJP) নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী মাসগুলিতে ইসলামি গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বে তাহরির স্কোয়ারে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ও মিশরে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই গণবিক্ষোভে ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং ইসলামি গোষ্ঠীগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সংশোধিত সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে গণপরিষদের (সংসদের নিম্ন কক্ষ) ও শুরা কাউন্সিলের (সংসদের উচ্চকক্ষ) অর্ধেক সদস্য 'শ্রমিক ও কৃষক'দের নিয়ে গঠিত হবে। এই বিধানটি ১৯৭১ সালের সংবিধানের অংশ ছিল এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক নীতির কিছু প্রতিফলন ঘটেছিল।

৩.৪.২ নির্বাচিত সরকারের পথে যাত্রা

মুবারক-পরবর্তী সময়ে গণপরিষদের প্রথম সংসদীয় নির্বাচন শুরু হল নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে এবং তা ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল। সামরিক কাউন্সিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নজরদারি করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক বা নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলির নিয়োগকে স্বাগত জানালো। নির্বাচনে গড়ে ৫৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। মিশরের ইতিহাসে প্রথম বার প্রায় ৪০টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই দলগুলির অনেকেই আবার মুবারকের পতনের পর তৈরি হয়েছিল। ইসলামপন্থী দলগুলি এই নির্বাচনে খুব ভাল ফল করেছিল। পরিষদে মুসলিম ব্রাদারহুড পরিচালিত ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল ও কট্টরপন্থী ইস্লামি আল-নুর দল প্রায় ২৫ শতাংশ ভোট পায়। এই দুই দল মিলে নিম্ন কক্ষের ৪৯৮টি আসন দখল করতে পেরেছিল। উদারবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ যে দলগুলি মিশরের বিপ্লবে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, তারা আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হয়। নতুন তৈরি হওয়া দলগুলিও রাজনৈতিক প্রচারে তেমনভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পারেনি। শুরা কাউন্সিল নির্বাচন ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল। মোট ১৮০টি

আসনের মধ্যে ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি ১০৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ইসলামি জোট ৪৫টি আসনে জয় লাভ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সংসদের দুটি কক্ষের জন্যই সামরিক কাউন্সিল কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করার ক্ষমতা রেখে দিয়েছিল। জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে মিশরে প্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টির নেতা সাদ আল-কাতানি পরিষদের নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিল নির্বাচিত গণপরিষদের হাতে আইনসভার দায়িত্ব অর্পণ করল, আর নিজের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা রেখে দিল। নতুন সংবিধান তৈরি করতে সংসদ ১০০ সদস্যের একটি সংবিধান পরিষদ গঠন করবে স্থির হল। যেহেতু সংসদের দুটি কক্ষেই ইসলামি শক্তিগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তাই এটাই স্বাভাবিক ছিল যে তারাই সংবিধান পরিষদের গঠন কি হবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটাও স্থির হয় যে, একটি নির্বাচিত সরকার তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ২০১২ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্রিম কাউন্সিল ও মুসলিম ব্রাদারহুড উভয়েই রাষ্ট্রপতির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে ছিল। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন হাজার হাজার মিশরীয় জনতা রাস্তায় নেমে নির্বাচিত সরকারের সাফল্য উদ্‌যাপন করতে লাগল। যদিও অচিরেই সংবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের প্রশ্নে সংসদের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে বিভাজন বাড়তে থাকল।

২০১২ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোট অনুষ্ঠিত হল। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রার্থী ও ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টির নেতা মহম্মদ মোরসি ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করলেন। মুবারক সরকারের শেষ প্রধানমন্ত্রী ও নির্দল প্রার্থী আহমেদ শফিক নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। সংবিধান প্রণয়নে ইসলামি শক্তির প্রাধান্য সীমিত করতে সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে জুন মাসে মিশরীয় রাজনীতি আবার উত্তাল ও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠল। জুন মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে সুপ্রিম কাউন্সিলের এক অতর্কিত সিদ্ধান্তে আইনসভার নির্বাচনের ফলাফলকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল। কারণ দেখানো হল যে, সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অসাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরিষদ আচমকা বাতিল হয়ে গেল ও তার ফলে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক আগে ১৭ই জুন সুপ্রিম কাউন্সিল একটি অন্তর্বর্তী সাংবিধানিক ডিক্রি জারি করছিল যার বলে তারা নিজেদের হাতে নতুন সরকারের আইনপ্রণয়ন, আর্থিক ও সামরিক বিষয়ের ক্ষমতা তুলে নিল। রাজনৈতিক দল ও পর্যবেক্ষকরা এই ঘোষণাকে রাজনৈতিক উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর আধিপত্য বজায় রাখতে এক 'নমনীয় অভ্যুত্থান' বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে জয়লাভের পর ২৪ জুন মহম্মদ মোরসি মিসরের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সরকারে আসীন হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর এই সাংবিধানিক ডিক্রি প্রত্যাহার করে নিলেন। মোরসি মিশরে ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন।

৩.৪.৩ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সংকট

সংবিধান প্রণয়নকে কেন্দ্র করে ইসলামি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে সংসদে বিভাজন প্রকট হতে থাকল। ইসলামি সদস্যরা সংবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে অর্ধেক সদস্য ও বাকিদের সামাজিক গোষ্ঠী ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে তাঁরা মনোনয়ন করেছিলেন। বিরোধীরা একটি অসঙঘবদ্ধ জোট তৈরি করে প্রায়ই ১০০ সদস্যের সংবিধান পরিষদের অধিবেশন বয়কটের মধ্যে দিয়ে ইসলামিদের একাধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। তাঁরা এমনকি সংবিধান পরিষদের আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই বছর নভেম্বরের ২২ তারিখ রাষ্ট্রপতি মোরসি একটি ফরমান জারী করলেন যাতে পরিষদের বৈধতাকে কোনোরকম আইনি চ্যালেঞ্জ করা সীমিত করা যায়। তিনি নিজেকে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির পদকে বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের আওতার বাইরে রাখলেন ও সংবিধান পরিষদ বাতিল করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিলেন। নাগরিক অধিকার কর্মীরা এই ফরমানকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ওপর রাষ্ট্রপতির স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হিসাবে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির বয়কট সত্ত্বেও সংবিধান পরিষদ ৩০ নভেম্বর একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেছিল। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে মোরসি খসড়া সংবিধানটি নিয়ে গণভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির ডিক্রির বিরুদ্ধে মিশরে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হল এবং মোরসিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে আবার সহিংস আন্দোলন গড়ে উঠল। মুবারক-পরবর্তী জমানাতে গণতান্ত্রিক উত্তরণ সফল করে তুলতে শান্তি ও স্থিতি স্থাপনে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা সংবিধান তৈরিকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক সংকটের ফলে প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল। ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের কারণে মোরসি তাঁর ডিক্রি কিছুটা পরিবর্তন করলেন কিন্তু যে ধারার বলে সংবিধান পরিষদ বাতিলে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা রেখে দেওয়া হল। তাড়াহুড়ো করে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে খসড়া সংবিধান পাশ করানো হল। এই নির্বাচনে কেবলমাত্র ৩৩ শতাংশ মিশরীয় ভোটদান করেছিলেন। বেশিরভাগ বিরোধীরা এই নির্বাচন বয়কট করেছিল। ডিসেম্বর মাসে খসড়া সংবিধান প্রণীত হল। কিন্তু, ডিসেম্বরের নয় তারিখে রাষ্ট্রপতি সামরিক আইন জারী করলেন এবং সেনাকে গণবিক্ষোভ দমনে ক্ষমতা অর্পণ করলেন। গণবিদ্রোহ সত্ত্বেও মোরসি অবশ্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে ২০১৩ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে গেলেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থা মিশরে মোরসির বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহকে প্রবল করে তুলেছিল। উদারবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি মোরসি জমানার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে ইসলামি শক্তি ও মোরসি-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মিশরের রাজনীতি বিদ্রোহীদের ওপর পুলিশী অভিযান, গ্রেপ্তার, আটক এমনকি মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতির স্বৈরতান্ত্রিক

পদক্ষেপ ও শাসনব্যবস্থায় ইসলামি প্রভাব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৩০ জুন সরকার-বিরোধী বিদ্রোহ চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায়। সামরিক বাহিনী আবারও বিক্ষোভকারীদের দাবি সমর্থন করে তার বিপ্লব-পরবর্তী বিশেষ ক্ষমতা পুনর্ব্যবহার করে। কাউন্সিল রাষ্ট্রপতিকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় যে মিশরের গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য একটি পথনির্দেশিকা তৈরি করতে জনগণের দাবিদাওয়াকে গুরুত্ব দিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিরোধীদের সাথে মতপার্থক্য দূর করতেও সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দৃশ্যত অনমনীয় রাষ্ট্রপতি ২রা জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ও তাঁর পদে থেকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। এই সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক অসন্তোষ তীব্র আকার নিলো ও পরের দিনই মিশর আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়ে রইল। ৩রা জুলাই মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান আব্দেল ফতাহ এল-সিসি মোরসিকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান মুলতুবি রাখা হল। সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতকে একটি নতুন সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচনী আইন খতিয়ে দেখতে বলা হল। সিসি-র নেতৃত্বাধীন জোট সর্ব্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের প্রধান বিচারপতি আদলি মনসুরকে মিশরের অন্তর্বর্তি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিযুক্ত করল। অন্তর্বর্তী সরকার ৯ই জুলাই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে হাজেম আল বেবলাউয়িকে নিয়োগ করেছিল। অন্তর্বর্তী সরকার উত্তরণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১২ সালের মুলতুবি থাকা সংবিধানে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হল।

এই অভ্যুত্থানের পর সেনাবাহিনী মোরসিকে আটক করে রেখেছিল ও মুসলিম ব্রাদারহুড নেতাদের অনেককেও গৃহবন্দী করে রাখে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থকরা সারা মিশরে সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং পুলিশ ও মোরসি-বিরোধী সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তারা তাদের আন্দোলনকে 'বাতিল শুক্রবার' (Friday of Rejection) বলে ঘোষণা করেছিল এবং মোরসিকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছিল। অভ্যুত্থান-বিরোধী আন্দোলন সিনাই উপদ্বীপ এলাকায় চরমে ওঠে যেখানে ব্রাদারহুড কর্মীরা পুলিশ ও সেনার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি আন্তর্জাতিক সমাজকে এই রাজনৈতিক সংকটে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানায়। অন্তর্বর্তী সরকার মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত প্রাদেশিক প্রশাসকদের বহিষ্কার করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। ক্রমাগত বেড়ে চলা হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রপতি আদলি মনসুর মিশরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবিধানিক সুরক্ষাগুলি সাময়িকভাবে মুলতুবি হয়ে গেল এবং মিশরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও অস্থিরতার দিকে চলে গেল।

অন্তর্বর্তী সরকার একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করেছিল ও সেই নতুন সংবিধান অনুমোদনের জন্য ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সাংবিধানিক গণভোট নেওয়া হল। সংশোধিত সংবিধান ৯৮ শতাংশ

ভোট পেয়ে অনুমোদিত হল। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান-বিরোধী জোট এই গণভোট বয়কট করেছিল। ২০১৪ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ও আব্দেল ফতাহ্ এল-সিসি, নির্দল প্রার্থী হিসাবে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি এই নির্বাচনে নজরদারি করেছিল।

৩.৫ গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

মহম্মদ মোরসির নির্বাচিত সরকারকে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনা মিশরে ২০১১ সালের বিপ্লবের পরের পর্বে গণতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যর্থতা হিসাবে দেখা যেতে পারে। মিশরীয় জনগণ শ্রেণী, ধর্ম বা জাতিগত সত্তা নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হোসনি মুবারকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের জন্য গণআন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। মিশরের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসক দল এনডিএ-র নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন গণ-অসন্তোষ থেকে এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। মুবারকের পতন সাধারণ মানুষের মনে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, মুবারক-পরবর্তী জমানায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটিকে নানা কারণে সংগঠিত করা গেল না। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতে, আরব বসন্ত নীচের দিক থেকে উঠে আসা "প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক আন্দোলনের" ফসল ছিল [সূত্র: জায়মন্ড ল্যারি, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এন্ড আদারস (২০১৪), "রিকন্সিদারিং দ্য 'ট্র্যানজিসন প্যারাডাইম'", জার্নাল অফ ডেমোক্র্যাসি, ভলিউম ২৫ নং ১, জানুয়ারি, পৃ. ৯২], লাতিন আমেরিকা বা পূর্ব ইউরোপে ঘটা গণতন্ত্রীকরণের তৃতীয় প্রবাহের মতো 'অভিজাত-নিয়ন্ত্রিত' ছিল না। কিন্তু, গণ-অভ্যুত্থানের পর অচিরেই মিশরীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর মতো এলিট শক্তির হাতে চলে গেল ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়ায় প্রবল অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হল।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভাজন

রাজনৈতিক উত্তরণের পথে সংকটের পিছনে একটি জরুরী বিষয় ছিল বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ইসলামি ও ধর্মনিরপেক্ষ বা উদারবাদীদের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত বিভাজন। একটি বহুদলীয় নির্বাচনী গণতন্ত্রের পথে উত্তরণকে বৈধতা দিতে অন্তর্বর্তী সরকার যদিও বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনী প্রতিযোগীতাকে কেন্দ্র করেই মিশরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ইসলামি, ধর্মনিরপেক্ষ বা উদারবাদীরা সরকারের প্রকৃতি কি হবে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থীপদ নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলির বিভাজন ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে মিশরীয়দের ঐক্য বিনষ্ট করে দেয় এবং সরকার গঠনে বা সংবিধান প্রণয়নে সহমত তৈরিতে বাধার সৃষ্টি করে। ২০১১ সালের অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে প্রায় ৪০টি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, এই নতুন দলগুলির বেশিরভাগই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং মতাদর্শগত ও গণভিত্তির অভাবে ভুগছিল এবং এলিট শ্রেণীর স্বার্থই বেশি প্রতিফলিত করছিল। সংসদীয় নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো প্রতিষ্ঠিত

সংগঠনগুলির জয়লাভের পিছনে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল। মুসলিম ব্রাদারহুড দীর্ঘদিন ধরে মিশরের জনগণের মধ্যে একটি শক্তিশালী সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিল। মিশরের নতুন রাষ্ট্রপতি সিসি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না; কিন্তু, তিনি মিশরের রাজনৈতিক সমাজের ব্যাপক অংশের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনী আইন সংস্কার করতে জরুরী প্রশাসনিক ও আইনী ক্ষমতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা যায় যে, মিশরে একটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রয়োজন আছে, বিশেষত গণতান্ত্রিক শাসন সংহত করতে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সম্পর্ককে স্থিরীকৃত করা দরকার।

সেনার ভূমিকা

মিশরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেনা ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। মুবারককে ক্ষমতা থেকে সরানো সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিল জনগণের দাবি-দাওয়াগুলিকে 'যৌক্তিক' হিসাবে তুলে ধরে জনগণের পক্ষে দাঁড়ানো একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করেছিল। পণ্ডিতরা এই ক্ষমতার হস্তান্তরকে 'গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান' হিসাবে দেখেছেন। [সূত্র: ভেরল, ওজান ও (২০১২), 'দ্য ডেমোক্র্যাটিক ক্যুদেতা', হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নাল, ভলিউম ৫৩]।

সামরিক অভ্যুত্থানের সাবেকী চরিত্র এই হস্তান্তররে দেখা যায়নি। কিন্তু, অচিরেই সেনা অগণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ করে বিদ্রোহীদের প্রতি বা নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। এমনকি বিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বা সংস্কারের চরিত্র স্থির করতেও সেনাবানিহনী মূল ভূমিকা নিয়েছিল। ২০১২ সালের জুন মাসে সেনা মিশরের প্রথম অসামরিক রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মোরসিকে আর একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং শাসনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিয়েছিল। সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যরা দেশের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের ওপর নিজেদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল ও তার ফলে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ওপরেও তারা নিজেদের প্রভাব খাটাতে পেরেছিল।

নারী ও সংখ্যালঘুদের প্রান্তিকীকরণ

মিশরে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বরাবরই খুব সীমিত ছিল। ১৯৫৬ সালেই অবশ্য নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের অংশগ্রহণও খুব সীমিত ছিল। ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে তাদের ভূমিকা ক্রমশ প্রান্তিক হতে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনী আইন সংস্কারে মুবারক জমানায় তৈরি হওয়া সংসদীয় প্রতিনিধিত্বে মহিলা কোটার ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্কারের কারণে ২০১১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে পরিষদে কেবলমাত্র নয়জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংবিধান সংশোধনের জন্য তৈরি

কমিটিতে একজনও মহিলা ছিলেন না। তদারকি মন্ত্রীসভায় একজন মাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন। ২০১২ সালের সংবিধানের ১০ নং ধারায় 'মিশরীয় পরিবারের প্রকৃত চরিত্র' এবং তার 'নৈতিক মূল্যগুলিকে' রক্ষা করতে ও উর্দ্ধে তুলে ধরতে রাষ্ট্রের অভিপ্রায়টি বর্ণনা করা হয়েছিল। এই ধারাটিকে জনপরিসরে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত করার পথে একটি ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সরকারে অংশগ্রহণকারী ইসলামি শক্তিগুলি নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, বিবাহ ও পরিবার-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে তাদের রক্ষণশীল অবস্থান প্রচার করেছে। বিপ্লব-পরবর্তী দিনগুলিতে জাতি বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরাও বৈষম্য ও হিংসার মুখোমুখি হয়েছিল। কপটিক খ্রীস্টান, বাহাই গোষ্ঠী বা আহমেদীয় মুসলিমদের মতো সংখ্যালঘুরা নানাভাবে ইসলামি দলগুলির নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মুবারক-পরবর্তী সরকারগুলি সমাজে ইসলামি বা শরিয়া আইনকেই শক্তিশালী করেছিল যার কারণেও রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সংখ্যালঘু মানুষের ভূমিকা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল।

নাগরিক সমাজের ভূমিকা

মিশরে ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থান রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করেছিল। আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির চেহারা পাল্টে বা অংশগ্রহণের নতুন নতুন ধরনের মধ্যে দিয়ে এই নতুন সুযোগগুলির প্রকাশ ঘটেছিল। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আইনসভা বা রাজনৈতিক দলব্যবস্থার চরিত্র অনেক গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। নাগরিকদের বর্ধিত অংশগ্রহণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার কর্তৃত্ববাদী ও এলিট-কেন্দ্রিক চরিত্রে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। নতুন ধরনের রাজনৈতিক শক্তি, যেমন নাগরিক সমাজ বা শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হল রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি। কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ পরিচালনায় এই শক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এরকম একটি বিখ্যাত সংগঠন ছিল কেয়াফা আন্দোলন (Egyptian Movement for Change) যা ২০০৪ সালে শুরু হয়েছিল। এটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন ধরনের বিরোধী আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। অবশ্য, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে এরকম অনেক সংগঠনের ওপর রাষ্ট্রের নির্যাতন নেমে আসতে থাকে, বিশেষত তারা সেনাবাহিনী ও রক্ষণশীল ইসলামি শক্তিগুলির আক্রমণের সামনে পড়ে। এই সব সংগঠনগুলির কার্যকলাপের ওপর বলবৎ থাকা বিধিনিষেধগুলির সংস্কার করার প্রশ্নেও মুবারক-পরবর্তী সরকারগুলির রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখা যায়নি। সুতরাং, ১৯৬৭ সালে পাশ হওয়া জরুরী অবস্থা আইন, যার বলে নাগরিক সমাজ সংগঠন, মিডিয়া বা সাধারণ নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি চালাতে পারতো, তা ২০১২ সালে প্রণীত সংবিধানের আগে তুলে নেওয়া হয়নি। এই আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অসরকারি সংগঠনগুলির ওপর জারি থাকা নিয়ন্ত্রণমূলক আইন এই সময়ে তাদের কাজকর্ম বা আর্থিক উৎসের ওপর নজরদারি করতে ব্যবহার করা হয়েছে। মিশরে গণতন্ত্র নির্মাণে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের ধারাটিকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় পরিণত করা। যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতা ও তৃণমূলস্তরের গণতন্ত্রের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছিল, কিন্তু এই

অংশগ্রহণকে সংগঠিত রাজনৈতিক এ্যাজেন্ডা ও নেতৃত্বের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের চেহারা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শক্তিশালী করতে এই কাজ জরুরী ছিল।

ধর্মীয় রাজনীতির ভূমিকা

মিশরীয় বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল রাজনৈতিক ইসলাম-এর সংহতি দৃঢ় হওয়া। ২০১১ সালের মুবারক-বিরোধী অভ্যুত্থানে ও তার পরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে মুসলিম ব্রাদারহুড বা সালাফিস্ত দলগুলির মতো ইসলামি গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুবারকের পতনের পর সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সাথে সরকার ও গণতন্ত্রের প্রকৃতি কি হবে তাই নিয়ে মধ্যস্থতায় ব্রাদারহুড বড় ভূমিকা নিয়েছিল। প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে ইসলামি শক্তিগুলি রাজনৈতিক দল গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন আদায় করতে সফল হয়। যদিও প্রথমে তারা স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেছিল, কিন্তু অভ্যুত্থানের পরে ইসলামি রাষ্ট্র বা শরিয়া আইন, নারীদের ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভূমিকা অথবা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিশরের কি অবস্থান হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংঘাত বাড়তে থাকে। একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে রাজনৈতিক ইসলামের ধারণা অনেকসময়ই চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছিল। ইসলামি দল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মধ্যে বিভাজনও ক্রমশ বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রপতি সিসি-র সরকার যখন মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন ধর্মীয় রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত সংঘাতের দিকগুলি ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে দেখা দিতে থাকে।

মিডিয়ার ভূমিকা

আরব বসন্ত ওই অঞ্চলে একটি নতুন ধরনের জনপরিসরের জন্ম দিয়েছিল, যার অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল অভূতপূর্ব এক মিডিয়া সক্রিয়তা। ২০১০ সালের শেষের দিক থেকে রাজনীতির এক পরিবর্তিত চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে স্বৈরতন্ত্র-বিরেধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের নতুন নতুন ধরনের পন্থা থেকে। এই নতুন ধরণগুলি অনেকাংশেই এক নতুন মিডিয়া পরিবেশের প্রভাবে জন্ম নিয়েছিল। ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি তাহরির স্কোয়ারে মুবারক-বিরোধী হাজার হাজার মিশরীয়দের জমায়েত, বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ মূলত ফেসবুকে প্রচারিত একটি আহ্বানের ফলশ্রুতি ছিল। মিশরে জনগণের অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে ও তার প্রচারে বা অভ্যুত্থানের পরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলিকে প্রভাবিত করতে আল জাজিরা ও অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলি এবং নতুন ধরনের মিডিয়া যেমন, ফেসবুক, টুইটার, ইউ টিউব বা অজস্র ব্লগ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলী ভূমিকা পালন করেছিল। গণ-মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বিশেষত ইন্টারনেট-ভিত্তিক নতুন মিডিয়ার প্রভাবে যৌথ আন্দোলনের নতুন চেহারা দেখা গিয়েছিল। সাবেকি রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা থেকে এগুলির চরিত্র আলাদা ছিল। মিশরীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রচলিত উচ্চনীচ স্তরবিন্যস্ত কাঠামোটিকে ভেঙ্গে ফেলে ও স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার

এই বিন্যাস সমাজে আনুভূমিক যোগাযোগের জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য এটা বলা যায় যে যদিও গণমাধ্যম রাজনৈতিক এ্যাজেন্ডা তৈরিতে একটি বড় অবদান রাখতে পেরেছিল, কিন্তু মিশরের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সংস্কার আনতে তা সফল হয়নি। সরকার-বিরোধী প্রচার আটকাতে মিডিয়ার বিরুদ্ধে সেন্সারশিপ, নজরদারি বা নির্যাতন আরও সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হতে থাকে। তাছাড়া, বিপ্লব-পরবর্তী ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বেশি করে সংবাদপত্র, স্যাটেলাইট দূরদর্শন ও নতুন মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনমত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকে ও এই কাজের জন্য নিজেদের মিডিয়া সংগঠন তৈরি করে। তাছাড়া, মিডিয়া প্রযুক্তি মিশরীয় সমাজে ডিজিটাল ডিভাইড বা প্রযুক্তিগত বিভাজনের জায়গা সৃষ্টি করেছে যা স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রয়োজনীয় মিশরবাসীর ঐক্যে ফাটল ধরাতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

মুবারকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর মিশরে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্যায়টি রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটার বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দিয়ে গেছে। বলা যায় একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়া ও নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রায় তিন বছরের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর মিশরবাসীর মনে স্থায়িত্ব ও শান্তির আশা জাগিয়েছে। মুবারকের পতনের পর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়াটিতে সহমত ও একটি বৈধ সাংবিধানিক কাঠামোর অভাবে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। ২০১৪ সালের নতুন সংবিধানও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রসারের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সদিচ্ছা সম্পর্কে কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেনাবাহিনী ও বিচারবিভাগকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নাগরিকদের কাছে ততটা দায়বদ্ধ হিসাবে রাখা হয়নি। সংবিধানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেহারা নির্ধারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ও তার ফলে অতি-সাংবিধানিক ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে এদের উত্থানের পথও প্রশস্ত হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথে মিশরীয় সেনাবাহিনীর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে লড়াই একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক উত্তরণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বৈধ কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির ওপরও নির্ভর করে। পরিশেষে বলা যায় যে, মিশরীয় সমাজের স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির অবশিষ্ট অংশগুলি গণতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষার পথে এখনও বড় বাধার সৃষ্টি করে চলেছে।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে সংগঠিত গণবিদ্রোহের পিছনে রাজনৈতিক কারণগুলি বর্ণনা করুন।

২. মিশরে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে যে সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. বিপ্লব-পরবর্তী মিশরে প্রথম নির্বাচিত অসামরিক সরকার তৈরির পথে রাজনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির বর্ণনা দিন।

২. ২০১২ সাল থেকে মিশরে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াটি কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বিপ্লব-পরবর্তী মিশরে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. মিশরীয় বিপ্লবে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Martini, Jeff and Julie Taylor (2011) "Commanding Democracy in Egypt : The Military's Attempt to Manage the Future", *Foreign Affairs*, September-October.

2. Borown, Nathan J (2013) "Egypt's Failed Transition" *Journal of Democracy*, Vol.24, No.4, October.

3. Brown, Nathan (2014) "Grading Egypt's Roadmap Toward Democracy", Foreign Policy, May 5, Foreign policy.com/2014/Accessed : 20-11-2014.

একক ৪ □ লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক রূপান্তর

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট

৪.৪ স্বাধীনতার পর্ব

৪.৫ আধুনিক লাতিন আমেরিকার উত্থান

৪.৬ গণতন্ত্রীকরণের প্রবাহ

৪.৬.১ গণতন্ত্রীকরণের দ্বিতীয় প্রবাহ

৪.৬.২ গণতন্ত্রীকরণের তৃতীয় প্রবাহ

৪.৭ সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য

৪.৮ একবিংশ শতকে গণতন্ত্রীকরণের চ্যালেঞ্জগুলি

৪.৯ সারসংক্ষেপ

৪.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট ও স্বাধীনতার পর্ব সমূহের উপর ধারণা লাভে সাহায্য করা।
- আধুনিক লাতিন আমেরিকার উত্থান বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রীকরণের পথে চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে ধারণা গঠনে সহায়তা করা।
- লাতিন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

৪.২ ভূমিকা

লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের উত্তরণের বিকাশ পঞ্চদশ শতকে থেকে ঐ মহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস ও স্বাধীনতার আন্দোলনগুলির ঐতিহ্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে। লাতিন আমেরিকা বিভিন্ন জাতি, ভাষা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংমিশ্রণে তৈরি এক বহুবর্ণের সমাজ কাঠামোর উদাহরণ। ইউরোপীয় আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস জাত পশ্চিমি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে দেশীয় হিস্পানি সংস্কৃতির মেলবন্ধন এই সমাজের বিশেষত্ব। রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার চেহারাতেও এই বৈপরীত্য দেখা যায় সামরিক একনায়কতন্ত্র থেকে নির্বাচনী গণতন্ত্র বা বিভিন্ন ধরনের সমাজবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে লাতিন আমেরিকা স্বৈরতান্ত্রিক ও বহিঃশক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম দেখেছে বা বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে। সমগ্র মহাদেশের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অরাজকতা যুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় নানা বাধার সৃষ্টি করেছে। লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক উত্তরণের ইতিহাস সাধারণত ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

৪.৩ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক থেকে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা 'আবিষ্কারের' মধ্যে দিয়ে এই বিজয়ের শুরু হয়েছিল যা পরবর্তীকালে দক্ষিণ আমেরিকাতে ইউরোপীয় শক্তির ঔপনিবেশিক শাসনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে প্রাচীন আমেরিকার ইনকা বা অ্যাজটেক সভ্যতা স্পেনীয় ও পর্তুগীজ রাজশাসন বা ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশের অধীনস্থ শাসনে পর্যবসিত হয়। লাতিন আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় আধিপত্যের সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হল। এই মহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন দেশীয় জনসমাজের চূড়ান্ত শোষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল যার প্রত্যক্ষ ফল হল জনসংখ্যার ব্যাপক বিনাশ, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, সাবেকী সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস এবং দাসপ্রথার প্রবর্তন।

৪.৪ স্বাধীনতার পর্ব

উনবিংশ শতকের শুরু থেকে ধীরে ধীরে লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হতে থাকে। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ-আমেরিকার মানুষ স্বাধীনতার

আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সাইমন বলিভার, যিনি 'মুক্তিদাতা' (The Liberator) নামে জনপ্রিয় ছিলেন ও মিগুয়েল হিদালগো বা জোসে মারিয়া মোরেলেস-এর মতো নেতারা। বলিভার লাতিন আমেরিকার ঐক্যের ধারণা প্রচার করেছিলেন ও যেকোনো ধরনের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময় থেকেই লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করতে শুরু করে ও ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদের আদর্শ দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আধুনিক লাতিন আমেরিকার জাতিরাষ্ট্রগুলির জন্মের বীজ বপন হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে দক্ষিণ-আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা এই স্বাধীনতার আন্দোলনগুলির মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এই সময় রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কতগুলি অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল এবং লাতিন আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় এলিট শক্তির উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

স্পেনীয় আমেরিকায় উঠতি মেস্তিজো সম্প্রদায় (স্পেনীয় ও দেশীয় ইন্ডিয়ানদের সংকর বংশদ্ভুত জনগোষ্ঠী) ঔপনিবেশিক ভূস্বামী শ্রেণীগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক শক্তির সাহায্যে কেন্দ্রীভূত সরকার তৈরি করেছিল। সুতরাং, স্বাধীনতার প্রথম কয়েক দশকে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় ক্ষমতাশালী এলিট শাসকদের উত্থান দেখা গেল যাদের পিছনে সামরিক বা অসামরিক সরকারের সমর্থন ছিল ও তারা রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধির কথা ভেবেছিলেন। উপনিবেশ-উত্তর প্রজাতান্ত্রিক শাসনে দেশীয় ইন্ডিয়ান জনজাতিরা তাদের অধিকার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল ও তাদের স্বরও তাই রাজনৈতিক শাসনে প্রতিষ্ঠা পায়নি। নতুন গোষ্ঠীকেন্দ্রীক সরকারগুলি পশ্চিমী বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল ও তার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনিশ্চয়তার কারণে তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার পর্তুগীজ-অধীন অঞ্চলগুলি, যেমন ব্রাজিলে স্বাধীনতার পরে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সমাজে কেন্দ্রীকরণের শক্তিগুলি আরও সংহত হয়ে ওঠে। উপনিবেশ-উত্তর পর্বে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ আমেরিকার মূল অঞ্চলগুলিতে নতুন সরকারগুলির রাজনৈতিক ভৌগোলিক সংহতি বৃদ্ধি করতে গিয়ে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। নতুন জাতিগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি নিম্নগামী, কৃষি ও খনি ভিত্তিক রপ্তানিকেন্দ্রিক অর্থনীতি লাভ করেছিল।

আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, চিলি বা পেরুর মতো দেশগুলি তাদের অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভর করেছিল। স্বাধীনতার পরেও লাতিন আমেরিকার শাসকরা দাসব্যবস্থা-ভিত্তিক অর্থনীতিকে বাতিল করেনি। ব্রাজিল, কিউবার মতো দেশে যেখানে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বেশ বড় মাপের ছিল সেখানে দাস ব্যবসাও বহুল পরিমাণে চলতে থাকে। এই সময়ে পূর্বতন উপনিবেশ ও বহিঃবিশ্বের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কও বিপুল বিদেশী ঋণের কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছিল। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এই পরিস্থিতিতে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ বাড়াতে থাকে। স্বাধীনতার পরে লাতিন আমেরিকা মহাদেশ আস্তে আস্তে বিশ্ব অর্থনীতিতে একীভূত হতে থাকে কিন্তু তা আসলে একটি অধীনস্থ ও প্রান্তিক অবস্থান তৈরি করেছিল। সমাজের খণ্ডীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণের নির্ভরশীল প্রকৃতি ঊনবিংশ শতক থেকে লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

নির্ভরশীলতার তত্ত্বের প্রবক্তারা পরবর্তীকালে দেখিয়েছেন যে লাতিন আমেরিকার চিরন্তন অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ঐ মহাদেশে রাজনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিকতার ঝোঁক সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। দেশীয় জনজাতিরা দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার অভাবে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী (শ্বেতকায় ক্রিওল পরিবারবর্গ) সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল এবং শক্তিশালী একনায়কতন্ত্র বা সামরিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় রাজত্ব করা স্বৈরাচারী শাসন অচিরেই লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার আন্দোলনের নির্যাসটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সাইমন বলিভার, যিনি একজন মহৎ রাজনৈতিক দূরদর্শী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁর বিখ্যাত 'জামাইকার চিঠি' সংকলনে (১৮১৫) স্বাধীনতার পরে লাতিন আমেরিকার পরিবর্তনশীল সমাজে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আশঙ্কার কথা আগাম প্রকাশ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকগুলিতে লাতিন আমেরিকার প্রধান রাষ্ট্রগুলি একধরনের আমদানি-রপ্তানি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল যা শিল্পোন্নত দেশগুলিকে ঐসব দেশে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহ জুগিয়েছিল। বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রসার লাতিন আমেরিকার সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণী, যেমন পেশাভিত্তিক শ্রেণী বা উদ্যোগপতিদের বিকাশ যার অন্যতম উদাহরণ। মূলত শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অধিকার দাবি করতে থাকল এবং এর সূত্র ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এলিট নিয়ন্ত্রণের পথ আবার নতুন করে তৈরি হতে দেখা গেল। আমদানি-রপ্তানি ভিত্তিক অর্থনীতি ইউরোপ থেকে ব্যাপক সংখ্যায় অভিবাসনের পথ প্রশস্ত করেছিল ও তার ফলে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু এবং চিলির মতো দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনসমাজের প্রকৃতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিল। সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পেতে লাগল। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এলিটদের আধিপত্য লাতিন আমেরিকায় প্রধানত দু'ধরনের শাসনব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। একদিকে এই এলিট শ্রেণীগুলি 'গোষ্ঠীতান্ত্রিক গণতন্ত্র'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেমন আর্জেন্টিনা বা চিলিতে। অন্যদিকে, একনায়ক বা সামরিক শাসকরা ভূস্বামীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, যেমন পেরু, মেক্সিকো বা ভেনেজুয়েলাতে। উভয় ক্ষেত্রেই নতুন শাসকবর্গের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অব-উপনিবেশবাদের পর্বে লাতিন আমেরিকার অর্থনীতির আন্তর্জাতিকরণ ঘটেছিল ও এই মহাদেশ একটি বিভাজিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরাধিকার বহন করে পথ চলা শুরু করেছি।

৪.৫ আধুনিক লাতিন আমেরিকার উত্থান

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে লাতিন আমেরিকায় নির্ভরশীল অর্থনীতির সুপ্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধিত ভূমিকা দেখা গেল। কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের রপ্তানি-কেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের সাথে সংযোগের কারণে লাভবান হয়েছিল এবং তার ফলে ক্রমেই সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, চিলি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ধীরে ধীরে মাঝারি মানের

শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ব্যাপক অভিবাসন ও গ্রামাঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত পরিযায়ী শ্রমের হাত ধরে নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হল এবং এর ফলে এই সব দেশে গ্রাম-শহরের বিভাজনের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে আধুনিকীকরণের দ্রুতগতি এবং নতুন সামাজিক শ্রেণীর ও রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

নতুন গড়ে ওঠা অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী, পেশাদার গোষ্ঠী আর্জেন্টিনাতে র‍্যাডিকাল দলের প্রতিষ্ঠা করল। এই দল বিংশ শতকে আর্জেন্টিনার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নতুন পরিস্থিতিতে দেশে একাধিক শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হল। ১৯১২ সালে আর্জেন্টিনাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সংস্কার হয়েছিল। যার বলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করল। যদিও এই ভোটাধিকার কেবলমাত্র পুরুষ নাগরিকদের মধ্যে সীমিত ছিল এবং এর ফলে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে আরও প্রান্তিক হয়ে গেল। এই নির্বাচনী সংস্কার ব্যাপক অংশের অভিবাসী সম্প্রদায়কেও, যারা দেশের শ্রমজীবী জনসমাজের বৃহত্তম অংশ ছিল, তাদের ভোটাধিকার দেয়নি। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে চিলিতে একের পর এক গৃহযুদ্ধ, শ্রমিক শ্রেণীর উগ্র আন্দোলন বা সামরিক অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছিল। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে চিলির সাধারণ মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সংকটের সামনে পড়ে। ১৯৩৬ সালে চিলিতে র‍্যাডিকাল, ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিস্টদের মিলিত নেতৃত্বে একটি গণজোট তৈরি হয়েছিল। এই জোট নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। অবশ্য, দলগুলির মধ্যে তীব্র মতপার্থক্যের কারণে গণজোট চিলির রাজনীতিতে স্থায়িত্ব আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু চিলির রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জোট রাজনীতির সূত্র ধরে একটি প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। যেখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার ছিল বেশ উচ্চমাত্রায়। এই বিশেষত্ব আর্জেন্টিনার ক্ষেত্র দেখা যায়নি।

১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতান্ত্রিক সরকার দখলের পর ব্রাজিলকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হল ও রাজতন্ত্রকে সরিয়ে নির্বাচন-ভিত্তিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৯১ সালে ব্রাজিলে নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্ম দিল যেখানে কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক, শিক্ষিত পুরুষ নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হল। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে, ব্রাজিলের রাজনীতি রক্ষণশীল, জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী, উদারবাদী বা খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলির মধ্যে বিভাজিত ছিল। অর্থনৈতিক মন্দা-পরবর্তী পর্বে ব্রাজিলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে ও সমাজবাদী, কমিউনিস্ট ও র‍্যাডিকালরা মিলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গেত্যুলিও ভারগাস-এর শাসনের বিরুদ্ধে গণজোট তৈরি করে। ১৯৩৭ সালে আর একবার সামরিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা পুনর্দখল করে ও প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালে ব্রাজিলে একটি অবাধ নির্বাচন করা গিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে একটি নতুন সংবিধান রচনা করা হল ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নীতিগত স্বীকৃতি পেল।

স্বাধীনতা উত্তর-পূর্বে উদার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, মধ্য আমেরিকায় এলিট আধিপত্যের ওপর ভিত্তি করে

কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের উত্থান ঘটেছিল। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকে 'প্রজাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' বলে বর্ণনা করেছেন যেখানে ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিক অংশগুলির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার তৈরি হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভেনেজুয়েলা, কোস্তা রিকা ও গুয়াতেমালার সরকারগুলি কিছু জনকল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দা মধ্য আমেরিকায় ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল যার ফলে গণবিদ্রোহ, নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা, রক্ষণশীল শাসকদের অর্থনৈতিক নীতির বিরোধিতায় ঐ অঞ্চলের রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে লাতিন আমেরিকায় কড়িলিসমো (*caudillismo*) ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থাকে একটি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সরকারের ধরণ হিসাবে দেখা যায়। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে লাতিন আমেরিকার শাসকরা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষক বা শ্রমিকদের তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল। অনেক গবেষক এই নতুন ধরনের ব্যবস্থাকে 'সহযোজিত গণতন্ত্র' (co-optative democracy) বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ব্যবস্থায় জনসমাজের উচ্চ ও মধ্য অংশ নিম্নবর্গের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত করে নিজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রণ দখল করে। সুতরাং, এই দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা মূলত জনসমাজের একটি এলিট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল এবং নেতার ক্যারিসমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৩০-র অর্থনৈতিক মন্দা লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল কারণ অবনমনমুখী বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি-কেন্দ্রিক শিল্পায়ণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। আর্জেন্টিনা, কিউবা, চিলি, পেরু, গুয়াতেমালা আর হন্দুরাস-এর মতো দেশগুলিতে অতর্কিতভাবে সামরিক শক্তি ক্ষমতা দখল করে। মেক্সিকো এই সময় একটি সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। সমগ্র মহাদেশে অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে ১৯৩০-এর দশক থেকে শাসক এলিটদের সরিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান শক্তি হিসাবে সামরিক বাহিনীর উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

নতুন শাসকরা অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে একটি আমদানি-প্রতিস্থাপনকারী শিল্পায়ন কর্মসূচী (import substitution industrialization programme) গ্রহণ করে। এই নীতির ফলে জাতীয় শিল্পবিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পেল। আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো বা ব্রাজিলে এই কর্মসূচীর ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। শিল্পের প্রসারের ফলে লাতিন আমেরিকায় বুর্জোয়া শ্রেণীর ও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটলো। এই নতুন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি সাবেকী ভূস্বামী শ্রেণীর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করলো। নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলেরও জন্ম হল যারা নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করতে সুযোগ পেল। শিল্প-ভিত্তিক এলিট শ্রেণীর বিকাশ ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার লাতিন আমেরিকায় নানা ধরনের গণজোটের জন্ম দিয়েছিল যার বড় অংশই ছিল শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত জোট। চিলিতে নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বার্থ রক্ষায় নতুন নতুন দলের উদ্ভব হল। শ্রমিক-সমর্থক ও শিল্পপতি-পন্থী দলগুলি নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে

লাগল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪০-১৯৫০-এর দশকে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে গণতন্ত্রের এক প্রবাহ দেখা গেল। নতুন প্রতিষ্ঠিত জনস্বার্থ-কেন্দ্রিক (পপুলিস্ট) শাসনব্যবস্থাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যারিসমা-নির্ভর ব্যক্তি নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত ছিল, যেমন আর্জেন্টিনায় জুয়ান পেরন, মেক্সিকোয় লাজারো কারদেনাস বা ব্রাজিলে গেত্যুলিও ভারগাস।

৪.৬ গণতন্ত্রীকরণের প্রবাহ

স্যামুয়েল হান্টিংটন এক প্রবন্ধে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অগণতান্ত্রিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে একটি সামগ্রিক উত্তরণের পর্যায়কে 'গণতন্ত্রের একটি প্রবাহ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। (সূত্র: হান্টিংটন, এস. ২০০৯ "হাউ কান্ট্রিস ডেমোক্র্যাটাইস?" পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টার্লি, ভলিউম ১২৪, ইস্যু ১, স্প্রিং)। তিনি এই রকমের তিনটি বিশ্বজনীন প্রবাহের কথা বলেছেন—১৮২৮-১৯২৬, ১৯৪৩-৬২ ও ১৯৭৪-৯১। তাঁর মতে, বিংশ শতকের শেষ অর্ধের সব থেকে লক্ষ্যণীয় রাজনৈতিক ধারা ছিল ১৯৭৪-৯০ সালে ঘটা 'বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক বিপ্লব', যাকে তিনি 'গণতন্ত্রের তৃতীয় প্রবাহ' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

গণতন্ত্রের প্রথম প্রবাহে কয়েকটি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাক্ষী হয়েছিল। যেমন আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা বা কোস্টা রিকা। অবশ্য এই পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি খুবই দুর্বল প্রকৃতির ছিল। লাতিন আমেরিকায় দ্বিতীয় প্রবাহ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। এই পর্ব ১৯৬০ দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে মহাদেশের বিভিন্ন অংশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা আংশিকগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল গণতন্ত্রের তৃতীয় প্রবাহ যা মোটামুটিভাবে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত চলেছিল এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠা আরও নিশ্চিত হয়েছিল। এই পর্বে গণতন্ত্রীকরণের বিস্তার আরও ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

৪.৬.১ গণতন্ত্রীকরণের দ্বিতীয় প্রবাহ

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছিল কারণ আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্প বিকাশের মডেলে কিছু জন্মগত সমস্যা ছিল। তাছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্যের অসম শর্তগুলিও বাধা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্ব বাজারে লাতিন আমেরিকার অর্থনীতির দীর্ঘকালীন প্রান্তিক অবস্থান ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে নির্ভরশীলতার তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনুন্নয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা করেছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বেকারি ও দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান হার ঐ মহাদেশের বিভিন্ন অংশে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় গুরুতর বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, চিলিতে রক্ষণশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে ও তারা স্থায়ীত্বের লক্ষে কিছু কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়। এই সময় চিলিতে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে থেকে বামপন্থী দলগুলির বিকাশ ঘটতে থাকে। এঁরা পুঁজিবাদী উন্নয়ন এবং চিলির সরকারের ওপর আমেরিকার প্রভাবের প্রবল বিরোধিতা করতে থাকেন। বিভিন্ন দেশে স্বৈরতান্ত্রিক

সরকারগুলির এই সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থতা লাতিন আমেরিকায় গণ-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল এবং তার ফলে সরকার পরিবর্তনের প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের মধ্যে মহাদেশের ১২টি দেশ গণতান্ত্রিক সরকার লাভ করেছিল। ১৯৫৯ সালে কিউবার জনগণ ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বাতিস্তার একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শামিল হয়েছিল এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের চাপ, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন দমন করতে শাসকগোষ্ঠী নির্যাতনের পথ নিতে থাকে ও এর ফলে ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলিতে আবার নতুন করে সামরিক অভ্যুত্থানের পথ তৈরি হয়। সামাজিক অসাম্য, দারিদ্র্য, বর্ণগত বৈষম্যের কারণে গড়ে ওঠা জনরোষ ১৯৬২-পরবর্তী পর্বে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় যে নির্বাচিত অসামরিক সরকার কেবলমাত্র ভেনেজুয়েলা, কোস্টা রিকা বা কলম্বিয়ার মতো কিছু দেশে কাজ করছে। সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারগুলি সেনা বা আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বৃদ্ধি করে গোষ্ঠী-শাসনের ধারাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। তারা জনআন্দোলনকে বা যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বিরোধিতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। ফলে নির্বাচন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা শ্রমিক সংগঠনের কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হতে থাকে। বেশিরভাগ জমানাই শ্রমিক-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি চালু করেছিল। এইভাবে পূর্বতন প্রজাতান্ত্রিক সরকারগুলি আমলাতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে পর্যবসিত হল। এই শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর প্রান্তিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণ। এই সামরিক শাসনগুলি পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে, বিশেষত আমেরিকার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং এরা বাইরে থেকে ধার নেওয়ার ওপর প্রবলভাবে নির্ভর করতে থাকে। ১৯৮০-র দশকের মধ্যে লাতিন আমেরিকার বৈদেশিক ঋণ ২৩১ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায় এবং এর পরিণতিতে অর্থনৈতিক ঋণসংকট চরমে ওঠে। মহাদেশে নয়া-উদারবাদী সংস্কারের শুরু হল এই সময় থেকে। এই সংস্কারের মূল দুটি দিক ছিল—আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার প্রবর্তিত কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচী গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকা খাটো করে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির পথ প্রশস্থ করার নীতি। এই অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি লাতিন আমেরিকাতে ১৯৮০-র দশক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল এবং বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দিতে ভূমিকা নিয়েছিল।

৪.৬.২ গণতন্ত্রীকরণের তৃতীয় প্রবাহ

পুঁজির ব্যাপক আন্তর্জাতিকরণ ও লাতিন আমেরিকার ঋণ সংকটের নতুন পরিস্থিতিতে লাতিন আমেরিকা মহাদেশে রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টাতে থাকে কারণ সরকারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই গভীর বৈধতার সংকটের সামনে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগ থেকে একাধিক দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে অসামরিক সরকারের হাত ধরে গণতান্ত্রিক শাসনে উত্তরণ দেখা যেতে থাকে। আশির দশককে লাতিন আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা

যেতে পারে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল দায়বদ্ধ সরকার গঠন ও অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে গড়ে ওঠা নাগরিক অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। কর্তৃত্ববাদী শাসনের ভঙ্গুরতা তাদের নীতি ব্যর্থতায় প্রকট হতে থাকে আর সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে রাজনৈতিক অধিকার দাবী করতে থাকে। ১৯৭৮ সালের পর থেকে এই পর্বটিকে লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রের তৃতীয় প্রবাহ বলা যেতে পারে। ১৯৯২ সালের মধ্যে আঠারোটি দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যাটি ছিল কেবলমাত্র তিন। ঠান্ডা-যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও আশির দশকের শেষে সমাজতান্ত্রিক জোটের পতনও লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেছিল। স্যামুয়েল হান্টিংটন ও মিশেল এ. সেলিগসন, যাঁরা আধুনিকতাবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা অর্থনৈতিক বিকাশ ও গণতন্ত্রের মধ্যে ইতিবাচক পারম্পর্য দেখিয়েছেন এবং তাঁরা মূলত আশির দশকের ল্যাতিন আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। লাতিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্র তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উদারবাদী সংস্কার ও মুক্ত বাজার নীতির পক্ষে সওয়াল করতে থাকে ও এর ফলে রাজনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। ১৯৮০-র দশকে মহাদেশের বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে।

চিলি, আর্জেন্টিনা এবং মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয় ও তার ফলশ্রুতিতে নাগরিকদের ভূমিকা বাড়তে থাকে ও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসে। যদিও অনেক দেশেই সামরিক বাহিনী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করে চলেছিল। ১৯৯০-র দশক থেকে লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নানা ধরনের সরকার গঠিত হয়েছে—যেমন, নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র বা ভঙ্গুর গণতন্ত্র, সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এবং পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থা। স্কট মেইনওয়্যারিং ও আনিবেল পেরেজ লিনান এই শাসনব্যবস্থাগুলিকে চারটি সূচকের ভিত্তিতে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন—গণতন্ত্র, আধা-গণতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক [সূত্র: মেইনওয়্যারিং স্কট পি ও আনিবেল পেরেজ লিনান (২০০৫), "ল্যাটিন আমেরিকান ডেমোক্র্যাটাইজেসন সিন্স ১৯৭৮: ডমোক্র্যাটিক ট্র্যানজিসনস, ব্রেকডাউনস্ এন্ড ইরোসনস্" ইন হ্যাগোপিয়ান. এফ এন্ড স্কট পি মেইনওয়্যারিং (এডি.) দ্য থার্ড ওয়েভ অফ ডেমোক্র্যাটাইজেসন ইন ল্যাটিন আমেরিকা: এ্যাডভান্সেস এন্ড সেটব্যাকস্. কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, প. ১৫]। চারটি সূচক হল—অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন; নাগরিক অধিকার রক্ষা; প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, এবং নির্বাচিত ক্ষমতায় বেআইনি সামরিক হস্তক্ষেপ না থাকা। তাঁদের মতে, গণতন্ত্রে সবকটি সূচক উপস্থিত থাকে; একটি বা তার বেশি সূচক আধাগণতন্ত্রে অনুপস্থিত থাকে; স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও সূচকই উপস্থিত থাকে না। তাঁরা দেখিয়েছিলেন ১৯৭৮ পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণ তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ছিল কারণ আগের বছরগুলির তুলনায় সেই সময়ে নির্বাচিত অসামরিক সরকারগুলি বেশি স্থায়ী হয়েছিল। লাতিন আমেরিকার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইতিহাস দেখলে ১৯৮০-র দশক থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

আর্জেন্টিনা

১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতি পেরনের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ইসাবেল আর্জেন্টিনার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। তাঁর সরকার সেনাবাহিনী এবং নিষিদ্ধ গেরিলা সংগঠন, গণবিপ্লবী সেনা (ERP)-র প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। ১৯৭৬ সালে আর্জেন্টিনায় সেনাপ্রধান ভিদেলার নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। নতুন আমলাতান্ত্রিক-কর্তৃত্ববাদী সরকার দেশে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমপন্থী সামরিক সরকারগুলি ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের অধিকারকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও এই সুযোগে দেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। কিন্তু যুদ্ধ ও নয়া-উদারবাদী সংস্কারের ফলে দেশের অর্থনীতি অবনমন ঘটতে থাকলে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ১৯৮৩ সালে র‍্যাডিক্যাল দলের নেতৃত্বে অসামরিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন বিরোধী নেতা পেরন-পন্থী দলের কার্লোস মেনেস র‍্যাডিক্যাল দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেতেন। এই জয় আর্জেন্টিনার গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল কারণ সত্তর বছরে এই প্রথম কোন বিরোধী নেতা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। ক্ষমতায় এসে মেনেম উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কতগুলি কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং একটি আমেরিকা-পন্থী বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে ১৪০ বছরের পুরনো সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ছয় বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা হল এবং একবার মাত্র পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হল। একটি জরুরী ডিক্রি জারি করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা সীমিত করা হল। এই সংস্কারগুলি করা হয়েছিল সরকারের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর লক্ষ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সরকারের আমলে প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা হল। র‍্যাডিক্যালদের বা অন্য কোন গণজোটের প্রভাব তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং দেশে অর্থনৈতিক সংকটও তীব্র আকার নিল। ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকে আর্জেন্টিনায় পুঁজিবাদী, আমেরিকাপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিল এবং তার পরিণতিতে এক বছরে চারজন রাষ্ট্রপতিকে পদ খোয়াতে হয়েছিল। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসের গণবিদ্রোহ, কর্মহীন মানুষের পিক্যুতেরো আন্দোলন এবং গণআন্দোলনের জোয়ার শাসককে অবশেষে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে সফল হল এবং একই সাথে সংকটের সমাধানে বিচারবিভাগ বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতাকে সামনে এনে দিল। গণআন্দোলন নতুন নতুন সামাজিক জোটের জন্ম দিয়েছিল যা সাবেকী রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল এবং গণ-রাজনীতির শক্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। ২০০৭ সালে ক্রিস্টিনা কির্চনার আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন এবং তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় এলেন।

চিলি

বিংশ শতকের শুরু থেকেই চিলি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উচ্চহারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি

প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছিল। চিলির রাজনীতি মতাদর্শগতভাবে ভিন্নমেরুতে থাকা রাজনৈতিক দল ও সরকারের সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে একটি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত চিলির সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন রক্ষণশীল নেতা আলেসান্দ্রি, খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট নেতা ফ্রেই বা সমাজতন্ত্রী নেতা আলেন্দে। তাঁর তিন বছরের শাসনে আলেন্দে একটি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে তিনি কংগ্রেস-এর পরিবর্তে একটি গণ পরিষদ তৈরির কথা বলেন। এই প্রস্তাব বিরোধীরা মেনে নেয়নি। ১৯৭৩ সালে একটি সহিংস অভ্যুত্থানে তাঁর সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির অবসান ঘটে এবং পিনোচেতের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। পিনোচেতের শাসন সরকারে সেনার প্রভাব ফিরিয়ে আনল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল এবং চিলিতে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করল। পিনোচেতের দীর্ঘ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে ১৯৮৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আলউইনের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। আলউইন চিলিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিশেষতঃ এর আগে ঘটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি উদারবাদী সংস্কারের পথই বেছে নিয়েছিলেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসন দারিদ্র্য বা মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সফল হয়েছিল এবং নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মূলত খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট দল বা সমাজতন্ত্রী দল যারা একটি জোট গঠন করত বা রক্ষণশীল দল ন্যাশনাল রিনিউয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। অবশ্য গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সামরিক শক্তির সমর্থক বিচারবিভাগ বা রক্ষণশীল সেনেট অনেক সময়ই বাধা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, মাঝেমধ্যেই উগ্র বিদ্রোহী সংগঠনগুলি চিলির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অশান্ত করে তুলেছে। ২০০৬ সালে সমাজবাদী নেত্রী মিশেল ব্যাসেলেত চিলির প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতায় এসেছেন।

উরুগুয়ে

১৯৭৩ সালে উরুগুয়ে দু'দশকের গণতান্ত্রিক শাসনের পর সামরিক শাসনের অধীনে আসে। উরুগুয়ের রাজনীতি মূলত দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বিভক্ত ছিল—একটির নেতৃত্বে ছিল জাতীয় দল, যারা ব্লাঙ্কোস নামে পরিচিত। এরা সাধারণত গ্রামীণ ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করত। অন্য গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিল কলোরাডো দল যারা শহুরে এলিটদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। ১৯৭১ সালে বামপন্থী দলগুলি একটি 'বৃহৎ ফ্রন্ট' তৈরি করে উরুগুয়ের রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় আধিপত্যে ভাঙ্গন ধরাতে পেরেছিল। তারা সরকারকে ভূমিসংস্কার, জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারের পথ নিতে বাধ্য করেছিল। যদিও, ১৯৭৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালের একনায়কতান্ত্রিক শাসনে উরুগুয়ের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে সামরিক শাসকরা নতুন সংবিধান অনুমোদন করার জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করেছিল এবং দুটি দলের সাথে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে নেভি ক্লাব চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৮৫ সালে কলোরাডো দলের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে

নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে সরকার দুটি প্রধান দলের মত নিয়ে 'অব্যাহতি আইন' পাশ করে যার বলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত সামরিক অফিসারদের বিচার ও শাস্তি প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে তখনই বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলিতভাবে অজস্র বুনিয়াদি সংগঠন তৈরি করে জনসমাজে তাদের জনভিত্তি বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তী দিনগুলিতে উরুগুয়েতে বহুদলীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে অসামরিক সরকার তৈরি হয়। ২০০৪ সালে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ফ্রেন্তে এ্যাম্পেলিও নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করেন এবং ঋণ-জর্জরিত উরুগুয়ের অর্থনীতিতে নয়া-উদারবাদী আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ করতে আগের কিছু অর্থনৈতিক সংস্কারের বিলোপ ঘটান। বামপন্থী সরকার নাগরিক সমাজ, শ্রমিক সংঘের বিকাশে উৎসাহ জুগিয়েছিল যাতে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পরিসর তৈরি করতে সামাজিক কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত করা যায়।

পেরু

১৯৪৮ সাল থেকে পেরুতে একের পর এক সামরিক শাসনের কারণে আমলাতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭০-এর দশকে সামরিক শাসকরা নিম্নবর্গের মানুষের সমর্থন আদায় করতে অবশ্য কিছু গণসমাজতন্ত্রী সংস্কার ও জনবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেসব সংস্কার সত্ত্বেও তাদের মূলত বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৯৮০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দশকব্যাপী সামরিক শাসনের পর ডেমোক্রেট নেতা ও 'পপুলার এ্যাকশান'-এর প্রার্থী বেলুন্দে ক্ষমতায় আসেন। পেরুর গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথটি ক্রমবর্ধমান সংকটের সামনে পড়েছিল কারণ অর্থনীতি ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক হিংসা, বিশেষতঃ বিদ্রোহীদের গেরিলা কার্যকলাপ নতুন করে বাড়ছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি বেড়ে চলা অনাস্থা এবং অর্থনৈতিক ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালে আলবার্তো ফুজিমোরি ক্ষমতায় আসেন। তিনি সরকারে তাঁর একনায়কতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেন। যদিও পেরুতে নিয়মিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তাঁর আমলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ বা কৃষক সংগঠনের কার্যকারিতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল এবং ফুজিমোরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী বা গণমাধ্যমের ওপর তাঁর চরম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কিডমোর বলেছেন: "১৯৯২-এর এপ্রিল মাসের পেরু 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের' অথবা... 'অনুদারবাদী গণতন্ত্রের' পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল— এমন একটি শাসন যা অবাধ নির্বাচনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নাগরিকদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের প্রতি এক গভীর বিতৃষ্ণাকে একসাথে বহন করেছিল" [সূত্র: স্কিডমোর, টি ই ও পিটার এইচ স্মিথ (২০০১) মডার্ন ল্যাটিন আমেরিকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ২১৪]।

প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছিল। চিলির রাজনীতি মতাদর্শগতভাবে ভিন্নমেরুতে থাকা রাজনৈতিক দল ও সরকারের সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে একটি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত চিলির সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন রক্ষণশীল নেতা আলেসান্দ্রি, খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট নেতা ফ্রেই বা সমাজতন্ত্রী নেতা আলেন্দে। তাঁর তিন বছরের শাসনে আলেন্দে একটি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে তিনি কংগ্রেস-এর পরিবর্তে একটি গণ পরিষদ তৈরির কথা বলেন। এই প্রস্তাব বিরোধীরা মেনে নেয়নি। ১৯৭৩ সালে একটি সহিংস অভ্যুত্থানে তাঁর সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির অবসান ঘটে এবং পিনোচেতের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। পিনোচেতের শাসন সরকারে সেনার প্রভাব ফিরিয়ে আনল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল এবং চিলিতে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করল। পিনোচেতের দীর্ঘ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে ১৯৮৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আলউইনের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। আলউইন চিলিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিশেষতঃ এর আগে ঘটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি উদারবাদী সংস্কারের পথই বেছে নিয়েছিলেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসন দারিদ্র্য বা মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সফল হয়েছিল এবং নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন মূলত খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট দল বা সমাজতন্ত্রী দল যারা একটি জোট গঠন করত বা রক্ষণশীল দল ন্যাশনাল রিনিউয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। অবশ্য গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সামরিক শক্তির সমর্থক বিচারবিভাগ বা রক্ষণশীল সেনেট অনেক সময়ই বাধা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, মাঝেমধ্যেই উগ্র বিদ্রোহী সংগঠনগুলি চিলির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অশান্ত করে তুলেছে। ২০০৬ সালে সমাজবাদী নেত্রী মিশেল ব্যাসেলেত চিলির প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতায় এসেছেন।

উরুগুয়ে

১৯৭৩ সালে উরুগুয়ে দু'দশকের গণতান্ত্রিক শাসনের পর সামরিক শাসনের অধীনে আসে। উরুগুয়ের রাজনীতি মূলত দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বিভক্ত ছিল—একটির নেতৃত্বে ছিল জাতীয় দল, যারা ব্লাঙ্কোস নামে পরিচিত। এরা সাধারণত গ্রামীণ ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করত। অন্য গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিল কলোরাডো দল যারা শহুরে এলিটদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। ১৯৭১ সালে বামপন্থী দলগুলি একটি 'বৃহৎ ফ্রন্ট' তৈরি করে উরুগুয়ের রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় আধিপত্যে ভাঙ্গন ধরাতে পেরেছিল। তারা সরকারকে ভূমিসংস্কার, জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারের পথ নিতে বাধ্য করেছিল। যদিও, ১৯৭৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালের একনায়কতান্ত্রিক শাসনে উরুগুয়ের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে সামরিক শাসকরা নতুন সংবিধান অনুমোদন করার জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করেছিল এবং দুটি দলের সাথে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে নেভি ক্লাব চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৮৫ সালে কলোরাডো দলের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে

নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে সরকার দুটি প্রধান দলের মত নিয়ে 'অব্যাহতি আইন' পাশ করে যার বলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত সামরিক অফিসারদের বিচার ও শাস্তি প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে তখনই বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলিতভাবে অজস্র বুনিয়াদি সংগঠন তৈরি করে জনসমাজে তাদের জনভিত্তি বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তী দিনগুলিতে উরুগুয়েতে বহুদলীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে অসামরিক সরকার তৈরি হয়। ২০০৪ সালে বামপন্থীদের নেতৃত্বে ফ্রেন্তে এ্যাম্পেলিও নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করেন এবং ঋণ-জর্জরিত উরুগুয়ের অর্থনীতিতে নয়া-উদারবাদী আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ করতে আগের কিছু অর্থনৈতিক সংস্কারের বিলোপ ঘটান। বামপন্থী সরকার নাগরিক সমাজ, শ্রমিক সংঘের বিকাশে উৎসাহ জুগিয়েছিল যাতে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার পরিসর তৈরি করতে সামাজিক কর্মকাণ্ডকে আরও প্রসারিত করা যায়।

পেরু

১৯৪৮ সাল থেকে পেরুতে একের পর এক সামরিক শাসনের কারণে আমলাতান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭০-এর দশকে সামরিক শাসকরা নিম্নবর্গের মানুষের সমর্থন আদায় করতে অবশ্য কিছু গণসমাজতন্ত্রী সংস্কার ও জনবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেসব সংস্কার সত্ত্বেও তাদের মূলত বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৯৮০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দশকব্যাপী সামরিক শাসনের পর ডেমোক্রেট নেতা ও 'পপুলার এ্যাকশান'-এর প্রার্থী বেলুন্দে ক্ষমতায় আসেন। পেরুর গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথটি ক্রমবর্ধমান সংকটের সামনে পড়েছিল কারণ অর্থনীতি ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক হিংসা, বিশেষতঃ বিদ্রোহীদের গেরিলা কার্যকলাপ নতুন করে বাড়ছিল। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি বেড়ে চলা অনাস্থা এবং অর্থনৈতিক ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালে আলবার্তো ফুজিমোরি ক্ষমতায় আসেন। তিনি সরকারে তাঁর একনায়কতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেন। যদিও পেরুতে নিয়মিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তাঁর আমলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ বা কৃষক সংগঠনের কার্যকারিতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল এবং ফুজিমোরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী বা গণমাধ্যমের ওপর তাঁর চরম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কিডমোর বলেছেন: "১৯৯২-এর এপ্রিল মাসের পেরু 'নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের' অথবা... 'অনুদারবাদী গণতন্ত্রের' পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এমন একটি শাসন যা অবাধ নির্বাচনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নাগরিকদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের প্রতি এক গভীর বিতৃষ্ণাকে একসাথে বহন করেছিল" [সূত্র: স্কিডমোর, টি ই ও পিটার এইচ স্মিথ (২০০১) মডার্ন ল্যাটিন আমেরিকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ২১৪]।

ব্রাজিল

১৯৬৪ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলে নানা আকারে কর্তৃত্ববাদী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা শাসনের প্রশ্নে কখনও মধ্যপন্থী কখনও রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করেছিল। সামরিক শাসকদের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ব্রাজিলে প্রায়ই গণবিদ্রোহ এবং সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটতে দেখা গেছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯, এই পর্বে রাষ্ট্রপতি গিজেল কয়েকটি গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন যার বলে পরবর্তীকালে প্রাদেশিক গভর্ণর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে চালু হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে সামরিক শক্তির হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর ১৯৮৫ সালে প্রথম জোসে সার্নে ব্রাজিলের অসামরিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। ব্রাজিলের বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে যেখানে ব্রাজিলকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হল। এই পুনর্বার গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া অবশ্য নানা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল কারণ ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে দেশে গণ-অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আশির দশকের প্রথম থেকে গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকশ্রেণী সরকারের কৃষি নীতির বিরুদ্ধে তাদের অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন, এম এস টি (MST)-র নেতৃত্বে লড়াই শুরু করেছিল। ব্রাজিলে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক বা দেশীয় জনজাতি গোষ্ঠীর তৃণমূলস্তরের সামাজিক আন্দোলনগুলি মূলতঃ মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্ব (liberation theology) ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কর্তৃত্ববাদী ধ্যানধারণা এবং সাবেকী স্তরবিন্যস্ত সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল। ১৯৯০-এর দশকে যখন ব্রাজিলের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কার্দোসো দেশে কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচী গ্রহণ করলেন তখন এই আন্দোলনগুলি চরম আকার নিয়েছিল। নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি (PT)-র নেতা লুলা দা সিলভা ২০০২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লুলা-র সরকারকে অবশ্য আর্থিক পুঁজির সাথে হাত মিলানোর জন্য ব্রাজিলে সমালোচিত হতে হয়েছে। ২০১১ সালের নির্বাচনে দিলমা রুসেফ ব্রাজিলের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের মধ্যেও তিনি ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছেন।

মেক্সিকো

স্বাধীনতা উত্তর পর্বে, মেক্সিকোতে দুটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল—একটি হল চার্চ ও অন্যটি সেনাবাহিনী। বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে মেক্সিকোতে একের পর এক গৃহযুদ্ধের ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজটি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পি আর আই (*Partido Revolutionario Institucional*) দলের একক আধিপত্যে অসামরিক উদারনৈতিক সরকার তৈরি হয়েছিল যা আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়ণের পথ গ্রহণ করে। আশির দশকে মেক্সিকো মুক্ত অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাথে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলেছিল, বিশেষত আমেরিকার সাথে। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলগুলির মতো আশির দশকের ঋণ-সংকট মেক্সিকোতেও শ্রমিক, কৃষক ও দেশীয়

জনজাতির তীব্র আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এই পর্ব থেকে মেক্সিকোর রাজনীতিতে কৃষক ও জনজাতি আন্দোলন ক্রমশ চরমপন্থী চেহারা নিতে থাকে। তারা দেশের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকে। এরকম কৃষক ও জনজাতি সংগঠনের একটি প্রধান উদাহরণ হল জাপাতিস্তা মুক্তিবাহিনী [Zapatista Army of National Liberation (EZLN)] যারা মেক্সিকো সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (North American Free Trade Agreement)-তে মেক্সিকোর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে জাপাতিস্তারা ও শ্রমিক সংগঠনগুলি তীব্র সমালোচনা করেছে। ২০০০ সালে পি আর আই-এর একাধিপত্য খর্ব করে বিরোধী প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং এই নির্বাচনের পরে গণতন্ত্র বিস্তারের পথটি আরও প্রশস্ত হয়। একবিংশ শতকে মেক্সিকোয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অবশ্য কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনের এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, তীব্র সামাজিক বিভাজন এবং একটি সুস্থিত বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি মেক্সিকোর গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে।

মধ্য আমেরিকা

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সাধারণভাবে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেহেতু এই শাসকরা একটি নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তাই কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য এই সরকারগুলিকে 'প্রজাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' বলে বর্ণনা করেছেন। কিছু মৌলিক মিল সত্ত্বেও এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি স্থায়িত্ব, উন্নয়ণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন, কোস্টা রিকা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি সাংবিধানিক রাজনীতির পথ নিয়েছিল। লাতিন আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই রাষ্ট্রে ভোটে অংশগ্রহণের হার ছিল খুব উচ্চ। ঋণ সংকটের সময় থেকে বাজার-পন্থী শাসকরা মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, নিকারাগুয়ায় যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সামরিক একনায়কতন্ত্রের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে কোনো প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ছিল না। ১৯৭৯ সালে দীর্ঘদিনের বৈপ্লবিক লড়াইয়ের পর সান্দিনিস্তা সরকার ক্ষমতায় আসে এবং সেনা, শ্রমিক সংগঠন বা আইন সভার ওপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে নিকারাগুয়ার সরকার বংশগত শাসনব্যবস্থা উত্থানের সম্ভাবনা রোধ করতে একাধিক সাংবিধানিক সংস্কার গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে, সান্দিনিস্তা দল ও আমেরিকা সমর্থিত প্রতিবিপ্লবী 'কন্ট্রা' সেনাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষের কারণে নিকারাগুয়ার রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালায় মোটামুটিভাবে নিয়মিত অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেনা ও রক্ষণশীল শক্তির প্রভাব এখনও সেই দেশগুলিতে যথেষ্ট বিদ্যমান। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও মূলত এলিট শ্রেণির মধ্যে সীমিত এবং তার ফলে নিম্নবর্গ মানুষের ভূমিকা অনেকটাই প্রান্তিক হয়ে গেছে।

৪.৭ সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য

লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বামপন্থীরা ঐতিহাসিকভাবে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করতে তারা সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলির বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনে মধ্য আমেরিকার অনেক দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন আর্জেন্টিনা-জাত গেরিলা বিপ্লবী নেতা এরনেস্তো চে গুয়েভারা। ১৯৫৯ সালে লাতিন আমেরিকায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিউবাতে। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবাতে বিপ্লবী সরকার তৈরি হয় বাতিস্তার স্বৈরতান্ত্রিক সমানার অবসান ঘটিয়ে। বাতিস্তার আমলের আমেরিকার গলগ্রহ রাষ্ট্র থেকে কিউবা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনীতির জাতীয়করণ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত ভূমিকা। লাতিন আমেরিকা মহাদেশে নয়-উদারনৈতিক সংস্কারের যুগে আর্থিক পুঁজির চলন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ বিরোধী আন্দোলনকে কিউবা নেতৃত্ব দিয়েছে। বিংশ শতকের শেষ দশকে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর বা উরুগুয়েতে মধ্যপন্থি-বামপন্থী সরকার তৈরি হয়েছে। নতুন সরকারগুলি মূলত তীব্র আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব পোষণ করে এবং মহাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তি হল 'আমেরিকায় বলিভিয়া বিকল্প' [Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA)]-র লড়াই যা 'আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' [Free Trade Area of the Americas (FTAA)]-এর বিকল্প হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৯৪ সালে 'আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' ঐ অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য তৈরি হয়েছিল। হুগো সাভেজের নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলা এবং ইভো মোরালেসের নেতৃত্বে বলিভিয়া 'একবিংশ শতকের জন্য সমাজবাদ' ধারণা প্রচারে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছে। সাভেজ তাঁর বহুচর্চিত 'বলিভিয়ার বিপ্লবের' ধারণার সাহায্যে ভেনেজুয়েলায় একটি রাষ্ট্র-সমর্থিত পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। এই ধারণার মূল উপাদান হল মিশ্র অর্থনীতি, গণ অংশগ্রহণ, স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদেশনীতি এবং দক্ষিণ আমেরিকা গোলার্ধের মুক্তি। ভেনেজুয়েলা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে এবং নয়া-উদারবাদের বিরোধিতায় গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। অপরদিকে, ইকুয়েডর ও বলিভিয়াতে স্বতন্ত্র দেশীয় জনসমাজের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে যা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

৪.৮ একবিংশ শতকে গণতন্ত্রীকরণের চ্যালেঞ্জগুলি

নতুন শতকে লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া নানা চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারগুলি 'বৈধতার সংকটের' সামনে পড়েছে। অসামরিক সরকারগুলির স্থায়িত্বের প্রশ্নটি ছাড়াও গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যুদ্ধপরবর্তী পর্বে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ভূমিকার ওপর। গণতন্ত্রের প্রবাহ গণ-অংশগ্রহণের নতুন ধারা তৈরি করেছে ও নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। এর ফলে দেশীয় জনসমাজের স্বাতন্ত্র্যের দাবি বৃদ্ধি পেয়েছে ও জাতীয় রাজনীতিতে তাদের স্বর বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। আনুভূমিক ও উল্লম্ব স্তরে সংহতি সাধন করে তারা নিজেদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, যেমন দেখা যাচ্ছে মেক্সিকো, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, পেরু বা কলম্বিয়ায়। এই আন্দোলনগুলি নিচের দিক থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক সরকারগুলির ভাগ্য নয়া-উদারবাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল স্তরে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর আন্দোলনের চরমপন্থী পথের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও স্থায়িত্বের পিছনে আমেরিকা ও এই মহাদেশের সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ গতি একটি বিশেষ উপাদানের কাজ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে লাতিন আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সাথে একটি দৃঢ় এবং নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, যদিও তা প্রায়ই ছিল সংঘর্ষপূর্ণ। এই সম্পর্কের ভিত্তি প্রধানত ছিল আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থ, লাতিন আমেরিকার নির্ভরশীল অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা এবং আমেরিকার শাসক গোষ্ঠীর সাথে লাতিন আমেরিকার শাসকদের ঘনিষ্ঠতা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের 'সহৃদয় প্রতিবেশী নীতি' থেকে শুরু করে ১৯৬১ সালে এর পূর্ণতা ঘটে কেনেডির উগ্র 'প্রগতির জন্য জোট' এই ধারণায়। আমেরিকার রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলশ্রুতিতে দুই মহাদেশের মধ্যে অনেক অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে এবং তার সূত্র ধরে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লাতিন আমেরিকায় উত্তর আমেরিকা বিরোধিতার শক্তিশালী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এবং তা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে গেছে। বিংশ শতকের শেষ দশকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন 'একটি প্রকৃত গোলার্ধ-কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা'র ধারণা প্রচার করেছেন যার ভিত্তি হবে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুবিধা।

লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক পর্যায়ে সেনার একটি নতুন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। অসামরিক সরকারগুলি সামরিক শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা সীমিত করে রাখতে পেরেছে। যদিও, অনেক রাষ্ট্রেই সেনা এখনও সক্রিয় ভূমিকা নেয়, কখনও 'মাদক বিরোধী যুদ্ধের' নামে, কখনও স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে দমন করার মধ্যে দিয়ে। পেরু, কলম্বিয়া বা মেক্সিকোতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বেআইনি মাদক পাচার ব্যবসা। অনেক পর্যবেক্ষক এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে 'মাদক-গণতন্ত্র' বলেও অভিহিত করেছেন, যেখানে বস্তুত মাদক-চক্র নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া চার্চের রাজনৈতিক প্রভাবের ওপরও নির্ভর করে। লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্টান্ট বাদের লড়াই একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্বের বিকাশ তৃণমূল স্তরের আন্দোলন

তৈরিতে ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করতে অবদান রেখেছে। যেমন মুক্তিকামী ধর্মতত্ত্বের হাত ধরে ব্রাজিলে প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে অজস্র 'বুনিয়াদি সংগঠন' তৈরি হয়েছে। লাতিন আমেরিকায় যাজক-বিরোধী মতাদর্শও অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়েছে যার ফলে আর্জেন্টিনা বা চিলির মতো দেশে র‍্যাডিক্যালদের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

৪.৯ সারসংক্ষেপ

লাতিন আমেরিকায় গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। স্বাধীনতার আন্দোলন দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করেছিল এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিনগুলিতে স্বৈরতান্ত্রিক ও জনগণের শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথটি সেখানে কখনই একমুখী ছিল না। বরং, তা বিভিন্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। কখনও তা অস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে আবার কখনও বৈধতার সংকট সৃষ্টি করেছে।

৪.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস ও আধুনিক লাতিন আমেরিকার বিকাশের পথটি বর্ণনা করুন।

২. লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসে 'গণতন্ত্রের তৃতীয় প্রবাহ' এর পর্বটি বর্ণনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে লাতিন আমেরিকার রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

২. লাতিন আমেরিকায় 'গণতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রবাহ'-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৩. সাম্প্রতিক লাতিন আমেরিকায় গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জগুলি কি কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ১৯৮০-পরবর্তী আর্জেন্টিনায় গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

২. ১৯৭৩-পরবর্তী উরুগুয়েতে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সামনে চ্যালেঞ্জগুলি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন।

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Skidmore Thomas E, Peter H. Smith. (2001) *Modern Latin America*, Oxford University Press, New York.
2. Hagopian, F, Scott P.Mainwaring(2005) *The Third Wave of Democratization in Latin America : Advances and Setbacks, Cambridge University Press.*

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : ₹ 225.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 & Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006